আমাদের সূফী-সাধক

আ.ন.ম. বজলুর রশীদ

আমাদের সূফী-সাধক

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হিজরী পঞ্চদশ শতক উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

আমাদের সূফী-সাধক ঃ আ. ন. ম. বজলুর রশীদ ॥ ই. ফা. প্রকাশনা ঃ ২২/১
ই. ফা. গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.৪ ॥ প্রথম মুদ্রণ ঃ জুলাই ১৯৭৭ ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ
এপ্রিল ১৯৮৪ ; চৈত্র ১৩৯০ ; জমাদিউস সানি ১৪০৪ ॥ প্রকাশক ঃ মোহম্মদ
আজিজুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম,
ঢাকা-২ ॥ প্রচ্ছদে ঃ শেখ তোফাজ্জল হোসেন ॥ মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ে ঃ শেখ
আবদুর রহীম, ই. ফা. প্রেস, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-২ ॥

দাম ঃ ৩০·০০

AMADER SUFI SADHAK : The Saints of Ours written by A.N.M. Bazlur Rashid in Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh to celebrate the fifteenth century Al-Hijrah.
April 1984

Price : 30·00

U.S. Dollar : 3·00

হাসি—প্রিয়তমাসু

এই সব নিবেদিত পরিচ্ছন্ন সাধক জীবন
রচনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাক
প্রতি ছত্রে পবিত্র কথায়
তোমার স্মরণখানি ফুটে থাক
যেন শুভ্র রজনীগন্ধায়
পরিপূর্ণ বিকশিত সুন্দর গোলাপগন্ধী
ফুলের মতন।

আমাদের কথা

উপমহাদেশের ইসলামের প্রচার এবং মুসলিম সমাজের বিকাশ ও লালনে সূফী-সাধকদের অবদান সর্বজনস্বীকৃত। সূফী-সাধকদের প্রসঙ্গ উল্লেখ না করে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মুসলমানদের ইতিহাস রচনা আদৌ সম্ভব নয়। এ উপমহাদেশে তের শতকে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও এসব অঞ্চলের সঙ্গে ইসলামের সংযোগ ঘটে একেবারে ইসলামের ইতিহাসের আদি পর্বে তথা সাত শতকেই। তখন থেকেই অসংখ্য নিষ্ঠাবান সাধক প্রচারকদের মাধ্যমে এদেশের ব্রাহ্মণ্যবাদ-প্রপীড়িত মুক্তিকামী জনগণ ইসলামের সহজ সরল সাম্য-ভ্রাতৃত্বের সুমহান আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠতে থাকে এবং ইতিহাস পাঠে জানা যায়---মুসলিম বিজয়ের পূর্বেই এ উপমহাদেশের বহু এলাকায় বহু মুসলিম জনপদ গড়ে ওঠে।

মুসলিম বিজয়ের পরও শাসকবর্গের অনেকেই ইসলামী আদর্শের প্রচার ও প্রসারে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে না পারায় সে সময়েও ইসলাম প্রচারের কাজ চালিয়ে যান সূফী-সাধকবর্গ। পরবর্তী যুগে সূফীবা-দের নামে কারও কারও মধ্যে শরীয়ত ও বাস্তব

জীবনের সম্পর্কশূন্য এক ধরনের বৈরাগ্যবাদ এদেশে বহুতর ক্ষেত্রে প্রচলিত হতে দেখা গেলেও এ উপমহা-দেশের ইতিহাসে এমন বহু সূফীর সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁরা প্রকৃতপ্রস্তাবেই ছিলেন জীবন সাধক ও সংগ্রামী। উপমহাদেশের মুসলিম সমাজ তাঁদের বর্তমান অবস্থার জন্য এই সব মহান সাধকদের ঋণ কোনদিন শোধ করতে পারবে না।

কবি লেখক বজলুর রশীদ রচিত 'আমাদের সূফী-সাধক' গ্রন্থে এ ধরনের কতিপয় মস্তান ব্যক্তিত্বের আলেখ্য স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থখানি ইতিপূর্বেও একবার ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। অল্পদিনে এর সব কপি নিঃশেষিত হয়ে যাওয়াতে নতুন সংস্করণের প্রয়োজন দেখা দেয়। কিছু বিলম্বে হলেও গ্রন্থের নতুন সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ পাকের দরবারে লাখো শুকরিয়া জানাচ্ছি।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ২৯-২-৮৪

আবদুল গফুর
প্রকাশনা পরিচালক

বাঙলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের সূফী-সাধকগণ প্রায় সকলেই পবিত্র আরব-ভূমি, ইরাক, ইরান, শাম ও মধ্য-এশিয়া থেকে এই মহাদেশে আগমন করেন। তাঁরা ব্যাপক সাফল্যের সঙ্গে ইসলাম প্রচার করেছিলেন এবং আল্লাহ্ ও নবীজীর উদ্দেশ্যে লালিত ও নিবেদিত অতি-অন্তরঙ্গ ভালবাসার আবেগ ও আনন্দময় উপলব্ধিতে তাঁরা সূফী-সাধনার যে এক গৌরব ও প্রাণময় আধ্যাত্মিক সম্পদ এবং ঐতিহ্য গড়ে তোলেন, আমরা সকলেই তার উত্তরাধিকারী ব'লে গ্রন্থটির নাম রেখেছি 'আমাদের সূফী সাধক'।

এরূপ একটি স্বল্প-পরিসর গ্রন্থে সকল সূফী-সাধকের জীবন গ্রথিত ও উপস্থাপিত করা সম্ভব নয়। কারণ তা প্রচুর অর্থ, সময় ও গবেষণা-সাপেক্ষ। বর্তমান গ্রন্থটি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের সূচনা বা ভূমিকামাত্র। এই ভূমিকায় আমি সূফী-সাধকদের প্রেম সাধনার রসময় পরিবেশন বাঙলা ভাষায় সাধ্য এবং সামর্থ্য-মতো সহজবোধ্য ও স্বচ্ছন্দরূপে হৃদয়-বেদ্য করতে প্রয়াস পেয়েছি। গ্রন্থটি যদি কোন ভক্ত এবং অনুসন্ধিৎসু মনকে স্পর্শ এবং গভীরভাবে নাড়া দিতে পারে, তবে আমার সকল শ্রম আমি সার্থক ব'লে মনে করবো।

বাঙলাদেশের সূফী-সাধকদের জীবন ও সাধন-বৃত্তান্ত তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্বল্প হওয়ার অন্যতম কারণ, যথেষ্ট পরিমাণে প্রামাণ্য গ্রন্থ ও ইতিবৃত্ত-বিবরণের অভাব। তার অন্য একটি কারণ—এদেশের সূফী-সাধকগণ ইসলাম প্রচার ও সমাজ সংগঠনে জীবনের প্রায় অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন। তাঁদের রচিত সূফী ভাবের গ্রন্থের উল্লেখ আমরা পাই, কিন্তু সে-সব এখনো আমাদের নাগালের বাইরেই থেকে গেছে এবং সে সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা ও তত্ত্ব-তালাশও হয়নি বলে জানি।

ভারতের সূফী-সাধকদের জীবন-বৃত্তান্ত বিশদভাবে উর্দু ও ফারসীতে লিপিবদ্ধ হলেও তাঁদের রচিত বহু গ্রন্থের উল্লেখমাত্র পাই। সেজন্য বাঙলা-দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত হলেও তাঁদের ভাব-জীবনের রস-পরিচয় এক এক খানকা শরীফের সিন্দুকেই ভক্তিভরে রক্ষিত ও আবদ্ধ হয়ে আছে।

কিন্তু পাকিস্তানের সূফী-সাধকদের জীবন ও ভক্তি-সাধনের ইতিহাস-সম্বলিত বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ অত্যন্ত সুলভ ও বহুল প্রচারিত। পাঞ্জাবে শিখ

অভ্যুদয় মুগল সাম্রাজ্যের জন্য ক্ষতিকর হলেও শিখ-সন্তগণ এবং পরবর্তী বৃটিশ আমলের শিখ-মহারাজগণ অতি ভক্তিভরে পঞ্জাবের মুসলিম সূফী-সাধকদের জীবনেতিহাস ও রচনা সম্ভার অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে সযত্নে রক্ষা ও সর্বসাধারণ্যে প্রচার করেছেন। পঞ্জাবের শিখ, হিন্দু ও মুসলিম মনীষিগণ তাঁদের জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে রচনা-প্রকাশে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করেছেন ব'লে সেই গবেষণা-লব্ধ অবদানের ফসল আমরা বর্তমান কালে পরম কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ভোগ করছি।

সিন্ধুর সাধকগণ ইংরেজ সিভিলিয়ান ও মনীষীদের দ্বারা এই উপ-মহাদেশে এবং তার বাইরেও তাঁদের স্বকীর্তি-মহিমায় প্রচারিত ও পরিচিত হয়েছেন। Indian Civil Service-এর H. T. Sorly-কৃত Shah 'Abdul Lalif of Bhit, শাহ্ লতীফের সময়কাল, জীবন ও কাব্যের একটি বিস্তৃত এবং সবিশদ আলোচনা। এই উপমহাদেশের আর কোনো একজন সাধক-কবি সম্বন্ধে এরূপ একটি বৃহৎ ও প্রামাণিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। 'Panjabi Sufi Poets'—(1460-1900) থিসিসটি রচনা করে পঞ্জাবের কুমারী লজ্জাবতী রামকৃষ্ণ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Ph. D. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি বিস্তর মূল প্রাচীন পুঁথি-পত্তর অনুসন্ধান করেছেন। অমানুষিক পরিশ্রম-লব্ধ তাঁর এই রচনা পঞ্জাবী ভাষা ও মধ্যযুগের পঞ্জাবী কবি-সাধকদের জীবন সম্পর্কিত একটি অমূল্য গ্রন্থ।

সে যা-ই হোক, পরিসর বা আয়তন আমাদের লক্ষ্য বা বিচার্য নয়। সূফী-সাধকগণ এই উপমহাদেশের বিচিত্র ভাষায় ও পরিবেশে যুগ যুগ ধ'রে একই চেতনা ও আনন্দময় ভাবরসের পরিবেশন করেছেন এবং তা বহু রঙের হলেও স্বাদে গন্ধে ও নেশার আমেজ-স্ফূর্তিতে এক এবং অভিন্ন।

আরেকটি কথা সবিনয় নিবেদন করছি। সূফী-সাধকদের অলৌকিক কীর্তি-কাহিনীর উপর আমি তেমন গুরুত্ব আরোপ করিনি। কারণ যাঁরা আত্যন্তিক ভক্তি ও অবিরাম সাধনার বলে আল্লাহ্‌র ওলী বা বন্ধু হয়েছেন তাঁদের পক্ষে অলৌকিক শক্তি বা কারামতের অধিকারী হওয়া এমন কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। আমাদের লক্ষ্য, এসব সাধকগণ কিভাবে এবং কোন্ পথে চ'লে আল্লাহ্‌র প্রিয় ওলী হতে পেরেছিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে কত গভীরভাবে ভালবেসে পরমের সঙ্গ ও সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। আমরা যদি তাঁদের যথাসাধ্য অনুসরণে আল্লাহ্ ও নবীজীকে কণামাত্র

ভালবাসতে পারি তবেই আমাদের দুই জগতের জীবন সার্থক, সুন্দর ও সত্যিকারভাবে অর্থময় হয়ে উঠবে।

এই গ্রন্থ-প্রণয়নে আরবী ফারসী ও হিন্দী শব্দের বানান এবং অন্যান্য জটিল তত্ত্বের নির্দেশ দান ও সমাধানের জন্য আমার পিতার অন্তরঙ্গ সহপাঠী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী।

পঞ্জাবী ভাষা ও দোঁহার পাঠোদ্ধারের জন্য আমার পঞ্জাবী ছাত্রী যরীনা জবীন সিয়ালের (স-এর উচ্চারণ ইংরেজী এস-এর ন্যায়) সাহায্য আমি প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করছি। কোন কোন আরবী শব্দের বানান মূলের উচ্চারণ অনুসারে বাঙলায় লেখা প্রায় দুষ্কর। সেখানে বাঙলা ভাষার নিজস্ব গ্রহণ ও বর্জন-নীতি এবং বাচন-ভঙ্গির শরণ ও সাহায্য নেয়া ছাড়া উপায় থাকে না, যেমন ফিক্‌হ্। শেষের দুই কণ্ঠ্য ও কণ্ঠনালীয় বর্ণের হসন্ত উচ্চারণ বাঙালী কণ্ঠে প্রায় অসম্ভব। সেজন্য সোজাসুজি ফিকহ্ এভাবেই বানান করতে হয়েছে। আরো কিছু কিছু শব্দ আছে যাদের বাঙালী পোশাকেই পরিচিত করতে হয়েছে। যেমন 'খাজা' শব্দটি হওয়া উচিত ছিল খাওয়াজা বা খ-এর সঙ্গে অন্তঃস্থ 'ব (যার উচ্চারণ 'ওয়') জুড়ে দিলেও চলতো, কিন্তু বিভ্রান্তিকর ও নেহাত অপরিচিত হবে বলে 'খাজা'ই রেখেছি। এই শব্দটি একটি মিষ্ট দ্রব্য অর্থেও বাঙলায় বিশেষ পরিচিত।

এই গ্রন্থের সাথে মরহুম হারূনুর রশীদ আমার আব্বাজানের পবিত্র ও মধুময় স্মৃতি জড়িত হয়ে থাক। তাঁর ভক্তমনের আবেগ-আনন্দ কৈশোর-কাল থেকে আমাকে উচ্ছ্বসিত ও ক্রমাগত উদ্দীপিত করেছে বলেই 'আমাদের সূফী-সাধক' গ্রন্থটির প্রকাশ ও আনন্দময়-রূপায়ণ সম্ভবপর হয়েছে।

ঠিক চার বৎসর পর গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ হতে চলেছে। এ এক পরম সৌভাগের কথা। আল্লাহ্ ও নবীজীকে যারা সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসেন সেইসব মুত্তাকীন ও মুকাররাবীন এই গ্রন্থটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন, এই দীন ভক্তজনের তাই আনন্দের আর সীমা পরি-সীমা নেই।

গ্রন্থের শেষ ভাগের 'উত্তর-বন্ধ' অধ্যায়টি আমি সকলের আগে পাঠ করতে অনুরোধ করছি। কারণ এই অংশে আল্লাহ্-রসূলের প্রতি ভক্তের ভালবাসা এক পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সেই প্রেমে উজ্জীবিত ও উদ্দীপিত হয়ে আমরা জীবনকে সুন্দর এবং মহৎরূপে গড়ে

তুলতে পারি—এই আশ্বাস আছে বলেই হয়তো এই গ্রন্থটির এতো সমাদর ও জনপ্রিয়তা।

পরিশেষে আবার বলছি, আল্লাহ্ ও নবীজীকে ভালবেসে দেখবেন কী অপূর্ব সুন্দর ও সম্ভাবনাময় আমাদের এই মর্ত-জীবন, এ-জীবনের আত্মিক আনন্দ-প্রশান্তির আর অন্ত নেই, সীমা নেই, অনন্ত কাল ধরে তা প্রসারিত হয়ে চলেছে।

চৈত্র ১
১৩৯১
ঢাকা

সূচী

পাকিস্তানের সূফী-সাধক

আমাদের সূফী-সাধক

১

কবি-মা*

কবি-মা তোমাকে আজ মন খুলে অসংলগ্ন কথা ব'লে যাই
সময় হবে না আর। নবীজীর আমি এক দীনতম দাস।
ভালবাসি তাকে তাই বুক-ভরা পরিচ্ছন্ন আবেগ উচ্ছ্বাস
সাধ, তবে সাধ্য নেই জানি, সেই কথা ভেবে বড় ব্যথা পাই।
এখনো সঞ্চয়-স্পৃহা কামুকতা, খ্যাতির আকাঙক্ষা প্রলোভন
আমাকে বিব্রত করে অসংযত, তার জন্য মরেছি লজ্জায়
কত বার। মানুষের অপমানে মর্মদাহে জ্বালা-যন্ত্রণায়
বিষাক্ত হয়েছে মর্ত, তাই শত তিক্ততায় বড় ক্লান্ত মন,
তথাপি সান্ত্বনা পাই, এই তো প্রশান্ত ছবি সবুজে শ্যামলে
অবারিত আকাশের রাত-জাগা সকরুণ অসংখ্য তারায়
চেয়ে থাকে অবিরাম প্রিয়তম ছায়ানীল গভীর অতলে।
আমি তার যোগ্য নই, বারবার ভেঙে পড়ি করুণ কান্নায়
সুদীর্ঘ প্রতীক্ষারত দিন রাত্রি দীর্ঘতর প্রতি পলে পলে।
তোমাদের কথা ভেবে তৃপ্তি পাই বেঁচে আছি সেই ভরসায়।

ভাদ্র ২
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস
জাহাঙ্গীরনগর, ঢাকা

* মা আয়িশা কবি ছিলেন। এক সৌভাগ্যময় শুভরাত্রে নবীজী ও মা আয়িশাকে একত্রে স্বপ্নে দেখে ধন্য হয়েছিলাম। 'কবি-মা' কবিতাটি সেই অলৌকিক রাত্রি-স্বপ্নের একটি আনন্দময় স্মৃতি-চারণ। এই প্রসঙ্গে বইয়ের শেষ অধ্যায়টি দেখুন।

মুখবন্ধ

একালের একটি কাহিনী দিয়ে শুরু করি। আমেরিকার নিউ জার্সি স্টেটের নিউ ব্রাউন্‌জউইকে দীর্ঘকাল থাকাকালীন, পার্শ্ববর্তী রারিটন নদীর ওপর তীরে, হাইল্যাণ্ড পার্ক শহরের গ্রান্ট অ্যাভিনিউতে মিসিজ রাপের অতিথি হয়ে ছিলাম প্রায় তিন মাস। পঞ্চাশী বিধবা মহিলা। সুন্দর বড় এক গথিক প্যাটার্নের বাড়ী, পিছনে চেরি ও আপেলের বাগান, সামনের দিকে পত্রবহুল সিকামোর বৃক্ষের শ্রেণী। মিসিজ রাপের একমাত্র পুত্র তার স্ত্রীপুত্র নিয়ে পৃথক বাড়ীতে থাকে। মায়ের প্রাধান্য ওদেশের ছেলে-মেয়েরা বরদাস্ত করতে পারে না। এক একজন এক একটি দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন এবং কতকটা নির্বিরাগ হয়ে তারা বাস করে। মিসিজ রাপ ধনী মহিলা, ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা। তারই সুদে একলা-সংসার বেশ সচ্ছলভাবে চলে যায়। কিন্তু একা মানুষের জন্য রকমারি যন্ত্রপাতির সে এক বিরাট কারখানা! ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, মোটরের গ্যারাজ, রান্নার গ্যাস-উনুনের গ্যাজিট, ওঅশিং মেশিন, উপর-নীচে দুই রেডিও, বসবার ঘরে টেলিভিশন, খাওয়ার ঘরে ফ্রিজার--অর্থাৎ মিসিজের সর্বক্ষণ কাটে এসব যন্ত্রপাতির তত্ত্ব-তদবির ও তদারকিতে। যতক্ষণ ঘুম না আসে, ততক্ষণ চলে টেলি-ভিশনের ছায়াছবি ও হট্টগোল। মুখে-চোখে ক্লান্তি ও অবসাদ, উদ্বেগ ও উষ্ণতার ছাপ। দেখলে বেশ মনে হয়, তাঁর অন্তর-প্রশান্তি নেই। ধ্যান-ধারণার অবসর বা আত্মচিন্তার এক দণ্ড পরিমাণ সময় নেই—কৃত্রিম অভাব-বোধের চাপে তাঁকে সর্বদা তৎপর এবং নানা উদ্বেগে ও দুশ্চিন্তায় থাকতে হয়।

একদিন তাঁর রান্নাঘরের বিদ্যুৎ ও গ্যাসচুল্লির প্রশংসা করেছিলাম। শুনে দুঃখ প্রকাশ ক'রে বলেছিলেন, 'এ সব তো পুরনো মডেলের, নতুন মডেল হ'লে---'অর্থাৎ প্রতি বছর বিজ্ঞপিত নতুন যন্ত্রমডেলের নিত্য চমৎ-কারী আত্মপ্রকাশের ফলে বিচিত্র ক্ষোভ-দুঃখের শুরু। অশান্তির আর একটি

প্রধান কারণ সর্বক্ষণের জন্য আত্মসচেতন অবস্থা অর্থাৎ আমি আছি, আমার এটা ওটা প্রয়োজন, আমার আরো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চাই। তার ফলে আধ্যাত্মিক জীবন নোঙরহীন হয়ে পরমজনের চিন্তা থেকে বহু দূরে সরে আছে এবং সেজন্যই যত আত্মকৃত দুঃখ ও অভাববোধ। এ নিঃসঙ্গ মহিলাটির অতি উদ্বেগময় জীবনের দুঃখে অভিভূত হয়ে একদিন নাশ্তা খাওয়ার সময় তাঁকে বলেছিলাম, কি ক'রে সত্যিকার শান্তি ও আত্মতৃপ্তি লাভ করা যায়। বস্তুবাদী পাশ্চাত্যের দেউলিয়া জীবনের বহুবিধ দুঃখ ও বেদনাবোধের কারণ They hurry constantly and worry incessantly মানে তারা তাড়াহুড়া করে সর্বদা এবং দুশ্চিন্তায় ও উদ্বেগে অস্থির থাকে সর্বক্ষণ। এ উদ্বেগ এবং বস্তুর চাপে তাদের দেহের রাসায়নিক অসমতা দেখা দেয় এবং মনের ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হয়। ফলে দেহ-মনের ক্লান্তিকর অস্বাস্থ্য ও অশান্তি। পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায়ের কথা মধ্যযুগের সাধক দাউদজীর (দাদু) এক দোঁহা উল্লেখ ও তার অনুবাদ ক'রে বলেছিলাম ঃ

দেহ রহৈ সন্সারমে, জীও পিওকি পাস,
দাদু কুছ ব্যাপৈ নহী কাল-ঝাল-দুখ-ত্রাস।

একটু ব্যাখ্যা করেই বলতে হয়েছিল, "দেহ সংসারের জন্য এবং প্রাণমন থাক একান্তে তাঁর স্মরণে নিবেদিত। দাদু, তা' হলে কাল, ঝাল এবং দুঃখ-ত্রাস তোমার জীবনে ব্যাপ্ত হবে না।" সব শুনে মিসিজ রাপ হা ক'রে আমার দিকে নীরবে অনেকক্ষণ চেয়েছিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ হলো, দেহ থাকবে একদিকে, মন থাকবে তাঁর দিকে, সে আবার কি ক'রে সম্ভবপর হয়?

কি ক'রে হয়, তার উত্তর আমরা আমাদের সূফী-সাধক ও ভক্ত-কবিদের জীবন এবং কাব্য থেকে পেয়েছি এবং এই কাহিনীর সূত্র ধ'রে তাঁদের সাধনা ও সর্বাত্ম অনুভূতির কথা, সূফী-সাধনার একটি সহজ ও সরল ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করবো। এই সাধনার গূঢ় ও গুহ্য অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াকলাপের ভিতরে প্রবেশ আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য, কিন্তু ভাবরস এবং আনন্দ-চিন্তা ও প্রশস্ত পথের সাথে আমাদের পরিচয় সাধারণ জ্ঞানে এবং অতি আন্তরিকতায় সহজেই সম্ভবপর হতে পারে।

আমি কে? এই প্রশ্ন ক'রে যদি আপনাকে আবিষ্কারের অন্ধকার-পথে অগ্রসর হই, তবে দেখবো, আমার যত দুঃখ-শোক, দৈন্য ও অভাব-অতৃপ্তির মুখ্য কারণ একমাত্র 'আমি'।

আমি-চেতনা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আমি ক্ষুদ্র, বস্তু-সচেতন ও অতৃপ্ত অর্থাৎ আমাকে নিয়ে এবং আমার কামনা-বাসনা কেন্দ্র ক'রে যত বেশী চিন্তা করবো, আমার মাথা তত বেশী উত্তপ্ত এবং ফলে দেহ-মনের সাম্য, বাইরের জগতের সঙ্গে ভিতরের ঐক্য-সাধন এবং অন্তর-প্রশান্তি ক্রমশ অদৃশ্য হতে থাকবে। এই আমি-চেতনা বা আমি-চিন্তা থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টাই হলো মহত্তর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও অনুশীলন। এ আমি-চেতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ ও উপায়ের কথা পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে নানাভাবে ও আকারে-ইঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন শরীফের স্থানে স্থানে প্রায় বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে 'লাহুল মুলকুস সামা-ওয়াতি ওয়াল আরদ, লিল্লাহি মাফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ----' অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত কিছু তাঁর, আমার নয়, সেই পরমের, পরাশক্তির (পাঞ্জাবী সূফী কবিগণ আল্লাহ্‌কে শুধু 'পরম' শব্দে অভিহিত করেছেন)। তাই পরশ্রীকাতর নয় আমরা পরশ্রীআনন্দিত হবো। কারণ সব তাঁর, সেই পরমের এই বোধ যদি দৃঢ় হয় তবে দেখবেন, আপনার পাওয়া-না-পাওয়ার বেদনা আপনাকে পীড়া দেবে না, বিব্রত করবে না। আমাদের সূফী-সাধকগণ 'আমি কে' প্রশ্ন ক'রে ক'রে মূলে পৌঁছে দেখেছেন, তিনিই সব, আমি তাঁর আনন্দময় একটি সুন্দর প্রকাশ মাত্র। মধ্যযুগের ভক্তকবি কবীর বলছেন ঃ

যব মৈ থা তব পিও নেহী
যব পিও থা তব মৈ নেহী।

অর্থাৎ যতদিন আমি-চেতনায় মগ্ন ছিলাম, ততদিন প্রিয়তম ছিলেন না। যখন সে চেতনা অতিক্রম ক'রে প্রিয়তমের সঙ্গে বহু প্রত্যাশিত সাক্ষাৎ হলো, তখন একমাত্র তিনিই আমাকে পরিব্যাপ্ত ক'রে রইলেন।

আমি-চেতনা থেকে সাধক যখন প্রিয়তমের মধু ও বোধময় আনন্দে উত্তীর্ণ হন, আমি-জীবন থেকে পরমতমের জীবনে প্রয়াণ করেন, তখন গভীর তন্ময়তায় তিনি আপনার অন্তর-সত্তায় যে অনুভূতি ও উপলব্ধি লাভ করেন, তারই মর্ত্য নাম হলো প্রেম। তখন কুরআন শরীফের ভাষায় আশাদ্দু হুব্বাল লিল্লাহ্ অর্থাৎ একটু হালকা ক'রে বললে, সাধক তখন আল্লাহ্‌র প্রেমে হাবুডুবু খেতে থাকেন। তাঁর প্রেমে এভাবে আচ্ছন্ন ও অভিভূত হওয়ার প্রথম ও প্রধান সোপান হলো যিক্‌র অর্থাৎ তাঁর সর্বদা স্মরণ। কারণ এই সর্বক্ষণ স্মরণের দ্বারা সাধক আমি-চিন্তা থেকে মুক্ত

হয়ে হৃদয়ে সত্যিকার শান্তি-সুষমা ও সান্ত্বনা লাভ করেন। তার নজীর কুরআন শরীফে আছে ঃ

আলা বি যিক্‌রিল্লাহি ততমাইন্নুল কুলুব।

যিক্‌র ছাড়া হৃদয়ে শান্তি লাভের অন্য কোনও উপায় নেই। আমাদের সূফী-সাধকগণ তাই প্রেমিক এবং প্রেমের দায়ে তাঁরা আমি-চেতনা ভুলে নাফসি মুতমাইন্না অর্থাৎ প্রসন্ন, পরিতৃপ্ত ও নিস্তরঙ্গ 'আমি'তে প্রয়াণ ক'রে তাঁর চিন্তা ও ধ্যানে সর্বদা নিমগ্ন থাকেন। এভাবে প্রিয়তমের প্রাণময় সত্তায় লীন ও পূর্ণ আত্মনিমজ্জনই হলো সূফী-সাধনার পরম লক্ষ্য। আর আমাদের সূফী-সাধকগণ এই সাধন-পথের নির্দেশ এবং পথ চলার উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ করেছেন পবিত্র কুরআন থেকে। তাঁরা যিক্‌রে রত হয়েছেন, কারণ ঃ

'ফাযকুরূনি আয্‌কুর্‌কুম - - - - '
আমাকে স্মরণ ক'রো, আমি তোমাদের স্মরণ করবো।

বালা মান আসলামা ওয়াযহাহু লিল্লাহি
ওয়াহুয়া মুহসিনুন - - -
ফলহু আযরুহু 'ইন্‌দা রব্বিহি
ওয়াল খওফুন্ 'আলাইহিম
ওয়ালা হুম্ ইয়াহ্‌যানূন।

যে তার সমগ্র অন্তর-সত্তা আল্লাহ্‌র উদ্দেশে সমর্পণ করে এবং যে কল্যাণকামী, তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র কাছে---তার ভয় বা দুঃখের কোনও কারণ নেই।

অবশ্য সূফী-সাধকগণ পুরস্কার বা দুঃখ-ভয়ের অপেক্ষা রাখেন না। তাঁদের প্রেম অহেতুক এবং মন নির্লিপ্ত, নির্বিরাগ (জীবনের তুচ্ছ সুখ-দুঃখ ও রাগ-বিরাগের উর্ধ্বে) এবং সেজন্য নির্বিকল্প। আর আল্লাহ্‌র নিকট এই নিস্তরঙ্গ আত্মার প্রয়াণ প্রসন্নতাময় অর্থাৎ আশিক এবং মাশুক সাধক এবং সাধনার ধন একে অন্যের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন থাকেন---রাযিয়াতুম মর্‌যিয়া। প্রিয়তম পরমসুন্দর তখন সাধককে বলেন, ওয়াদখুলি জান্নাতি। আল্লাহ্‌র উন্মুক্ত এই জান্নাত তাঁর প্রেম ও প্রসন্নতা এবং পরম-প্রাপ্তির অমেয় শান্তি এবং আনন্দ-লোক।

এই আনন্দ-লোকে আমাদের উপমহাদেশের সূফী-সাধক ও ভক্ত কবিগণ প্রয়াণ করেছেন। তাই তাঁদের জীবন ও ভাবসম্পদ আমাদের এক

বিশেষ মূল্যবান আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার। সেই উত্তরাধিকার চেতনার তীব্রতা ও আন্তরিকতার উপর আমাদের বর্তমান বস্তু-বিক্ষুব্ধ জীবনের শান্তি ও সমতা একান্তে নির্ভর করছে।

বাঙলাদেশের রাজধানী ঢাকা সতের শ' মসজিদের শহর, আর সারা উপমহাদেশটি হাজার সূফী-সাধক ও আউলিয়ার দেশ। মধ্যযুগের সূচনা থেকে এদেশের শহর-গ্রাম ও বন্দরগা'য় মুসলিম মনীষী ও সাধকদের জ্ঞান এবং সাধন-চর্চা শুরু হয়।

বাঙলাদেশের এমন কোন স্থান নেই, সে যত দুর্গম ও জনবিরল প্রান্তর এবং হিংস্র প্রাণিসঙ্কুল বনভুমি হোক না কেন, যেখানে দু'-তিনশ' বছরের একটি যত্ন-লালিত মাযার এবং ভগ্ন মসজিদ চোখে পড়বে না।

বাঙলাদেশ ব্রিটিশ আমল থেকেই মুসলিম-প্রধান হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ আউলিয়াদের আকর্ষণীয় চরিত্র-মাহাত্ম্য, বিস্ময়কর প্রচার-শক্তি ও আত্মত্যাগ। সূফী-দরবেশদের শহীদী রক্তও ব্যাপক ইসলাম প্রচারের ভিত্তিমূল গড়ে তোলে। তাঁদের অনেকেই বিরুদ্ধ শক্তির নিকট নানাভাবে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের ঈমানের বল ও চরিত্র-শক্তি তৎকালীন হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজের সর্বস্তরে এক বিরাট ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে।

এই উপমহাদেশের মুসলিম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেও এদেশে ইসলামের প্রচার শুরু হয়। বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে মুসলিম মনীষী ও আউলিয়াগণ এদেশে ইসলাম প্রচারে আসেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন আরবের অধিবাসী—বিশেষ ক'রে আরব জাতির লালনভূমি ইয়ামনের বাসিন্দা। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ারের লক্ষণাবতী বিজয়ের বহু পূর্বে বাঙলা-দেশে মুসলিম-প্রধান ছোট ছোট এলাকা বিদ্যমান ছিল। এই সব স্থানের মুসলমানগণ বেশির ভাগ ছিলেন আরব সাধক ও বণিকদের বংশধর। সমুদ্র-পথে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আরব বণিক ও আউলিয়াগণ এদেশের অভ্যন্তরে দুর্গম ও দুরতিক্রম্য স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। ইসলামের শান্তি ও সত্যের বাণী এবং তার অদম্য শক্তি-প্রভাব চারদিকে প্রচারিত ও প্রসারিত হতে থাকে।

প্রাক্-মুসলিম যুগের সূফী-সাধকদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন মদনপুরের শাহ্ মুহম্মদ রুমী। ১০৫৩ সালে (৪৪৬ হিজরী) তিনি ময়মন-সিংহে আসেন এবং মদনপুরে বসবাস শুরু করেন। শাহ্ রুমী বিপুল আধ্যা-

ত্মিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। শুধু স্থানীয় জমিদারগণই নয়, কোচ-রাজও তাঁর এই শক্তিতে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হ'য়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

বারো আউলিয়ার দেশ নামে খ্যাত চট্টগ্রামের দ্বাদশ সুফী-সাধকের মধ্যে বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিলেন 'পীর বদর' শাহ্ এবং মুহসিন আউলিয়া। বদর শাহ্ 'পীর বদর' নামেই অধিক খ্যাত ছিলেন। ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তিনিই অগ্রণী এবং অধ্যাত্মক্ষেত্রে অগ্রবর্তী। হিন্দু-মুসলিম, খ্রীস্টান ও বৌদ্ধ সকল ধর্মের লোকদের উপর তিনি এক স্থায়ী ও সর্ব-ব্যাপী প্রভাব বিস্তার করেন। প্রতি রমযান মাসের ২৯ দিনে বিভিন্ন ধর্মের ভক্তগণ পীর বদরের 'উরস' উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন। চট্টগ্রামের আধ্যাত্মিক অভিভাবক পীর বদর শা'র সমাধিস্থান শহরের বখশী বাজার অঞ্চলে অবস্থিত। বারো আউলিয়ার অন্যদের রওযা মুবারক শহরে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। বস্তুত চট্টগ্রাম শহর ও জেলা এই উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের প্রথম প্রবেশিকা সিংহদ্বাররূপে অশেষ গর্ব ও গৌরবের দাবীদার। অষ্টম এবং নবম শতকে চট্টগ্রাম আরব বণিকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে। ধীরে ধীরে তাদের উপনিবেশ স্থাপন শুরু হয় এবং সেই সঙ্গে দরবেশ ও আউলিয়াগণ ইসলামের বাণী প্রচারে তৎপর হন। চট্টগ্রাম জেলার সর্বত্র বহু সঠিক দরবেশের মাযার বিদ্যমান, কিন্তু অনেকেরই পরিচয়-তারিখ এবং এদেশে তাঁদের আগমনের সঠিক বৃত্তান্ত ও সাধন-কর্ম অজ্ঞাত এবং অপ্রতিষ্ঠিত থেকে গেছে।

চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে হযরত শাহ্ জালাল তিন শ' ষাট জন আউ-লিয়া সঙ্গীসহ এদেশে আগমন করেন। সেই সময়কার মুসলিম সুলতান-দের পূর্ব সীমান্তে তিনি ইসলাম প্রচারে তৎপর হন। তাঁর আধ্যাত্মিক ও সংগঠন-শক্তির ফলে সিলেট অঞ্চলে ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। শাহ্ জালাল (রঃ)-ও ছিলেন আরবের অধিবাসী। ইয়ামন দেশ থেকে দিল্লী হয়ে তিনি সিলেট আসেন এবং সেখানেই তাঁর সাধন-সিদ্ধির বাস-ভূমি রচনা করেন। আজও হিন্দু ও মুসলিম ভক্তগণ সিলেটের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত শাহ্ জালাল (রঃ)-এর দরগা যিয়ারত ক'রে থাকেন।

হযরত শাহ্ জালাল (রঃ)-এর অধিকাংশ আউলিয়া-সঙ্গী সিলেট জেলার পর্বত ও অরণ্য অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। তাঁদের মাযার এই জেলার প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। হযরত শাহ্ জালালের নির্দেশে তাঁর অন্যতম সঙ্গী হযরত শাহ্ মালিক (রঃ) ইয়ামনী ঢাকায় আসেন এবং কঠোর সাধক-

জীবন যাপন করেন। বাঙলাদেশ সরকারের সদর দফতর ইডেন বিল্ডিং-এর দক্ষিণ-কোণে তাঁর মাযার বিদ্যমান। শাহ মালিকের জীবন ও কর্ম-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না।

হযরত শাহ্ মালিক ইয়ামনীর সমাধির পাশেই হযরত শাহ্ বল্খী (রঃ)-এর মাযার। মালিক ইয়ামনীর ইসলাম প্রচারে সাহায্যের জন্য তিনি ঢাকা আসেন। তাঁরা দু'জনেই মুসলিম শাসনকালে এদেশে ইসলাম প্রচার শুরু করেন ব'লে বাবা আদম মক্কী (রঃ) এবং অন্যান্য প্রাথমিক যুগের সূফী-সাধকের মতো অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন তাঁদের সহ্য করতে হয়নি।

বাবা আদম মক্কী ছিলেন একজন বিখ্যাত সূফী-সাধক ও প্রচারক। বিক্রমপুরের রামপালের নিকটবর্তী আবদুল্লাহ্পুর গ্রামে তিনি বাস স্থাপন ও প্রচার কার্য শুরু করেন। বল্লাল সেন ছিল তখন বিক্রমপুরের এবং পার্শ্ব-বর্তী অঞ্চলের রাজা। বাবা আদমের আধ্যাত্মিক শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করে। তাঁর প্রভাব ও ইসলাম বিস্তারে ক্রুদ্ধ হ'য়ে বল্লাল সেন সসৈন্যে বাবা আদমকে আক্রমণ এবং দলবলসহ তাঁকে হত্যা করে। বাবা আদমের শহাদৎ খুনের উপর বিক্রমপুর অঞ্চলে ইসলামের বুনিয়াদ সুদৃঢ় হয়, সত্য ও শান্তির বাণী চারদিকে প্রচারিত হয়ে এক নতুন যুগ ও জীবনের সূচনা করে।

বিভিন্ন সূফী মতবাদ ও সম্প্রদায়ের ভক্ত ও বিশ্বাসী সাধকগণ বাঙলা-দেশের স্থানে স্থানে খানকাহ্ স্থাপন করেন। কোন কোন বাঙালী সূফী-সাধকের দরজা ও সাধন-শক্তি এতো উচ্চ স্তরে উন্নীত হয় যে, তাঁদের শিষ্যদের মধ্যে জৌনপুরের বিখ্যাত সাধক হযরত মীর সাইয়েদ আশরাফ জাহাঁগীর সিম্মানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন বাঙালী সূফী-সাধক শায়খ 'আলাউল হকের শাগরিদ। জৌনপুরের সুলতান ইব্রা-হীম শরকীকে এক পত্রে হযরত সিম্মানী (ওফাতের সাল ১৩৮০ খ্রীঃ) বলেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। বাঙ্গাল দেশ একটি পবিত্র ভুমি, কারণ তার বুকে বহু দিক থেকে আউলিয়াগণ এসে বাসভূমি নির্মাণ করেন। শায়খ-প্রধান হযরত শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহ্রাওয়ার্দির সত্তর জন শিষ্য দেবগাঁয়ের সমাধি ভূমে শায়িত আছেন। দেওতলা ছিল জালালিয়া তরীকার দরবেশগণের সাধনক্ষেত্র। কাদিরখানি তরীকার দ্বাদশ দরবেশের অন্যতম হযরত শায়খ শরফুদ্দীন তওয়ামাহ্ সোনার গাঁয়ে দেহ রক্ষা করেছেন। এদেশের এমন

গ্রাম বা শহর নেই, যেখানে পীর-দরবেশদের আগমন বা তাঁদের পবিত্র বাস-স্থান ও রওযাভূমি রচিত হয়নি। সুহরাওয়ার্দি তরীকার বহু সাধকের ইন্তিকাল হয়েছে। কিন্তু যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের সংখ্যা এখনো অধিক।"

বাঙলাদেশ বহু সূফী-দরবেশ ও পীর-আউলিয়ার পদধূলিতে পবিত্র। এই সূফী-সাধকের জীবনবৃত্তান্ত ও প্রচার-কর্মের বিস্তৃত বিবরণ আমরা বিশদ-ভাবে লাভ করি ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সাহেবের 'A History of Sufism in Bengal,' 'পুর্বপাকিস্তানে ইসলাম' এবং 'বঙ্গে সূফী-প্রভাব' গ্রন্থত্রয়ে। বাঙলা একাডেমী প্রকাশিত ডক্টর গোলাম সাকলায়েন সাহেবের 'পুর্ব-পাকিস্তানের সূফী-সাধক' গ্রন্থটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বাঙলাদেশের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। তাই এই উপমহাদেশের মধ্য ও পশ্চিম প্রান্তের সূফী-দরবেশ জীবন এবং তাঁদের আনন্দ ও রসময় আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে সেই পরিচয় পূর্ণাঙ্গ ও নিবিড় করবার জন্যই পরবর্তী বিশদ আলোচনা অবতারণা ভারতে ও পাকিস্তানের খ্যাতনামা সূফী-সাধক ও কবিদের কাব্য এবং সঙ্গীত-সংকলন সুরক্ষিত ব'লে তাঁদের সাধনা এবং আত্মপ্রকাশের আনন্দ-বেদনা ও রসরূপ আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু বাঙলাদেশের সূফী-সাধকের বাণী বা কথামৃতের তেমন কোনও ধারাবাহিক সযত্ন সংকলন নেই ব'লে তাঁদের আত্মপ্রকাশের আনন্দ-স্পর্শ থেকে আমরা বঞ্চিত। এদিক থেকে গবেষণা ও আবিষ্কারের যথেষ্ট অবকাশ আছে। অবশ্য বাঙলাদেশের প্রাথমিক সূফী-সাধকগণ সক্রিয়ভাবে ইসলাম প্রচারে ব্যস্ত ও সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, ব্যক্তিগত সাধনার দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ ক'রে ইসলামের প্রচার-কার্যে তাঁরা রত হন ব'লে আত্মগত ও ভাবমুগ্ধ সাধক-মনের আনন্দ-বেদনা প্রকাশের সময় ও সুযোগ তাঁরা পান নি। কিন্তু পরবর্তীকালের সাধকগণ এ দেশের ভাষা শিক্ষা ও কবি-কর্মের প্রচুর অবসর পেয়েছেন। তাঁদের বাণী ও রচনা কেন লিপিবদ্ধ হয়নি, সে প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের কোন কোন সূফী-সাধকের কবি-মনের প্রকাশ ও পরিচয় দুর্লভ নয়। কিন্তু তার অধিকাংশই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও অপরিজ্ঞাত। একদিন তাঁদের রচনা কালি-কলমে স্পষ্ট হয়ে উঠবে, সে ভরসা আমাদের আছে।

এই উপমহাদেশের মধ্য ও উত্তরভাগের হযরত খাজা মঈনউদ্দীন চিশতী (রঃ) ইসলাম প্রচারে ও সূফী ভাব-সাধনায় আজও 'সুলতানুল হিন্দ্'

রূপে এ অঞ্চলের সূফী-সাধকদের তাজস্বরূপ সকলের অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছেন। তিনিও ইসলাম প্রচারের জন্য তাঁর বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা সংগ্রাম করেছেন। তাঁর সূফী-সাধনার কথা আমরা যা জানি তাও পরিপূর্ণ নয়। তাঁর উপদেশ বাণী ও আদর্শ-সুন্দর জীবন-যাত্রার মধ্যে সূফী ভাব-জীবনের কথা আমরা কিছুটা জানতে পারি।

উনবিংশ শতকের বাউল-শ্রেষ্ঠ লালন শাহ্‌কে আমরা তাঁর অফুরন্ত সাধন-সঙ্গীতের ভাবরসে স্পষ্ট ক'রে পাই। সূফী মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও মূলত তিনি ছিলেন বাউল তত্ত্ববাদী অর্থাৎ মরমী কবি। কাছে থেকেও যিনি দূর রচনা করেন, যাঁকে পেলে সকল শোক-দুঃখ ও ভাবের যম-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ হয় এবং যে সাঁই বস্তুরূপে শুরু ক'রে অনন্তরূপে প্রচ্ছন্ন হয়ে রইলেন, তাঁকে খোঁজাই ছিল লালনের জীবন-সাধনা। তাই, দেহকে জরীপ ক'রে অর্থাৎ বস্তু-চেতনার ভিতর দিয়ে তাঁর অলক্ষ্য পড়শীর সন্ধান শুরু হয়েছে। লালন শা'র----

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে,
আমার বাড়ীর কাছে এক আরশী নগর
সেথা এক পড়শী বসত করে।
o o o

অথবা,

সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে।

সীমা-অসীমের তত্ত্ব লালন বিস্ময়কর সহজতায় ও সঙ্গীত-রসে প্রকাশ ক'রে বলছেন ঃ

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়,
ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায়।

বাউল ধর্মসাধনার গুহ্য যোগক্রিয়া, মরমীবাদের সাংকেতিক শব্দচিত্র ও নানা তত্ত্বকথার অবতারণা করলেও লালনের সহজ কবি-মন সেই পরম-জনের সন্ধানে কেমন উচ্ছ্বসিত ও অধীর হয়ে উঠেছে যখন শুনি ঃ

আমি কোথায় পাবো তারে
আমার মনের মানুষ যেরে।

অথবা

মনের মধ্যে মনের মানুষ ক'রো অন্বেষণ।

তখন সেই অন্বেষণে অন্য ভক্তমনও চঞ্চল ও রসাবিষ্ট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে লালনের আধ্যাত্মিকতার একটি সগোত্রতা আছে। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে সুরেরও। যেমন—লালনের

'যা করবি তুই এই দুনিয়ায়
সেই জিনিস তোর সঙ্গে যাবে।

গানটির সুর-সাদৃশ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে'—গানটির সুররূপ দিয়েছিলেন। লালনের ভাব-সাধনার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর 'মানুষের ধর্মে' বাউল ধর্ম-সাধনার সমর্থনে এ কথার প্রমাণ বিদ্যমান।

সিদ্ধ বাউল কবি লালন মানুষকেই সাধনার অবলম্বন করেছিলেন। মানুষকে কেন্দ্র ক'রেই মনের মানুষের সন্ধানে তিনি তৎপর হয়েছেন। এই সন্ধানপরতা রবীন্দ্রনাথেও আমরা রসমধুর ও ভাবপুষ্ট হতে দেখি। কিন্তু কী আশ্চর্য পরিচ্ছন্নভাবে ও ভাষায় লালন মানুষ ও পরম-মানুষের ব্যবধানের কল্পনা করেছেন! তাঁর কথায়ঃ

খুঁজিতে বান্দার দেহে
খোদা সে রয় লুকাইয়ে
আহাদে মিম বসাইলে
আহ্মদ নাম হয় কি না।

অর্থাৎ হযরতের নাম আহমদ থেকে 'মিম' বাদ দিলেই 'আহাদ'—এক আল্লাহ্ স্পষ্ট হয়ে ওঠেন। এদিক থেকে আমাদের এই উপমহাদেশের সূফী-সাধকদের সঙ্গে লালনের ভাব-সগোত্রতা বিদ্যমান অর্থাৎ তাঁরাও মানুষ হযরত মুহম্মদকে কেন্দ্র ক'রে, তাঁর ভালবাসায় মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পরমতমের প্রেমে ও রঙে (পবিত্র কুরআনের ভাষায় 'সিবগাতুল্লাহ্') মস্ত ও রঞ্জিত হয়েছেন। এদিক থেকে বাউল ও সূফী-সাধকদের অন্তরঙ্গতা (অন্তরের রঙ বা আশিক-মাশুকের বিরহ-মিলনের আনন্দ-লালা) বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তার অন্যতম কারণ শরীয়ত বা মা'রিফত যে পথই হোক না কেন, সেই পরমসুন্দরের প্রেমের পথেই তাঁদের সকলের অভিসার-যাত্রা চিরন্তন হয়েছে।

লালন শা'র সঙ্গীত আমাদের জাতীয় সম্পদ। এদেশে বাউল গানের অন্ত নেই। কিন্তু লালন শা'র মতো এরূপ পরিচ্ছন্ন দিব্যদৃষ্টি অন্য কোনও বাউলের

ছিল না ব'লে তাঁর সঙ্গীত সম্পূর্ণ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও গভীর রসতত্ত্বে অদ্বিতীয়। সহজ বাঙলা শব্দের বিন্যাসে ও ব্যবহার গুণে যে কত সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম ভাব ও তত্ত্ব-বৈচিত্র্য ক্রমশ স্পষ্ট ও অনুভববেদ্য হয়ে উঠতে পারে, তার পরিচয় লালন শা'র সঙ্গীতে বিদ্যমান। সহজ ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশভঙ্গির ভেতর দিয়ে কত কালের ক্রমবিবর্তিত সাধনা ও লোকোত্তর চেতনায় সমৃদ্ধ লালন শা'র হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও আবেগদীপ্ত হয়ে উঠেছে। তাই লালন শা'র সঙ্গীত আমাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের এক বিশিষ্ট অংশ অধিকার ক'রে আছে।

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিধাগ্রস্ত ও অবিশ্বাসের যুগে সূফী-সাধকদের অধ্যাত্ম সাধনা আমাদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ ও দিগদর্শী হয়ে থাকবে। সূফী-সাধক ও আউলিয়া-দরবেশগণ শুধু ইসলামই প্রচার করেন নি, তাঁরা সহিষ্ণুতা ও শান্তির আদর্শ স্থাপন ক'রে ভাব ও অধ্যাত্ম জগতে এক পরম আনন্দ-লোকের সন্ধান দিয়েছেন।

বাঙলার সূফী-সাধক

বাঙলায় মুসলিম প্রচার ও প্রসার এবং আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অত্যাচার ও অকথ্য নির্যাতন থেকে বৌদ্ধ এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের উদ্ধার ও ত্রাণকল্পে সূফী-সাধক ও আলেমদের সাধন-তৎপরতা বিশেষভাবে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হয়। মধ্যযুগের প্রথম থেকেই বাঙলার সুগম ও দুর্গম স্থানসমূহে সূফীদের খানকাহ্ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং এসব খানকাহ্কে কেন্দ্র ক'রে বাঙলা ও বাঙলায় মুসলিমদের আধ্যাত্মিক, মানবিক ও মানসিক জীবনের ভিত্তিভূমি গড়ে ওঠে। মুসলমান-দের এবং বাঙালী সমাজের উন্নতিও সেই সঙ্গে ব্যাপকভাবে শুরু হয়।

এখন 'সূফী' নামের উদ্ভব সম্বন্ধে কয়েকটি মতের উল্লেখ করা যাক। মুসলিম মরমীবাদী ও সাধকদের সাধারণত 'সূফী' ব'লে অভিহিত করা হয়। 'সূফী' নামে এক প্রকার রুক্ষ পশমী পোশাক সূফীরা পরতেন ব'লে এই নামের উৎপত্তি। কারো মতে আরবী 'সাফা' (পবিত্র অর্থে) থেকে 'সূফী' শব্দের উদ্ভব। অন্য মতে 'সুফ্ফা' অর্থাৎ ঘরের ছাদ থেকে 'সূফী' কথার আবর্তন। হযরতের কিছু সংখ্যক সাহাবী ধর্মপ্রাণতা ও কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁরা হযরতের তৈরী মসজিদে বাস করতেন এবং ছাদে নিদ্রা যেতেন। তাই তাঁরা সুফ্ফার লোক অর্থাৎ 'সূফী' ব'লে পরিচিত হন। সে যা-ই হোক, 'সূফী' শব্দের প্রচলন হয় হিজরী সালের দ্বিতীয় শতকে।

পবিত্র কুরআন থেকে সূফীরা প্রেরণা ও তত্ত্বজ্ঞানের নির্দেশ লাভ করতেন। হযরতকে প্রথম এবং আলীকে তাঁরা দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক গুরু এবং হাদী ব'লে শ্রদ্ধা করেন। প্রথম পর্যায়ে আল্লাহ্র প্রতি ভয় এবং নির্মম কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা সূফী সাধকগণ তাঁর প্রসন্নতা লাভে প্রয়াস পান। এই পর্যায়ের সূফীদের মধ্যে হাসান বসরীর (৬৪৩-৭২৮ খ্রীঃ) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ্র ভয়ে সর্বদা রোদনের ফলে তাঁর চক্ষু প্রায় অন্ধ হয়ে

আসে। পরবর্তীকালে এই ভয় নির্ভয় ভক্তিতে পরিণত হয় এবং প্রেমের ভেতর দিয়ে পরম প্রিয়তমের সঙ্গ ও সান্নিধ্য লাভ সূফীবাদের প্রধান লক্ষ্য ও অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। এই পর্যায়ের সূফীদের মধ্যে তাপসী রাবি'আর (৭১৩-৭৮১ খ্রীঃ) নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে। পরমতমের সঙ্গে প্রেমের অবিচ্ছেদ্য যোগ-সম্বন্ধের প্রাণবন্ত প্রকাশ আমরা তাঁর ভক্তিময় জীবনে পূর্ণতা লাভ করতে দেখি। ইশকে হাবীবিতে তিনি আচ্ছন্ন ও সর্ব মুহূর্তের ভাব-চেতনায় আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্‌র প্রেম আমাকে এমন গভীর-ভাবে আবৃত ও অভিভূত করেছে যে, অন্য কোন ব্যক্তি বা বিষয়ের প্রতি গভীর ভালবাসা অথবা ঘৃণার ভাব পোষণের স্থান আমার হৃদয়ে নেই।

দশম শতক থেকে সূফীবাদ গ্রীক দর্শনের প্রভাবে প্রচ্ছন্নবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি, সৃষ্টিই আল্লাহ্‌ অর্থাৎ স্রষ্টা ও সৃষ্টি অবিচ্ছেদ্য। সৃষ্টির ভেতর দিয়ে তিনি আপনাকে প্রকাশ করেন এবং সৃষ্টির বাইরে তাঁর কোনও পৃথক অস্তিত্ব নেই। কারো কারো মতে বেদান্তের অদ্বৈতবাদের দ্বারাও এই মত প্রভাবিত হয়। কিন্তু সত্যিকার মুসলিম সূফিগণ দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করতেন, সৃষ্টির ভিতর তিনি সীমাবদ্ধ নন, সব কিছুকে বিধৃত ক'রেও তিনি সৃষ্টির অতীত হয়ে আছেন। এই অতিক্রমণ-বাদ অর্থাৎ আমার (সৃষ্টির) অন্তরতম হয়েও তিনি দূরে (রবীন্দ্রনাথের 'কাছে থেকে দূর রচিল কেন গো আঁধারে।' লালন শা'র—'সে আর লালন একখানে রয় লক্ষ যোজন ফাঁক রে।' কবীরের—সব সাঁসো কি সাঁস মে।')—এই কাছে থেকে দূরের লীলা, বিরহ-মিলনের আনন্দ-বেদনা এবং পরম প্রিয়তম মাশুকের জন্য আশিকের তীব্র বেদনাবোধ ও অবিরাম সন্ধানপরতা না থাকলে সূফীর প্রেম যে নিরর্থক হবে! মাশুকের সঙ্গে আশিকের একাত্ম হওয়ার অন্য অর্থ যে মৃত্যু! মাশুক তো ধরা দেওয়ার ধন নয়, নয় বলেই তো সূফীর অস্তিত্ব এতো আনন্দবহ ও বেদনাময় এবং তাঁর মিলন-প্রয়াস ও অভিসার চিরন্তন এবং রসময়!

সূফীদের মতে পবিত্র কুরআনের দুই অর্থ—একটি প্রকাশ্য, অন্যটি প্রচ্ছন্ন বা গূঢ়। তাঁরা এই গূঢ় অর্থ অর্থাৎ মা'রিফাতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের জন্য তাঁরা প্রেমের পথ অব-লম্বন ক'রে সাধনায় মগ্ন হয়েছেন। ধর্মের মূলে প্রেম সৃষ্টির কারণ ও ক্রম-বিকাশের মূলেও আছে প্রেম। এক কথায় আল্লাহ্‌র সঙ্গ ও অন্তরঙ্গতা লাভের একমাত্র সুনিশ্চিত পথই হলো প্রেম। তাই সূফীবাদের লক্ষ্য

আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রেমের ভিতর দিয়ে আপনার আত্মসত্তার ক্রমোন্নতি বিধান করা। সূফীদের আধ্যাত্মিক প্রগতিকে যাত্রা বা সুদীর্ঘ ভ্রমণ (রসাবিষ্ট সূফীর ভাষায় অভিসার-যাত্রা) এবং সাধককে সালিক বা পর্যটক বলা হয়। আল্লাহ্‌র সন্ধানে যাযাবর আত্মা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে (মকামাত) ক্রমশ প্রয়াণের দ্বারা আল্লাহ্‌র সত্তা সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানে (মা'রিফাত) উত্তীর্ণ হয়। বিভিন্ন মকাম বা স্তর পার হওয়ার সময় সাধক চলার পথে (তরীকত) বিভিন্ন অবস্থা (আহওয়াল) সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তার শেষ প্রান্তে বহু প্রত্যাশিত আল্লাহ্‌র সঙ্গ বা মধুমিলন অর্থাৎ (ফানা ফিল হাকীকত) পূর্ণ সত্যে সাধক-সত্তার নির্বাণ বা নিমজ্জন। ফানা হ'লো আত্মবিলোপের স্তর, যখন অনুসন্ধানী সূফী আল্লাহ্‌র স্থায়ী প্রেমের বিশুদ্ধ আনন্দবোধে আপনার সব কিছু বিস্মৃত হন। শেষ স্তর, বাকা বিল্লাহ্। তখন সূফী আধ্যাত্মিক পূর্ণতায় উপনীত হন এবং পরম সত্য-সুন্দরের সান্নিধ্য লাভের দ্বারা অনন্ত শান্তিতে বাস করতে থাকেন।

সূফী-সাধকগণ সাধনার বিভিন্ন স্তর পার হয়ে এক আকস্মিক আবেগ-মুহূর্তে পরম সত্য ও সুন্দরকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেন। সেই সৌভাগ্যময় প্রশান্ত আনন্দ-লীন মুহূর্তে তাঁরা আপনাদের সাধন-সত্তা বিস্মৃত হন। 'আমি' এবং 'সে' এই দুই অস্তিত্ববোধ তাওহীদ বা তাঁর একত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাই আশিক, মাশুক ও ইশক এক এবং একাকার। মরমী অন্তর্দৃষ্টি এবং ধর্ম-জ্ঞানের সমন্বয়চেষ্টা সাধক যুনায়েদের (মৃত্যু ২৯৮ হিজরী) জীবন সাধনায় একটি অভাবনীয় রূপ লাভ করে। পবিত্র কুরআনের বাণী নির্ভর ক'রে তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র সঙ্গে মানুষের যে চুক্তি সম্পাদন হয়েছে, তা পূর্ণ করবার জন্য মানুষের যতো সংগ্রাম—যাতে সে তাঁর কাছে মৌলিক রূপান্তরে ফিরে যেতে পারে। তিনি শিক্ষা দিলেন, মানুষের মৃত্যু হলেও ব্যক্তিরূপে সে বেঁচে থাকে, সে ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তি-সত্তা তাঁর মাধ্যমে এবং তাঁতে পূর্ণতা লাভ করে। সূফী-প্রেমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে প্রাথমিক সূফীদের অন্যতম বিখ্যাত মা'রুফ আল্ কারখী বলেন, এই প্রেম আল্লাহ্‌র দান বা নিয়ামত, মানুষের কাছ থেকে তা শেখা যায় না।'[১]

---

১ তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি,
'তুমি আল্লাহ্‌র এক অতিথি। অতিথির যোগ্যমতোই তুমি ব্যবহার করবে। তোমাকে খেতে পরতে দেওয়া হবে—সে অধিকার তোমার আছে। কিন্তু দাবী করবার অধিকার তোমার নাই।'

আল্লাহ্‌র জন্য সূফী যে প্রেমের আবেগ-আনন্দ অনুভব করেন, তার সঙ্গে মিশে থাকে বিরহের অর্থাৎ স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার বেদনা। যতক্ষণ চরম ভাব-মুহূর্ত অক্ষুণ্ণ থাকে, ততক্ষণ মিলনের আনন্দ, তারপরই বিচ্ছেদ। তিনি প্রতীক্ষা ক'রে থাকেন, আবার কখন অনিত্য মর্ত্যলোকের পরিবেশ থেকে তিনি পৃথক হয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন। যুনায়েদের শিষ্য হল্লাজ এই আনন্দময় অভিজ্ঞতার ভাবৈকরসে এমন অভিভূত হন যে, তিনি মানুষের দ্বৈত সত্তা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যান। আল্লাহ্‌ই প্রেম এবং প্রেমের দ্বারা তিনি মানুষকে আপনার রূপে সৃষ্টি করেন, যাতে অন্তর-গভীরে সেই রূপ প্রত্যক্ষ ক'রে মানুষ আল্লাহ্‌র গুণে অন্বিত বা বিকল্পে প্রেমে নিমজ্জিত হয়। হল্লাজ 'হুলুল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ যে অবস্থায় সাধকের আত্মবিলোপ ঘটে—সাধকের সত্তা পরম সত্তায় লীন হয়ে অন্তরতমরূপে বাস করে। হয়তো এমনি এক পরম বোধময় আনন্দ মুহূর্তে তিনি তাঁর বিখ্যাত ও ভয়াবহ উক্তি ক'রে বলেছিলেন, 'আনা'ল হক'-আমিই সৃজনশীল সত্য। ৯২২ খ্রীস্টাব্দে মনসুর আল্‌ হল্লাজের প্রাণদণ্ড হয়। দণ্ডের প্রাক্কালে তিনি প্রার্থনায় বললেন, 'আল্লাহ্‌, তোমার ধর্মের উৎসাহে, তোমার প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে যে সকল দাস আমাকে হত্যা করার জন্য এখানে সমবেত হয়েছে, তাদের তুমি ক্ষমা ক'রো, করুণা করো। কারণ আমার কাছে তুমি যা প্রকাশ করেছ, তা যদি তাদের কাছে ব্যক্ত করতে, তবে তারা যা করেছে তা করতে পারতো না। যা তুমি তাদের কাছে অব্যক্ত রেখেছো, তা যদি আমার কাছে গোপন রাখতে তবে আজ আমাকে এই দুঃখ ভোগ করতে হতো না। সমস্ত প্রশংসা তোমার। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।' হল্লাজ-রচিত 'কিতাবুত্‌ তওয়াসীন' গ্রন্থ 'আমিই সৃজন-শীল সত্য'-তত্ত্বের প্রকাশ অন্তেমিল আরবী গদ্যে কতকটা দুর্বোধ্য ও রহস্য-ময় হয়ে উঠেছে।

হল্লাজের প্রাণদণ্ডের পর থেকে সূফী-সাধকগণ প্রায় নিশ্চুপ হয়ে পড়েন। তাঁদের সতর্ক উক্তিতে সাধনার গভীর ও গোপন আনন্দ অভিজ্ঞতার কথা সাধারণ্যে অপ্রকাশ্য হয়ে রইলো এবং তা হয়ে দাঁড়ালো এক একটি সাধন-ধারার গুহ্য তত্ত্ব ও তথ্য। সূফীদের ভাষাও হয়ে পড়লো অবগুন্ঠিত এবং নানা ইঙ্গিত ও হেঁয়ালীপূর্ণ। প্রেমের উপমা ও উৎপ্রেক্ষারূপে সুরা ও সাকীর আমদানি হলো। যাঁরা সূফী ভাবের গোপন অন্তরমহলের চাবিকাঠির অধিকারী, তাঁরাই শুধু সূফী ভাবধারার কবিতা ও সঙ্গীতের

গূঢ় অর্থ অনুধাবন করতেন। হল্লাজের পরে সূফীসম্প্রদায় সাধারণের সন্দেহভাজন হয়ে পড়ে। বিশেষ ক'রে শরীয়তপন্থীদের এবং তাদের অনুযোগের কারণও ছিল প্রচুর। পারস্যের সূফী আবু সা'য়ীদ (মৃত্যু ১০৪৯ খ্রীঃ) মনে করতেন, মরমী ভাব-পথের যে পথিক, আল্লাহ্‌র প্রেম তার একমাত্র আনন্দ-অবলম্বন, শরীয়ত তার জন্য অনাবশ্যক। তিনি তাঁর শিষ্যদের জন্য হজ্জ নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু প্রাথমিক সূফী-সাধকগণ সুন্নাহ্‌র অনুসারী ছিলেন।

শরীয়তের সাথে সূফী মতবাদের সম্বন্ধ ও সমন্বয় সাধন এবং রক্ষণশীল ধার্মিকদের মনে তার দাবি ও প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেন ইসলাম ধর্ম-জগতের বিশিষ্ট সাধক-মনীষী আবু হামিদ আল-গায্‌যালী। তুস শহরে ১০৫৯ সালে তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু ১১১১ খ্রীস্টাব্দে। তিনি বাগদাদের নিযামিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক ছিলেন। হাদীস, ইসলামের ধর্ম-নীতি ও আইন-কানুনের ক্ষেত্রে তাঁর কথাই সে যুগে সর্বাধিক প্রামাণ্য ব'লে গণ্য হতো। কিন্তু পাণ্ডিত্যে ও শাস্ত্র-আলোচনায় তিনি আধ্যাত্মিক শান্তি ও তৃপ্তি খুঁজে পেলেন না। চিন্তা, অনুমান ও অধ্যয়নে তাঁকে পাওয়া যায় না—এ কথা নিশ্চিত জেনে অধীর চিত্তে তিনি অধ্যাপনা ত্যাগ ক'রে সত্যের সন্ধানে বে'র হলেন। ধর্ম-শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তিনি ঘুরে বেড়ালেন। কিন্তু সেগুলো তাঁর কাছে নিরর্থক মনে হলো। ইমামদের অলৌকিক শক্তি, নির্ভুলতা ও অবতারবাদে তিনি আস্থাবান হ'তে পারলেন না।

শেষে তিনি দৃষ্টি দিলেন সূফীবাদের দিকে। তিনি দেখলেন এবং গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন, প্রেমের পথে দেহের সকল আরাম-আয়েশ ও আনন্দ-সুখ উপেক্ষা ক'রে এবং মনকে সকল কুৎসিত কামনা-বাসনা ও অসৎ চিন্তা থেকে মুক্ত রেখে চিত্তশুদ্ধির দ্বারা একমাত্র তাঁর স্মরণে বা যিক্‌রে রত হয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। মনকে সর্বক্ষণের জন্য তাঁর চিন্তায় ও ধ্যানে মগ্ন রাখলেই প্রেমের পথে আত্ম-নিমজ্জন সহজ ও সুগম হ'য়ে আসে। কিন্তু সূফীতত্ত্বের গোপন কথা শেখা যায় না। এক আনন্দময় পরম আবেগ-মুহূর্তে ক্ষুদ্র আত্মসত্তার রূপান্তরের ভেতর দিয়ে তার গূঢ় তত্ত্ব-রসের স্বাদ পেতে হয়। তিনি দেখলেন, এ পর্যন্ত তিনি যা করেছেন অধ্যাপক হিসাবে তাঁর সকল কর্ম-প্রচেষ্টা ব্যর্থ এবং নিরর্থক হয়েছে, তাঁর যা কিছু জ্ঞান-সাধনা সবই তাঁর আত্মগৌরব এবং আত্ম-অপপ্রচার। এক কথায় অহং-জ্ঞানে ও অহমিকায় পূর্ণ। তিনি নিজের সকল সত্তা

সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌কে নিবেদন করলেন। সামাজিক পদমর্যাদা ও সমৃদ্ধি, স্ত্রী-পুত্র এবং প্রিয়জনকে ছেড়ে যেতে আল্লাহ্ তাঁকে শক্তি দিলেন। তিনি বাগদাদ ত্যাগ করলেন।

তারপর সাধক গায্‌যালীর সুদীর্ঘ সাধনা ও সন্ধানপরতার ফলে প্রকাশিত হলো তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইহ্ ইয়াউ-উলুমিদ্‌দীন' এবং 'মিশকাতুল আনোয়ার'। ইসলামী ধর্মতত্ত্বের বিভিন্ন ও বিচিত্র দিকের ওপর লেখা প্রথম গ্রন্থটির মত এরূপ একটি বিশদ ও উজ্জ্বল গ্রন্থ মুসলিম জগতে বিরল, অদ্বিতীয়ও বলা যেতে পারে। বিশ্বাসে ও ব্যবহারে মানুষের সমগ্র কর্তব্য নির্ধারণের পর ইমাম গায্‌যালী এই গ্রন্থ বস্তু-বিরাগী মনকে আল্লাহ্‌র প্রেমে যুক্ত ও উচ্ছ্বসিত করে তুলেছেন। তিনি রক্ষণশীল মতবাদের সঙ্গে সূফী ভাববাদের একটি সমন্বয় সাধন করেছেন অর্থাৎ শরীয়তকে মরমী ভাবরসে অভিষিক্ত ক'রে শরীয়ত ও মা'রিফাতের একটি খামিরাহ্ তৈরী করেছেন। 'মিশকাতুল আনোয়ার' গ্রন্থে গায্‌যালী সূফীদের উদ্দেশে কথা বলতে প্রায়ই রহস্যময় ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং সূফীর অন্তর অভিজ্ঞতার দ্বার পর্যন্ত পাঠককে নিয়ে এসে বলেছেন, সে দ্বার বা রহস্যের উন্মোচন এবং সত্য স্বরূপের উদ্‌ঘাটনের স্বাধীনতা তাঁর নেই। সন্দেহ হয়, গায্‌যালী কি তবে হল্লাজের অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন?

সূফীবাদের অন্য একটি দিক দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতকে স্পষ্টতা লাভ করে। মুসলিম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক-মনীষী শায়খ মুহিউদ্দীন মুহম্মদ ইবনে আলী আন্দালুসী ওরফে ইবনুল আরাবী ১১৬৫ খ্রীস্টাব্দে স্পেনের মুরচিয়া শহরে জন্মগ্রহণ এবং ১২৪০ সালে দামেশকে ইন্তিকাল করেন। তিনি প্রায় পাঁচশ' গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। মুহম্মদবাদের প্রবর্তন তাঁর অন্যতম কীর্তি। বিশ্বসৃষ্টির মূলে প্রথম প্রেরণা ও মননশক্তিরূপে বিরাজ করছেন মুহম্মদ (সঃ) অর্থাৎ সৃষ্টির মূলশক্তিকে 'নূরে মুহম্মদ' ব'লে কল্পনা করা হয়েছে। হযরত মুহম্মদ (সঃ) একজন পূর্ণ মানুষরূপে বিশ্বের সকল শক্তি ও সম্ভাবনাকে নিজের মধ্যে প্রতিফলিত ও পরিস্ফুট করেছেন। এক কথায় মুহম্মদ (সঃ)-এর ব্যক্তি ও বাস্তবসত্তায় বিশ্বের নির্মাণ-নীতি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। পূর্ণ মানুষরূপে তিনিই সৃষ্টির কারণ। সূফী-বাদের দৃষ্টিতে জগৎ সম্বন্ধে পূর্ণ মানুষ হলেন আল্লাহ্‌র দৃশ্যমান রূপ। (লালন শা'র আহমদ থেকে মিম বাদ দিলে হয় আহাদ অর্থাৎ আহ্‌মদে আহাদ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছেন)। মুহাম্মদতত্ত্বে হযরত মুহম্মদ (সঃ)-কে সকল

২—

রহস্য ও সৃষ্টিকর্মের মূল কারণ ব'লে নির্দিষ্ট করায় এ মতবাদে শিরকের আভাস পাওয়া যায়। কারণ আল্লাহ্ ও মুহম্মদ (সঃ) সমকক্ষ অর্থাৎ একই শক্তি ও গুণে অন্বিত করা হয়েছে।

ইবনুল আরাবী সূফীভাবের বহু সঙ্গীত রচনা করেছেন। তাঁর একমাত্র ধর্মই ছিল প্রেম—এ কথাই তার সঙ্গীতগুলোতে স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। তাই ইসলামের সূফী বা প্রেম-সাধনার জগতে রুমী সন্ধ্যাতারা এবং আন্দালুস শুকতারা অর্থাৎ একই ভাব বা আবেগ-অনুরাগের দু'টি উজ্জ্বল প্রকাশ রূপ।

ইবনুল আরাবী ইতালীয় কবি দান্তের ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেন। তিনিই প্রথম দোযখের বিভিন্ন স্তর, জ্যোতির্বিদদের বিশাল নক্ষত্র-লোক, ভাগ্যবানদের জান্নাত, বেহেশ্তী নূরের চারদিকে ফিরিশতাদের ঐকতান এবং তার পথ-প্রদর্শক একটি সুন্দরী নারীর বিশদ বর্ণনা দেন। দান্তে তার 'ডিভাইনা কমোডিয়া'র স্বর্গ ও নরকের বর্ণনায় ইবনুল আরাবীর ভাব ও কল্পনার সাহায্য নিয়েছেন। ইবনুল আরাবী তাঁর বিখ্যাত 'ফুসুসুল হিকাম' গ্রন্থে বহু বিস্ময়কর উক্তি ও মতবাদ প্রকাশ করেছেন, যা সাধারণের পক্ষে গ্রহণ ও অনুসরণ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

সূফীর প্রেম ব্যাখ্যা নয়, গভীর অনুভূতি ও উপলব্ধি-সাপেক্ষ। প্রেমের এ উপলব্ধি সম্পূর্ণ আশিক এবং মাশুকের মধ্যে পূর্ণ মিলনে সংঘটিত হয়। সে সংঘটনের মধ্যে কোনও মাধ্যম বা তৃতীয় কারো স্থান থাকে না অর্থাৎ এ অবস্থায় আল্লাহ্র বিশুদ্ধ একত্ব সূফীর অভিজ্ঞতায় বোধময় হয়ে ওঠে। তাপসী রাবি'আ। একদিন নবীজীকে স্বপ্নে দেখলেন। নবীজী বললেন: রাবি'আ তুমি আমাকে ভালবাস না? উত্তরে আল্লাহ্র প্রেমিক সবিনয় নিবেদন করলেন: রসূলুল্লাহ্! আপনাকে কে না ভালবাসে? কিন্তু আল্লাহ্র প্রেম আমাকে এরূপ অভিভূত ও আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, অন্য কোনও ব্যক্তি বা বিষয়ের প্রতি ভালবাসার স্থান আমার হৃদয়ে নেই।

একই অবস্থায় অনুরূপ উত্তর দিয়েছিলেন আবু সায়িদ আল্ খাব্রায। নবীজী তাঁকে স্বপ্নে বলেছিলেন, 'যে আল্লাহ্কে ভালবাসে, সে আমাকেও ভালবাসে।' শুধু মধ্যযুগে নয়, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ইসলামের মরমী-সাধন জীবনের সর্বস্তরে সকল কালের জন্য প্রাণকেন্দ্র হয়ে আছেন এবং থাকবেন। কায়রোর বিখ্যাত সূফী ইবনুল ফারিদ (১১৮২—১২৩৫ খ্রী) নবীজীর সঙ্গে একাত্মতায় ইত্তিহাদে অর্থাৎ স্থায়ীভাবে পরম সত্তায় নিমজ্জিত হয়েছিলেন।

সূফিগণ শুধু আপনাদের আত্মোন্নতির পথে সকল শক্তি ও মনোযোগ নিঃশেষ করেন নাই। ইসলাম ও মানব-সেবার কাজেও তাঁরা আপনাদের জীবন কুরবান করেছেন, কারণ মানব-সেবাকে তাঁরা একটি পবিত্র ব্রত এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা ব'লে বিশ্বাস করতেন। সূফীশ্রেষ্ঠ জালালুদ্দীন রুমী বলেছেন, 'মানুষের হৃদয় জয় করাই হলো সবচেয়ে বড় হজ্জ। একটি হৃদয় হাজার কা'বারও অধিক। কা'বা হযরত ইব্রাহীমের কুটির মাত্র, কিন্তু হৃদয় হলো আল্লাহ্‌র ঘর।' ইসলামের এই ব্রত ও মানব-সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই ইসলামের প্রাথমিক যুগের সূফিগণ এ উপ-মহাদেশে আগমন করেন।

উদ্ভব থেকে উত্থানের কয়েক বছরের মধ্যেই সূফীবাদ বহু তরীকায় বিভক্ত ও গতিশীল হয়ে ওঠে। কয়েকটি তরীকা উপমহাদেশে প্রবেশ ও প্রসার লাভের দ্বারা ভক্তমন ও নীতিবোধের ওপর এক স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। উত্তর-ভারতে খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (১১৪২—১২৩৬ খ্রী) চিশ্‌তীয়া তরীকা এবং মুলতানের শয়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (১১৬৯-১২৬৬ খ্রী) সুহ্‌রাওয়াদিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। শয়খ আবদুল কাদির জিলানীর (১০৭৮—১১৬৬ খ্রী) কাদিরিয়া তরীকার প্রবর্তন করেন তাঁরই এক বংশধর গউস জিলানী ১৪৮২ সালে। তুর্কিস্তানের শয়খ বাহাউদ্দীন নকশ্‌বন্দ (মৃত্যু ১৩৮৮ খ্রী) নক্‌শবন্‌দিয়া তরীকার প্রবর্তক ছিলেন। তাঁর অন্যতম শিষ্য খাজা বাকা বিল্লাহ্ তুর্কিস্তান থেকে দিল্লী হিজরত করেন। ১৬০৩ সালে দিল্লীতে তাঁর মৃত্যু হয়। এভাবে এ উপমহাদেশে নকশ্‌বন্‌দিয়া তরীকার প্রসার লাভ ঘটে। শরফুদ্দীন আলী কলান্দর ছিলেন একজন বিখ্যাত (বু আলী কলান্‌দর নামেই তিনি অধিক পরিচিত) সাধক, ১৩২৪ সালে পানিপথে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি কলান্‌দরিয়া নামে অন্য এক তরীকার রূপ দান করেন। এসব তরীকা ছাড়া এ উপমহাদেশে আরও বহু তরীকার উদ্ভব হয়।

শত শত সূফী-সাধক বিভিন্ন সময় পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া থেকে বাঙলা দেশে আসেন। তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন তরীকা, বিশেষ ক'রে, চিশ্‌তীয়া ও সুহ্‌রাওয়াদিয়া তরীকার অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। বাইরে থেকে আমদানি হলেও বাঙলাদেশ সূফী মতবাদের উর্বর ও অনুকূল ক্ষেত্ররূপে তার বিচিত্র উন্নতি সাধনে সাহায্য করে। বাঙলার চারদিকে বহু খানকাহ্ ও পবিত্র সমাধি-সৌধ গড়ে ওঠে। সিদ্ধ সূফী-সাধকদের শিক্ষা ও সাধন পন্থার আদর্শ অনুসরণে কয়েকটি নতুন সূফী তরীকার জন্ম হয়। তাদের মধ্যে জলালী

তরীকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত সাধক শয়খ জালালুদ্দীন তাবরীযীর সঙ্গে এ তরীকার শুরু হয়। তাঁর সম্মানে দেওতলা তাবরীযীবাদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। শয়খ 'আলাউল হকের শিক্ষায় আলাই তরীকার সূচনা হয়। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিখ্যাত সেনাপতি সায়ফুল্লাহ্ (আল্লাহ্র অসি) খালিদ বিন ওয়ালিদের বংশধর ছিলেন। এজন্য তাঁর তরীকা খালিদিয়া তরীকা নামেও খ্যাত। শয়খ 'আলাউল্ হকের স্বনামধন্য পুত্র হযরত নূর কুত্‌বুল 'আলমের সঙ্গে নূরী তরীকার শুরু হয়। এসব তরীকা ছাড়াও হুসাইনি, রুহানিয়া, কলান্ দরিয়া ও শফ্ফারিয়া তরীকা বাঙলার ভক্তি-সরস ভূমিতে অবাধ প্রসার লাভ করে। এ সকল সূফী ও সাধন-তরীকা এবং অসংখ্য খানকাহ্ ও দরগাহ্ বাঙলাদেশে সূফীবাদের ব্যাপক জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে।

মধ্যযুগের নৈরাজ্য ও অরাজকতা এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অচলতার মধ্যে সূফী-সাধকগণ তাঁদের আত্যন্তিক আবেগ ও আন্তরিকতা, আল্লাহ্-প্রেম, চরিত্র-বল এবং ব্যক্তিত্ব প্রভাবের দ্বারা অধঃপতিত সাধারণ মানুষকে এক পরম নির্ভরশীল বিশ্বস্ত হাতের অভয় আশ্বাস (বিভ্রান্ত জীবনের নোঙর—পবিত্র কুরআনের কথায় 'উরওয়াতুল্ উস্‌কা') এবং এক বিকারমুক্ত সহজ ও পরিচ্ছন্ন জীবনের সন্ধান দেন।

বাবা আদম শহীদ

বিক্রমপুরের প্রচলিত কাহিনী মতে বাবা আদম সাত হাজার শিষ্যসহ মক্কা থেকে এদেশে আসেন। রামপালের একজন মুসলমান রাজা বল্লাল সেনের হাতে গো জবেহ্‌র জন্য অন্যায়ভাবে নির্যাতিত হয়। তার প্রতিবাদে বাবা আদম রামপালের নিকটবর্তী আবদুল্লাহ্‌পুরে আস্তানা পাতেন এবং গরু কুরবানী করেন। বল্লাল সেন রামপালের অন্তর্ভূত তাঁর রাজধানী বল্লাল বাড়ী থেকে নির্গত হয়ে বাবা আদমের সঙ্গে লড়াই করে। বাবা আদম শহীদ হন। বল্লাল সেনের সংবাদ-বাহক পায়রা হঠাৎ মুক্তি পেয়ে রাজবাড়ীতে উড়ে আসে। যুদ্ধের পরাজয় হয়েছে ভেবে রাজপরিবারের সকলেই আগুনে আত্মাহুতি দেয়। ফিরে এসে বল্লাল সেনও তাদের অনুসরণ করে।

রামপালের বাবা আদমের সমাধিস্থানে বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু ভক্ত-জনের সমাবেশ হয়। তীর্থ পথিকদের প্রার্থনা ও আশ্রয়স্থলের জন্য ১৪৮৩ সালে সুলতান জালালুদ্দীন ফতেহ্ শা'র রাজত্বকালে কোন এক হাবসী প্রধান সমাধির পার্শ্বেই এক মসজিদ নির্মাণ করেন।

শাহ্ মুহম্মদ সুলতান রুমী

প্রাক্ মুসলিম যুগে সুলতান রুমী বাঙলায় ইসলাম প্রচার করেন ব'লে কথিত হয়। ময়মনসিংহের নেত্রকোণায় মদনপুরে তাঁর সমাধি বিদ্যমান। ১০৫৩ সালে তিনি মদনপুর আসেন। তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিতে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়ে জনৈক কোচরাজ ইসলাম গ্রহণ করেন।

তিনিই মদনপুর গ্রামটি সাধককে উপহার দিয়ে ধন্য হন। সেনরাজাদের পর কোচরাজগণ নেত্রকোণায় আধিপত্য বিস্তার করেন।

শাহ্ সুলতান মাহী সওয়ার

শাহ্ সুলতান মাহী সওয়ার ছিলেন বলখের এক শাহ্যাদা। প্রাসাদের বিলাস-ব্যসন ও আরাম-আয়েশ ত্যাগ ক'রে তিনি ইসলামের খিদমতে প্রচার-তৎপর হন। সংসার ত্যাগ ক'রে তিনি দামেশকের শয়খ তওফিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গুরুর আদেশে তিনি বাঙলায় ইসলাম প্রচারে আসেন। মৎসাকৃতি সমুদ্রযানে তিনি সন্দ্বীপ হয়ে বাঙলায় উপস্থিত হন ব'লে তিনি মাহী সওয়ার বা মাছের আরোহী বলে খ্যাতি লাভ করেন। বগুড়ার মহাস্থানগড়ে রাজা পরশুরাম ও তাঁর ভগ্নী শীলা দেবীর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। রাজা নিহত এবং শীলা দেবী করতোয়া নদীতে নিমজ্জিত হয়। বগুড়ার মহাস্থানগড়ে শাহ্ সুলতান মাহী সওয়ারের মাযার বিদ্যমান।

মখদুম শাহ্ দওলাহ্ শহীদ

হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (সঃ)-এর অন্যতম বিখ্যাত সাহাবা মুয়ায বিন জাবালের পুত্র (মতান্তরে বংশধর ; কারণ মুয়ায বিন জাবালের মৃত্যু হয় ৬২০ সালে। শাহ মখদুম বাঙলায় আসেন ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে) ছিলেন মখদুম শাহ্। পিতার অনুমতিক্রমে তিনি তাঁর ভগ্নী ও ভগ্নীপুত্রসহ ইয়ামন ত্যাগ করেন। পাবনা জেলার শাহ্যাদপুরের নিকট পাতাজিয়ায় তিনি আস্তানা পাতেন। একটি মসজিদ তৈরী ক'রে তিনি ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। ফলে তাঁর ওপর হিন্দু রাজার হামলা শুরু হয়। যুদ্ধে শাহ্ মখদুম এবং তাঁর বহু অনুচর শহীদ হলেন। অবমাননার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাঁর ভগ্নী একটি দীঘির পানিতে ডুবে প্রাণ ত্যাগ করেন। সেই থেকে দীঘিটি 'সতী বিবির ঘাট' নামে পরিচিত হয়ে আসছে। শাহ্ মখদুমের শির বিহার শরীফে নীত হয়। হিন্দু রাজা সেই শিরে অপার্থিব

আলো দেখে স্থানীয় মুসলমানদের সাহায্যে তা' সমাধিস্থ এবং সেখানে একটি মসজিদ তৈরী করেন।

শাহ্ মখদুমের ভগ্নীপুত্র খাজা শাহ্ নূর তাঁর দেহটি শাহ্যাদপুরের মসজিদের নিকট কবর দেন। শাহ্যাদপুরে শাহ্ মখদুম ও তাঁর শিষ্যদের সর্বসমেত একুশটি কবর বিদ্যমান। শাহ্ মখদুম ইয়ামনের শাহ্যাদা ছিলেন, তাই স্থানটির নাম শাহ্যাদপুর হয়েছে বলে কথিত আছে। চলিত প্রবাদ অনুসারে সূফীশ্রেষ্ঠ জালালুদ্দীন রুমীর গুরু শয়খ শমসুদ্দীন তাবরীযী শাহ্ মখদুমেরও মুরশিদ ছিলেন।

শাহ্যাদপুরে শাহ্ মখদুমের মাযারে আজও শত শত ভক্ত দর্শক সমবেত হয় এবং ইসলামের শান্তি ও সান্ত্বনার বাণী প্রচারে তাঁর আত্মত্যাগ ও শহীদী খুনের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

শয়খ জালালুদ্দীন তাবরীযী

বাঙলার প্রাথমিক সাধকদের মধ্যে এক বিশেষ সম্মান ও উচ্চ স্থানের অধিকারী হয়ে আছেন শয়খ জালালুদ্দীন তাবরীযী। তাঁরই বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক শক্তি এবং প্রচার-তৎপরতার জন্য উত্তর বাঙলায় ইসলাম প্রচার ও মুসলিম সমাজ গঠন ব্যাপক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত এবং সুসম্পন্ন হয়। ধর্মপ্রাণতা, আদর্শ চরিত্র এবং অক্লান্ত মানব সেবার জন্য শয়খ জালালুদ্দীন তাবরীযী লক্ষ লক্ষ বাঙালীর মনে চিরস্মরণীয় এবং বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র হয়ে আছেন।

শয়খ জালালুদ্দীন বিখ্যাত সূফী খাজা শিহাবুদ্দীন সুহ্রাওয়ার্দির নির্দেশে ও পরিচালনায় কামালিয়াত (আধ্যাত্মিক পূর্ণতা) হাসিল করেন। বাগদাদে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। মুহম্মদ ঘোরির দিল্লী ও আজমীর বিজয়ের সময় অর্থাৎ ১১৯২ সালে শয়খ জালালুদ্দীন এ উপমহাদেশে আসেন। তিনি ব্যাপকভাবে আরব, ইরাক ও ইরান ভ্রমণ করেন। নিশাপুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সূফী-সাধক শয়খ ফরীদুদ্দীন আত্তারের (১১১৮-১২২৯ খ্রী) সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। এদেশে প্রথমে তিনি মুলতানে পদার্পণ করেন। মুলতানে তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহমর্মী শাহ্ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (১১৬৯—১২২৬ খ্রী) এবং খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার উশীর (মৃত্যু ১২৩৫ খ্রী) সঙ্গে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। মুলতান থেকে তিনি দিল্লী আসেন। দিল্লীর সুলতান শমসুদ্দীন ইলতুতমিশ তাঁকে

বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ক'রে ধন্য হন। ১২১২ খ্রীস্টাব্দে তিনি লক্ষ্মণাবতীর উদ্দেশ্যে দিল্লী ত্যাগ করেন। পথিমধ্যে বদায়ুনে বিশ্রাম-কালে তিনি একটি বালককে আশীর্বাদ করেন। এ বালক আলা-উদ্দীন উসূলী পরবর্তীকালে বিখ্যাত সূফী সুলতানুল আউলিয়া শয়খ নিযামুদ্দীনের গুরু হন। বদায়ুনে তিনি এক কুখ্যাত হিন্দু ডাকাতকে ইসলামে দীক্ষা দেন। পরবর্তীকালে এ ডাকাত খাজা আলী নামে খ্যাত হন।

১২১৩ সালে শয়খ জালালুদ্দীন লক্ষ্মণাবতী পৌঁছেন এবং পাণ্ডুয়ার এক হিন্দু মন্দিরের নিকট তাঁর আস্তানা এবং খানকাহ্ স্থাপন করেন। সর্ব প্রকার পার্থিব আসক্তি থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন আল্লাহ্ ও মানুষের খিদ্মতে কুরবান করেন। তিনি বলেন, নারী ও ধন-সম্পদে যার আসক্তি আছে, তার পক্ষে মঙ্গল লাভ অসম্ভব। গুরু শয়খ শিহাবুদ্দীন সুহ্‌রাওয়ার্দির প্রতি অবিচল ভক্তি ও বিস্ময়কর সেবা-পরায়ণতা তাঁর আধ্যাত্মিক নিষ্ঠার একটি মহান উদাহরণ। তাঁর সেবা ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে গুরু একদিন বলেছিলেন : শয়খ জালাল আমার সব কিছু নিয়ে গেছে অর্থাৎ তিনি গুরুর সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তির পূর্ণ উত্তরাধিকারী হয়েছেন। ধ্যানে ও প্রার্থনায় তিনি গভীরভাবে মগ্ন ও তন্ময় এবং আল্লাহ্‌র প্রেমে বুঁদ ও মস্‌ত হয়ে থাকতেন। তাঁর সর্বানুভূতি ও আধ্যাত্মিক চেতনায় তিনি একান্তে আল্লাহ্‌র নূর প্রত্যক্ষ করেছেন। সালাতে তিনি দীর্ঘকাল সময় অতিবাহিত করতেন এবং নফসে আম্‌মারা (পশু আমি) পিছনে ফেলে, নফসে লাওয়ামা (যুক্তিবাদী আমি) অতিক্রম ক'রে নফসে মুতমাইন্নায় (নিস্তরঙ্গ, পরিতৃপ্ত ও পরিশান্ত আমি) উপস্থিত হয়ে তিনি পরম প্রিয়তমের প্রেম ও প্রসন্নতা লাভ ক'রে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক দরজায় উপনীত হন।

বিরাট আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব এবং মানব-সেবার দ্বারা শয়খ জালালুদ্দীন বাঙলাদেশে অলৌকিক কার্য সাধন করেন। অবহেলিত ও নির্যাতিত হিন্দু বৌদ্ধগণ ত্রাণ লাভের জন্য দলে দলে তাঁর আশ্রয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি উত্তর বাঙলায় এক শক্তিশালী মুসলিম সমাজের ভিত্তিভূমি রচনা করেন। তাঁর খানকাহ্ আধ্যাত্মিক, মানসিক ও মানবিক অনুশীলনের কেন্দ্র হয়ে পড়ে। তাঁর লংগরখানায় অভুক্ত দরিদ্র জনসেবা ও শান্তি লাভ করে। এভাবে আধ্যাত্মিক ও মানসিক সেবার দ্বারা শয়খ জালালুদ্দীন

উত্তর বাঙলার হিন্দু-মুসলিম সমাজে এক নতুন নৈতিক ও তামুদ্দুনিক জীবন গড়ে তোলেন। হিন্দুদের অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা তিনি লাভ করেছিলেন। ফলে কালক্রমে সত্যপীরের ধর্ম ও পূজা হিন্দুসমাজে প্রবর্তিত হয়। এভাবে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ উদার ও প্রগতিশীল হয়ে ওঠে। দেওতলায় (পাণ্ডুয়া) সাধক-শ্রেষ্ঠ শয়খ জালালুদ্দীন তাবরীযীর সমাধি বিদ্যমান। তাঁর মৃত্যুর বহু পরে ১৩৪২ সালে আলাউদ্দীন আলী শাহ্ কর্তৃক এ সমাধি-সৌধটি নির্মিত হয়।

শাহ্ জালাল

শাহ্ জালাল নামে খ্যাত শয়খ জালাল বাঙলার একজন মহান ও বিশিষ্ট সূফী-সাধক ছিলেন। সিলেট ও উত্তর-পূর্ব বাঙলায় ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা তাঁরই প্রচেষ্টা ও কৃতিত্বে সম্ভবপর হয়।

শয়খ জালালুদ্দীন মুজাররাদ (চিরকুমার) এশিয়া মাইনরের (বর্তমান এশিয়া-তুরস্ক) কুনিয়া শহরে (রুম) জন্মগ্রহণ করেন। অন্য মতে ইয়ামনের এক কুরাইশ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর পিতার নাম মুহম্মদ এবং মাতা ছিলেন একজন সইয়িদা। আধ্যাত্মিক শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে তিনি গুরু সইয়িদ আহমদ ইয়েভির নিকট থেকে খিলাফত লাভ করেন এবং তাঁর সম্মতিতে সাত শ' অনুচরসহ ইসলামের খিদমতে বের হন। এ সময় দুর্দান্ত ও নির্মম মংগোলগণ মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম রাজ্য ও কৃষ্টি ধ্বংসের কাজে তৎপর হয়ে ওঠে। হালাকু খান যখন ১২৫৮ সালে বাগদাদ ধ্বংস ও আব্বাসীয় খলীফা মুতাসিম বিল্লাহ্‌কে হত্যা করে, শাহ্ জালাল তখন রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত হন এবং বহু অঞ্চল জয় ক'রে অনুচরদের অনেককে সেই সব স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য রেখে যান। এ উপমহাদেশে তাঁর সঙ্গে শয়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়ার সাক্ষাৎ ঘটে। শয়খ নিযামুদ্দীন তাঁকে এক জোড়া কবুতর উপহার দেন। এ কবুতর জোড়ার বংশধরই সিলেটে 'জালালী কবুতর' নামে খ্যাত।

৩১৩ জন অনুচরসহ তিনি সিলেটে এসে উপস্থিত হন। মুসলিম সেনাপতি সিকান্দর খান গাযীকে সিলেট বিজয়ে তিনি সাহায্য করেন (১৩০৩ খ্রী)। প্রচলিত কাহিনী মতে সিলেটের রাজা গৌর গোবিন্দ গো-কুরবানির জন্য জনৈক বুরহানুদ্দীনের ডান হাত কেটে ফে'লে দেশ থেকে

বিতাড়িত করে। অন্যায়ের প্রতিকারের আশায় বুরহানুদ্দীন ফিরুয শা'র দ্বারস্থ হয়। সুলতান তাঁর ভাগিনেয় সিকান্দার গাযীকে সিলেট বিজয়ে পাঠালেন। সিকান্দার গাযী অভিযানের পথে সোনারগাঁ দখল করলেন কিন্তু গৌর গোবিন্দের সঙ্গে যুদ্ধে তিনবার বিফলকাম হলেন। সুলতান তাঁর সিপাহ্‌সালার ও সাতগাঁয়ের সুবাদার নাসিরুদ্দীনকে সিকান্দার গাযীর সাহায্যে পাঠালেন। সাতগাঁয়ের নিকট ত্রিবেণীতে শাহ্ জালালের সঙ্গে তাঁর সৈন্যদল মিলিত হলো---তাঁদের নৈতিক বল বৃদ্ধি এবং শাহ্ জালালের পবিত্র উপস্থিতি ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব এবং সম্মোহনের ফলে এবার সিলেট সহজেই সুলতানের দখলে এসে যায় এবং ইসলামের বাণী চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

সিলেট জয়ের পর শাহ্ জালাল সেখানেই বসতি স্থাপন ক'রে ইসলাম প্রচার ও মানব সেবায় ব্রতী হলেন। বিখ্যাত ভূ-পর্যটক ইবনে বতুতার বিবরণ থেকে আমরা শাহ্ জালালের কৃচ্ছ্র সাধন, ধর্মনিষ্ঠা ও সেবাপরায়ণতার কথা জানতে পারি। তিনি প্রায় চল্লিশ বছর রোযা রাখেন। তাঁর একটি গাভী ছিল, সেই গাভীর দুধই ছিল তাঁর খাদ্য। সারা রাত তিনি সালাতে দণ্ডায়মান থাকতেন। তাঁর খানকাহ্ ছিল সাধু ও সন্ত, মুসাফির ও গরীব-দুঃখীদের নির্ভয় আশ্রয়। হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতো। তাঁর অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে বহু কাহিনী ইবনে বতুতা শুনেছিলেন এবং প্রবাদ হয়ে সে সব এখনো চারদিকে ছড়িয়ে আছে। শাহ্ জালালের উন্নত আধ্যাত্মিক শক্তি ও নির্যাতিত মানব সেবার জন্য সকলে তাঁকে এক অতি অসাধারণ মানুষ বলে মনে করতো। বাঙলা-দেশের ঐতিহ্যের ইতিহাসে ও অসংখ্য লোকগীতিতে এ অপূর্ব দীপ্তিমান সূফী-সাধকের স্মৃতি অমর হ'য়ে আছে।

হযরত শাহ্ জালাল ১৩৪৭ সালে দেড় শ' বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। সিলেটে তাঁর পবিত্র সমাধি-ভূমি সকল সম্প্রদায়ের ভক্তজনদের তীর্থস্থান হয়ে আছে।

শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তওয়ামাহ

উত্তর বাঙলায় শয়খ জালালুদ্দীন তাবরীযী, পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব বাঙলায় শয়খ শাহ্ জালাল এবং মধ্য বাঙলায় শয়খ শরফুদ্দীন আপনাদের সাধনা ও চরিত্র বলে এবং বিপুল আধ্যাত্মিক ও সাংগঠনিক শক্তির সাহায্যে ইসলামের

বাণী ও বার্তা প্রচার করেন। শুধু বাঙলা নয়, বাঙলার বাইরেও তাঁদের এই আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে।

শয়খ শরফুদ্দীন আবূ তওয়ামাহ্ ছিলেন একজন বিখ্যাত সূফী-সাধক ও মনীষী। সোনারগাঁয়ে অবস্থিত তাঁর খানকাহ্ ও জ্ঞান-চর্চার কেন্দ্র সারা উত্তর ভারত পর্যন্ত অধ্যাত্ম ও মানসিক শক্তির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করে। সোনারগাঁ মুসলিম জ্ঞান-অনুশীলন কেন্দ্রে ছিলেন তাঁর অন্যতম বিখ্যাত শিষ্য সূফী ও সাধক-মনীষী মখদুম শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মানেরি। বস্তুত শয়খ আবূ তওয়ামার সাধনশক্তির ফলে সোনারগাঁ তথা পূর্ব বাঙলার আধ্যাত্মিক ও মুসলিম কৃষ্টি-কেন্দ্রিক জীবন গড়ে ওঠে। এক কথায় তিনি ছিলেন সোনারগাঁয়ের গর্ব ও সারা বাঙলার গৌরব।

শয়খ আবূ তওয়ামাহ্ বুখারায় জন্মগ্রহণ এবং খুরাসানে শিক্ষা লাভ করেন। শীঘ্রই তিনি তাঁর ধর্মপ্রাণতা এবং জ্ঞান-গরিমার জন্য খ্যাত হন। হাদীস ও ফিকাহ্ এবং রসায়নশাস্ত্র ও প্রকৃতি বিজ্ঞানে তিনি বিশেষ জ্ঞানার্জন করেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের (১২৬০ খ্রী) প্রাথমিক আমলে তিনি দিল্লী আসেন। অচিরেই তাঁর সাধনা ও পাণ্ডিত্য-খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর ক্রমবর্ধমান শক্তি-প্রভাবে শঙ্কিত ও ঈর্ষান্বিত হয়ে সুলতান বলবন তাঁকে সোনারগাঁয়ে যেতে কৌশলে বাধ্য করেন।

সোনারগাঁয়ে যাওয়ার পথে তিনি কয়েকদিনের জন্য মানেরে অবস্থান করেন। এখানে ভবিষ্যৎ শাগরিদ শয়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়ার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। শয়খ আবূ তওয়ামার আধ্যাত্মিক শক্তি ও অনন্যসাধারণ মনীষায় মুগ্ধ হয়ে শয়খ শরফুদ্দীন তাঁর নিকট ধর্ম-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। গুরু সানন্দে রাজী হলেন। মানেরি তাঁর সঙ্গে সোনারগাঁয়ে যাত্রা করলেন। ১২৭৪—৭৭ সালের আনুমানিক কোন এক সময়ে শয়খ শরফুদ্দীন সোনারগাঁয়ে এসে উপস্থিত হন।

সোনারগাঁ তখন সুলতানদের শাসনে ছিল। প্রাথমিক মুসলিম ঐতিহাসিকগণ পূর্ব বাঙলাকে লখনাওতি ব'লে উল্লেখ করেন।

শয়খ শরফুদ্দীন পরিবার-পরিজনসহ সোনারগাঁয়ে স্থায়ী আস্তানা পেতে প্রচার এবং শিক্ষা দানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। শিষ্যদের জন্য একটি খানকাহ্ এবং ছাত্রদের জন্য তিনি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

স্থাপন করলেন। দেশ-বিদেশ থেকে বহু অনুসন্ধিৎসু ছাত্র ও সাধক সোনারগাঁয়ে আসতে থাকে। সোনারগাঁ শীঘ্রই ধর্ম ও শিক্ষার একটি আলোক-দীপ্ত কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে শয়খ আবু তওয়ামাহ্ পূর্ব বাঙলায় ইসলামের শিক্ষা-সাধনা এবং জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র তৈরী করেন। ১৩০০ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু এবং সোনারগাঁয়েই এ সাধক ও মনীষীর সমাধি রচিত হয়।

শয়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মানেরি

মখদুম আল-মুলক শয়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়ার পিতা ছিলেন শয়খ ইয়াহ্ইয়া বিহারের মানের শহরের অধিবাসী। ১২৬২ সালে শয়খ শরফুদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তিনি উচ্চ ইসলামী শিক্ষা লাভ ক'রে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দেন। জ্ঞান লাভের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা তাঁর এতো তীব্র ছিল যে, পনের বছর বয়সেই তিনি স্বনামধন্য সূফী ও মনীষী-সাধক শয়খ শরফুদ্দীন আবু তওয়ামার ছাত্ররূপে তাঁর সঙ্গে সোনারগাঁয়ে আসেন। সোনারগাঁয় ধ্যান, চিন্তা ও অধ্যয়নে তিনি এতো তম্ময় হয়ে থাকতেন যে, বাড়ীর চিঠিপত্র পড়বার সময় পর্যন্ত তিনি পেতেন না। শিক্ষা সমাপনের পর যখন চিঠিগুলো খোলেন, তখন একটির মধ্যে তিনি পিতার মৃত্যু সংবাদ পান। গুরুর ছাত্র ও শিষ্যদের সঙ্গে তিনি আহার করতেন না, সময় বেশী লাগবে সেই ভয়ে এবং জ্ঞান লাভের সাধনায় ব্যাঘাত ঘটবে সেই আশঙ্কায়।

দীর্ঘ পনের বছর ধ'রে তিনি গুরু শয়খ আবু তওয়ামাহ্র নিকট থেকে ইসলামী বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের দ্বারা কামালিয়াত হাসিল করেন। ছাত্রের কৃতিত্বে সন্তুষ্ট হয়ে গুরু আপন কন্যাকে তাঁর হস্তে সঁপে দিলেন। বস্তুত শরফুদ্দীন ছিলেন এ উপমহাদেশের সাধক-গুরুর যোগ্য ছাত্র ও ভাবশিষ্য এবং সোনারগাঁ ধর্ম-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি উজ্জ্বল রত্ন। গুরুর আশীর্বাদ শিরে বহন ক'রে ১২৯৩ সালে তিনি বিহারে জন্মভূমি মানেরে ফিরে যান এবং ইসলাম প্রচার ও শিক্ষাদানের ব্রতে উদ্যোগী হন। সিদ্ধ সূফী-সাধক ও মনীষীরূপে তাঁর খ্যাতি চার-দিকে ছড়িয়ে পড়ে—হিন্দুস্তানে শিক্ষা ও গুহ্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি একক স্থান ও মর্যাদার অধিকারী হন।

শয়খ মানেরি রচিত বহু মূল্যবান গ্রন্থ তাঁর গভীর বিদ্যাবত্তা ও পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। তিনি এ উপমহাদেশের স্বনামধন্য সিদ্ধ সাধকদের অন্যতম ছিলেন। সূফী বিশ্বাস এবং সত্যের গূঢ় তত্ত্ব স্বচ্ছন্দ ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ ক'রে তিনি তাঁর অনুভূতির স্বচ্ছতা, মনীষার দীপ্তি ও হৃদয়ের রস-গভীরতার পরিচয় দিয়ে অমর হয়ে আছেন।

শয়খ আখী সিরাজুদ্দীন উসমান

বাঙালী সূফীদের অধিকাংশই ছিলেন চিশতীয়া তরীকার সাধক। আর এ তরীকাই ছিল বাঙলা দেশে সর্বাধিক উন্নত ও সুসংগঠিত। চিশতী সূফিগণ বাঙলার দূরদূরান্ত অঞ্চলে ইসলামের বাণী প্রচার করেন। চরম দুর্দশা ও দুর্দিনে তাঁরা মুসলিম রাজ্য ও সমাজকে উদ্ধার ও বিপদ-মুক্ত ক'রে মুসলিম বাঙলার প্রগতি ও ক্রমোন্নতি অক্ষুণ্ণ রাখেন। চিশতীয়া সূফিগণ স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে তাঁদের বাণী পৌঁছে দেন এবং এভাবে জনগণের মন স্পর্শ ক'রে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে সঞ্জীবিত করেন।

শয়খ সিরাজ ছিলেন লখনাওতির অধিবাসী। সাধারণ এক খাদেম-রূপে প্রবেশ করে তিনি দিল্লীর সূফীশ্রেষ্ঠ শয়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়ার প্রীতি ও প্রশংসার পাত্র হন। সুলতানুল আউলিয়ার খিরকা লাভ ক'রে তিনি ওঅতন-ই-খুদ (আপন জন্মভূমি) বাঙলায় ফিরে আসেন এবং রাজধানী পাণ্ডুয়ায় তাঁর কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করেন। ধর্ম প্রচার ও আধ্যা-ত্মিক মিশনের দুরূহ ব্রত সাধনের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। তাই সুলতানুল আউলিয়ার খিলাফতের যোগ্য হওয়ার জন্য শয়খ সিরাজ নিযামুদ্দীনের অন্যতম শিক্ষিত শিষ্য ফখরুদ্দীন জাররাদির নিকট নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। বাঙলায় তখন অভিজাত শিক্ষক ও সাধক 'আলাউল হকের আধিপত্য। তাঁর সম্মুখীন হতে তিনি পারবেন কিনা, এ দ্বিধাগ্রস্ত ভাব দেখে শয়খ নিযামুদ্দীন তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'আলাউল হক তাঁর অন্যতম ভক্ত শিষ্য হবেন। তাই হয়েছিলেন। শয়খ সিরাজের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানের গভীরতায় মুগ্ধ ও অভিভূত 'আলাউল হক তাঁর এক বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত হয়ে পড়েন। জনসাধারণ এবং লখনাওতির সুলতান ও সুলতান-কুমারগণ তাঁর ধর্মপ্রাণতা, জ্ঞান-গরিমা এবং মানবিকতায় আকৃষ্ট হন। তিনি একটি খানকাহ্ স্থাপন করেন। এই খানকাহ্ ব্যাপক

ধর্মীয়, তামুদ্দুনিক ও মানবিক কার্যকলাপের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। শয়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়ার নিকট থেকে তিনি যে কয়েকটি মূল্যবান পুস্তক লখনাওতি নিয়ে আসেন, সেগুলো দিয়ে একটি ইসলামী মরমীবাদের গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। তাঁর লংগরখানায় অভুক্ত ভিখেরী ও দরিদ্র জনসাধারণের জন্য সকল সময় খাদ্য মওজুদ থাকতো। এখানে মানব-প্রীতি, বদান্যতা ও উদারতার দ্বারা শয়খ সিরাজ হিন্দু-মুসলমান ধনী-দরিদ্র সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি ও প্রীতি আকর্ষণ করেন। ১৩৫৭ সালে এ সাধক-মনীষীর ইন্তিকাল হয়।

শয়খ 'আলা উল হক

লখনাওতির এক বিত্ত ও প্রভাবশালী পরিবারে শয়খ 'আলা উল হক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের বংশধর ছিলেন। পিতা ছিলেন সিকান্দার শা'র (১৩৫৭--৯২ খ্রী) কোষাধ্যক্ষ। বংশ ও বিত্তের আভিজাত্যের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের যোগ হওয়ায় শয়খ 'আলাউল হক শীঘ্রই এক খ্যাতিমান পুরুষ হয়ে ওঠেন। শয়খ সিরাজের শিষ্য হয়ে ঐশ্বর্য, প্রভাব ও বংশের অভিমান ত্যাগ ক'রে সেবা ও কৃচ্ছ্র-সাধনের জীবনে তিনি একনিষ্ঠ ও কর্মতৎপর হন। সেবা ও নিষ্ঠার দ্বারা তিনি গুরুর প্রীতিভাজন হয়ে তাঁর খিলাফত লাভ করেন। গুরুর ইন্তিকালের পর তিনি তাঁর ব্রত ও আধ্যাত্মিক সাধনা অব্যাহত রাখেন। তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও বিস্ময়কর মনীষার জন্য পাণ্ডুয়া সেই যুগে ধর্মীয় ও মননশীল জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হয়ে পড়ে। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন নূর কুতবুল আলম, জাহাঁগীর সিম্‌মানী ও পূর্ণিয়ার বিখ্যাত সাধক শয়খ হসাইন। তাঁরা গুরুর অধ্যাত্ম-ঐতিহ্য ও মনীষার উত্তরাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখেন। ১৩৯৮ সালে শয়খ 'আলা উল হক পাণ্ডুয়ায় ইন্তিকাল করেন।

হযরত নূর কুত্‌বুল আলম

বাঙলার মধ্যযুগের সূফী-সাধকগণ দীন ও দুনিয়ার মধ্যে একটি সমতা ও সমন্বয় সাধন করেছিলেন অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রেমে মস্ত হয়েও জ্ঞান ও ধর্মের প্রচার ক'রে তাঁরা জাগতিক বিষয়েও দৃষ্টি দিতেন। তাঁদের অনেকেই একাধারে সাধক ও মনীষী ছিলেন। পবিত্র কুরআনের প্রধান

শিক্ষা হলো, আল্লাহ্‌র যিক্‌র অর্থাৎ সর্বক্ষণ স্মরণের দ্বারা নিজকে জয় (নাফ্‌সে আম্মারা বা পশু-আমির উপর দখল লাভ) এবং জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা বিশ্ব জয় অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার ক'রে বিশ্ব সম্বন্ধে ক্রমাগত জ্ঞান অর্জন ও প্রকৃতিকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজন। আত্ম-সাধনার এ দু'ই ধারার সম্মিলিত ও সুসমন্বিত রূপ আমরা মধ্যযুগের বাঙলার সূফী-সাধকদের জীবনে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হতে দেখি।

হযরত নূর কুত্‌বুল 'আলম ছিলেন এমনি এক সাধক-মনীষী। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ সাধক 'আলাউল হকের যোগ্য পুত্র এবং আধ্যাত্মিক শক্তি ও জ্ঞান-সম্পদের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। তিনি গিয়াসুদ্দীন আযম শা'র (পরে সুলতান ১৩৭৭---১৪১০ খ্রী) সহপাঠী ছিলেন। শৈশবকালেই পিতা তাঁকে আধ্যাত্মিক শিক্ষায় দীক্ষা দান করেন। কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠায় ও সাধক জীবনের কৃচ্ছ্র সাধনে তিনি অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। ধনী ও অভিজাত বংশের ছেলে হয়েও পিতার নির্দেশে তাঁকে ফকীর ও ভিখারীদের পোশাক ধৌত করতে, ওযূর জন্য গরম পানি সর্বদা তৈরী এবং খানকাহ্‌ ও তার সংলগ্ন গোসলখানা পর্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হ'তো। একদিন এক দুর্বল ভিখারীকে পায়খানায় যেতে সাহায্য করবার সময় তাঁর পোশাক ও শরীর না-পাক হয়ে যায়। তাঁর এ অকুণ্ঠ সেবা দেখে পিতা খুশী হয়ে তাঁকে লংগরখানার জ্বালানি কাঠ বহনের ভার দেন। তাঁর ভাই আযম খান ছিলেন সুলতানের উজীর। এরূপ সাধারণ এক চাকরের কাজ করতে দেখে একদিন তিনি হযরত নূর কুত্‌বুল 'আলমকে জাঁকজমকপূর্ণ আরাম-আয়েশের জীবনে চলে আসতে অনুরোধ করেন। কুত্‌বুল 'আলম সবিনয় নিবেদন ক'রে তাঁকে জানালেন, শাহী দরবারের জাঁকজমক ও বিত্তশালী জীবন অপেক্ষা খানকার জ্বালানি কাঠ বহনের জীবনই তাঁর অধিকতর কাম্য।

জ্ঞানের একনিষ্ঠ অনুশীলন এবং সূফী সাধনা ও ধর্ম চর্চায় সকল দিকে বিস্ময়কর ব্যুৎপত্তি লাভের দ্বারা তিনি পিতার অধ্যাত্ম ও জ্ঞান-সম্পদ সমৃদ্ধতর করেন। সূফী তরীকাকে আরো উন্নত ও সংগঠিত ক'রে তিনি প্রচারব্রতে মননশীলতা এবং মানব সেবায় নতুন প্রাণ ও উৎসাহের সঞ্চার করেন। ফলে পাণ্ডুয়া ভারতে ধর্ম এবং কৃষ্টি জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ও শক্তিশালী কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। তার খ্যাতি উপমহাদেশের দূরতম স্থান

থেকেও ছাত্র ও ভক্ত সাধকদের আকৃষ্ট করে। হযরত নূর কুত্‌বুল 'আলমের ভক্ত শিষ্য ও ছাত্রদের মধ্যে বিখ্যাত হন মানিকপুরের (মধ্যপ্রদেশ) হুসামুদ্দীন (মৃত্যু ১৩৭৭ খ্রী), লাহোরের শয়খ কাকু (মৃত্যু ১৪৭৬ খ্রী) এবং আজমীর শরীফের শমসুদ্দীন (মৃত্যু ১৪৭৬ খ্রী)। হযরত নূর কুত্‌বুল 'আলম ওয়াহ্‌দাতুল উজুদ (একত্বের মূলতত্ত্ব) সম্বন্ধে শিষ্য ও ভক্তদের পত্র লিখতেন। এসব পত্রে তাঁর আধ্যাত্মিক এবং মরমী জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতা উপলব্ধি করা যায়। তাঁর পরিচালনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় একটি কলেজ, হাসপাতাল এবং একটি লংগরখানা জনগণের সেবায় নিয়োজিত হয়। কলেজ ও হাসপাতালের জন্য সুলতান হুসাইন শাহ্ বহু নিষ্কর ভূমি দান করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি মুসলমানদের ঐক্য সাধনে তৎপর হন এবং তাঁরই রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ফলে রাজা কংশের পুত্র যদু মুসলমান হন এবং পরে সুলতান জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ নামে বাঙলার সিংহাসনে বসেন।

১৪৪৭ সালে হযরত নূর কুত্‌বুল 'আলম ইন্তিকাল করেন (মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে মতানৈক্য আছে)। পিতার পার্শ্বেই পাণ্ডুয়াতে তাঁর সমাধি রচিত হয়।

মীর সইয়্যিদ আশরাফ জাহাঁগীর সিমমানী

মীর জাহাঁগীর সিমমানী ছিলেন বাঙলার একজন কৃতী সূফী-সাধক। সিমমানের রাজবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে যৌবনকালে সিংহাসন, সম্পদ ও অনায়াস সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পিছনে ফেলে তিনি সাধকের সরল ও নির্লিপ্ত জীবনের ব্রত গ্রহণ করেন। দিল্লীতে কিছুকাল অতিবাহিত ক'রে মখদুম শরফুদ্দীন ইয়াহ্‌ইয়ার (প্রসঙ্গত মখদুম মানেরির সূফী-সাধনা সম্বন্ধে রচিত কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের উল্লেখ করছি—আযীবা, ইরশাদুত তালিবীন, মা'আদান-উল মা'আলী)* শিষ্যত্ব লাভের জন্য বিহার গমন করেন। কিন্তু শয়খ তখন ইন্তিকাল করেছেন (১৩৮০ খ্রী)। মানেরি থেকে বাঙলায় এসে তিনি শয়খ 'আলাউল হকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বাঙলার এই শক্তিমান সাধক ও মনীষীর নিকট তিনি আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞান শিক্ষা লাভ করেন। বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষা সম্পন্ন ক'রে পদব্রজে

---

* কিন্তু এসব অমূল্য গ্রন্থ সুরক্ষিত হয়নি বলে নামেই শুধু তাদের একদা-অস্তিত্বের পরিচয় পাই।

তিনি পূর্ব ও দক্ষিণ বাঙলার সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত হন। গুরুর হাতে খিরকাহ্ ও তাঁর খিলাফত লাভের পরে তিনি জৌনপুরে একটি খান-কাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন।

মীর আশরাফ জাহাঁগীর বাঙলা দেশকে গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন। বাঙলার বিশেষ ক'রে উত্তর ও পূর্ব বাঙলার বিচিত্র প্রকৃতির দৃশ্য ও রূপ-সুষমায় তিনি মুগ্ধ এবং অভিভূত হন। বাঙলার এই অনায়াস সৌন্দর্য ও অবারিত শস্য-শ্যামলা প্রান্তর এবং নির্জন নদীতীর সূফী-সাধনা ও ভাব-তন্ময়তার অনুকূল ক্ষেত্র এবং একটি সরাগ প্রশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। তাই তাঁর মতে বাঙলা স্বভাবতই বিপুল সংখ্যক সূফী-সাধক ও সাধু-সন্তদের বাস এবং সাধন-ভূমি হয়ে উঠেছে। তাঁর এই উক্তির সমর্থনে বলতে পারি বাগদাদ, খুরাসান, মক্কা, ইয়ামন, দিল্লী, মুলতান প্রভৃতি দূরতম স্থান থেকে সাধকগণ বাঙলায় এসেছেন। প্রসঙ্গত শাহ্ লংগরের কথা উল্লেখযোগ্য। বাগদাদের এক শাহ্যাদা সংসার ত্যাগ ক'রে বহু দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণের পর ঢাকায় আসেন এবং ঢাকার দশ মাইল উত্তরে মুয়ায্যামপুরে সাধন জীবন শুরু করেন। এ স্থানে তাঁর সমাধি বিদ্যমান। শাহ আলী বাগদাদী ১৫৭৭ সালে ঢাকায় বসতি স্থাপন করেন। ঢাকার উত্তর প্রান্তসীমায় অবস্থিত মীরপুর তাঁর মাযার শরীফে প্রতি বছর শত শত ভক্তজনের ভিড় হয়। বাঙলার অফুরন্ত রূপসুষমায় ও ছায়াশীতল নির্জনতার মধ্যে তাঁরা সেই মহাশিল্পীর সৃষ্টিমহিমা অন্তর-গভীরে উপলব্ধি করেছেন এবং তাঁর প্রেম ও করুণার দাক্ষিণ্য লাভে ধন্য হয়েছেন। পবিত্র কুরআনের 'রহমাতি ওয়াসিয়াত কুল্লা শাইন'—তাঁর রহমত (প্রেম করুণা ও দয়া-দাক্ষিণ্য—এ শব্দগুলোর দ্বারাও রহমত শব্দের সম্যক অর্থ পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না। তা সম্পূর্ণভাবে সাধনা, উপলব্ধি ও অনুধ্যানসাপেক্ষ) সব কিছুকে পরিবৃত ও পরিধৃত ক'রে আছে। বাঙলার সরস মাটির বুকে বসে সূফী-সাধকগণ সেই অপার দাক্ষিণ্যের স্বাদ কিছুটা পেয়েছিলেন সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে একটি ভাব ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করছি। পবিত্র কুরআনে হজ্, যাকাত, সালাত, সিয়াম ইত্যাদি সম্বন্ধে আড়াই শ' আয়াত প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির ওপর অর্থাৎ প্রকৃতির দৃশ্যরূপ-সুষমাকে পটভূমি ক'রে আল্লাহ্র যে বাণী-সমূহ প্রকাশিত ও ক্রমোন্মোচিত এবং অর্থময় হয়েছে, সেই প্রকৃতির ওপর প্রেরিত আয়াতের সংখ্যা সাড়ে ন' শ' অর্থাৎ 'প্রকৃতির দিকেই' আল্লাহ্

মানুষের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছেন। কারণ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হলেই তাঁর মহিমা ও বিস্ময়কর সৃজন-শক্তির লীলা সম্যক অনুধাবন এবং অন্তর-গভীরে তার রসময় বোধের উপলব্ধি সহজ ও সম্ভাবনাময় হয়ে আসে।

বর্ষা-বাদলের দেশ বাঙলা, তাই আল্লাহ্‌র অনন্ত সৃষ্টির সৌন্দর্য-সুষমার লীলা নিকেতন এবং সূফী তথা প্রেমিক সাধকদের আশ্রয়স্থল। নবীজী প্রকৃতিকে গভীরভাবে ভালবাসতেন---কারণ তার রূপ-সুষমায় ও আনন্দ-বর্ষণে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি-কুশল-শক্তির স্পর্শ বিদ্যমান। একটি ঘটনার কথা বলি। একদিন হঠাৎ মেঘের বর্ষণ শুরু হলো, নবীজী তাঁর পবিত্র সুন্দর গাত্রের কাপড় খুলে আল্লাহ্‌র করুণা-বর্ষণ দেহে মনে উপভোগ করলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ ভিজে গেল। একজন সাহাবী বললেন : আপনি যে একেবারে ভিজে গেছেন! উত্তরে নবীজী বললেন : হ্যাঁ, এ মেঘ যে আল্লাহ্‌র এবং তারই বর্ষণে সিক্ত হয়ে আমি ধন্য হলাম! সূফী-সাধকগণ ছিলেন একান্তভাবে নবীজীর ভক্ত। তাই তাঁরা প্রকৃতির প্রসন্ন সুন্দর শান্ত-সবুজ পরিবেশ সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন।

পীর বদর উদ্দীন বদর-ই-আলম

বাঙলার বহু স্থান পীর বদরের নামের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত। এ সব জায়গায় পীর বদরের দরগার ভিতর দিয়ে তাঁর স্মৃতি ছড়িয়ে আছে। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে তিনি একটি প্রস্তরখণ্ডে চড়ে চট্টগ্রাম আসেন এবং অলৌকিক শক্তির দ্বারা চাটি জ্বালিয়ে সেই স্থানের অশুভ শক্তির প্রভাব দূর করেন। স্থানীয় উপভাষায় প্রদীপকে চাটি বলে এবং কারো কারো মতে বদর শা'র চাটি থেকেই চাটিগাহ (প্রদীপের স্থান) 'চট্টগ্রাম' নামের উৎপত্তি।

চট্টগ্রামে তিনি ইসলাম প্রচার করেন। বদর-ই-আলমের দরগাহ্ বদর মুকাম, বদর পীর, বদর আউলিয়া, বদর শাহ্, পীর বদর প্রভৃতি নামে চট্টগ্রামের অধিবাসীরা তাঁর সমাধি স্থানের উল্লেখ ক'রে থাকে। বর্ধমানের কালনায় বদর শা'র একটি দরগাহ্ আছে। দিনাজপুরের হেমতাবাদে পীর বদর-ই-আলমের একটি দরগাহ্ বিদ্যমান। এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি আসেন এবং স্থানীয় হিন্দু রাজার অত্যাচারে অতিষ্ঠ

৩----

মুসলমানদের রক্ষার জন্য তিনি সুলতান হুসাইন শা'র সাহায্যে রাজা মহেশকে পরাজিত করেন।

বিহার শরীফে বদর উদ্দীন বদর-ই-আলমের একটি দরগাহ্ আছে। এখানে তিনি ১৪৪০ সালে ইন্তিকাল করেন। কথিত আছে, মখদুম শরফ উদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মানেরি তাঁকে বিহারে আসার জন্য দাওয়াত করেন। কিন্তু চট্টগ্রামে তাঁর দেরী হয় এবং মখদুম মানেরির ইন্তিকালের চল্লিশ দিন পর তিনি বিহার পেঁৗছান। এতে অনুমিত হয়, পীর বদর মখদুম মানেরির সমসাময়িক ছিলেন এবং তিনি চট্টগ্রামে অবস্থান করেন।

বদর শাহ্ বা পীর বদরের নাম বাঙলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়। ষষ্ঠদশ শতকের কবি দৌলত উজীর বাহরাম বলেন, শাহ বদর চট্টগ্রামে সমাধিস্থ হন। আজো দক্ষিণ বাঙলার মাঝিরা দুরন্ত নদীর বুকে পাড়ি ধরবার আগে পীর বদরের দোয়া কামনা করে।

শাহ্ দৌলা পীর

শাহ্ মুয়াযযাম দানিশ মন্দ 'শাহ্ দৌলা পীর' নামেই অধিক খ্যাত। প্রচলিত কাহিনী মতে তিনি ছিলেন আব্বাসীয় খলীফা হারুন-উর-রশীদের বংশধর। বাগদাদ থেকে এসে তিনি রাজশাহী জেলার বাঘায় আস্তানা পাতেন। তখন ছিল সুলতান নসরত শা'র রাজত্বকাল (১৫১৯—৩২ খ্রীঃ)। শাহ্ দৌলা পীর ছিলেন অশেষ আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী। গৌড়ের সুলতান নসরত শাহ্ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বহু লাখেরাজ ভূমি তোহ্ফাস্বরূপ দিতে উদ্যত হ'লে তিনি তা' গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। পরে পীর-পুত্র হযরত হামিদ দানিশ মন্দকে সেই নিষ্কর ভূমি দেওয়া হয়।

শাহ দৌলা পীর বাঘায় তাঁর খানকাহ্ ও একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি-গুণে এবং শিক্ষা দান প্রচেষ্টায় বাঘা অচিরেই একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও বাঙলার একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ করে। শাহ্ দৌলা পীরের পৌত্র পীর আবদুল ওয়াহ্হাবকে সম্রাট শাহ্জাহান মাদ্রাসার জন্য ভূমি দান করেন। উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত বাঘা একটি উন্নত ফারসী শিক্ষাকেন্দ্ররূপে সরকার ও জনসাধারণের স্বীকৃতি লাভ করে।

খান জাহান

সাধারণত খান জাহান খান এবং খান জাহান আলী নামেই পরিচিত। তিনি ছিলেন বাঙলার সাধক-যোদ্ধা। বাঙলায় মুসলিম শাসন ও রাজ্য বিস্তারে তাঁর প্রচেষ্টা বিশেষ মূল্যবান ও উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ বাঙলার দুর্গম ও জনবিরল অঞ্চল (বর্তমান খুলনা জেলা) জয় করে তিনি সেখানে লোকবসতি দ্বারা আবাদ করেন। দেশ জয়ের পর তিনি ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। বাগের হাটে তাঁর সমাধি ভক্তজনের পুণ্যভূমিরূপে বিরাজ করছে। তাঁর সমাধি-সৌধ ১৪৫৮--৫৯ সালে খান জাহানের অন্যতম অনুরক্ত ভক্তশিষ্য মুহম্মদ তাহির কর্তৃক নির্মিত হয়। মুহম্মদ তাহির (পীর আলী নামেই অধিক খ্যাত) পূর্বে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে পীর খান জাহানের হাতে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

একজন সিদ্ধ সাধকরূপে পীর খান জাহানকে হিন্দু-মুসলমান সকলেই আজও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। প্রতি বছর চৈত্র-পূর্ণিমায় পীর খান জাহানের মৃত্যু বার্ষিকীতে শত-সহস্র ভক্তজন তাঁর রওযা শরীফে সমবেত এবং অশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে ধন্য ও পবিত্র হয়।

শাহ্ ইসমাঈল গাযী

শাহ্ ইসমাঈল গাযীও একজন সাধক ও যোদ্ধা ছিলেন। বাঙলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য এ দেশের মুসলমানগণ তাঁর নিকট বিশেষ-ভাবে ঋণী। মক্কায় হযরতের পরিবারে তাঁর জন্ম। বাল্যকাল থেকে তিনি ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন এবং প্রচার ও শিক্ষাদানের কার্যে ব্রতী হন। ইসলামের জন্য নিজকে কুরবান করবার তাগিদে ও অন্তর-প্রেরণায় তিনি মক্কা ত্যাগ ক'রে দীর্ঘ ক্লেশকর ভ্রমণের পর অনুচরসহ লখনাওতি উপস্থিত হন। তখন রুকনুদ্দীন বরবক শাহ্ (১৪৫৯--৭৪ খ্রী) ছিলেন বাঙলার সুলতান। সুলতান তখন গৌড়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত। তাঁর ইঞ্জিনিয়ারগণ ব্যর্থকাম হ'লে শাহ্ সাহেব নদীর ওপর একটি পুল তৈরি করতে পরামর্শ দেন। পুল তৈরির পর গৌড় শহরের প্লাবন বন্ধ হয়। খুশী হয়ে সুলতান তাঁকে গাযী উপাধিতে ভূষিত করেন। পরে তাঁর সেনাপতিরূপে উড়িষ্যার রাজা গজপতির সঙ্গে লড়াই করে মান্দারন সুলতানের দখলে আনেন। কামরূপ জয় করতেও তিনি সুলতানকে সাহায্য

করেন। একটি হীন ষড়যন্ত্রের ফলে শাহ্ ইসমাঈল ১৪৭৪ সালে শহীদ হন। তাঁর মস্তক রংপুরের কান্ত দুয়ারে এবং ধড় মান্দারনে সমাধিস্থ হয়।

বাঙলাদেশে সূফী-সাধনার ধারা প্রাথমিক কাল থেকে আজ পর্যন্তও অব্যাহত গতিতে চলেছে। বর্তমান বস্তু-প্রাধান্যের যুগে বস্তুর চমৎকারিত্বে ও আসক্তিতে প্রলুব্ধ এবং সম্মোহিত হয়ে আছি ব'লে আমরা সাধকদের সন্ধান রাখি না। অন্তর-প্রশান্তি হারিয়ে মানুষ এখন নানা আয়োজনে সুখের খোঁজ করে। কিন্তু সুখ মনে, আয়োজনে নয়, সে কথা প্রায় সবাই ভুলতে বসেছে। বর্তমান যুগের দাহ, অনীহা ও উদ্বেগ-পীড়িত মানুষ শান্তি পেতে চায় Norcotic drugs অর্থাৎ L. S. D. Barbiturates, Marijuana (pot-herb) এক কথায় গাঁজা ইত্যাদির সেবনে ও পরিচর্যায়। এসব ট্র্যাংকুইলাইজার অর্থাৎ শান্তি-সমতা দানকারী ড্রাগগুলো পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সর্বকালের সর্বাধুনিক ট্র্যাংকুইলাইজার যে তাসাউ'ফ তথা আল্লাহ্র প্রেম-সাধনা, আল্লাহ্র সর্বক্ষণ স্মরণ, সে কথা বর্তমানের বস্তুভার-পীড়িত বিভ্রান্ত মানুষ বিশ্বাস করতেও ভয় পায়। তাই মানুষের মনে বিশ্বাসের সামর্থ্য ও দৃঢ়তা ফিরে এলে সূফী-সাধনা আবার পূর্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিকার ও সংস্কারমুক্ত মানুষকে প্রচুর শান্তি ও সান্ত্বনা এবং সত্যিকার পথের নির্দেশ দেবে।

ভারতের সূফী-সাধক

খাজা মুঈনউদ্দীন চিশতী (রঃ)

বালা মান আসলামা ওয়াযহাহু লিল্লাহি
ওয়াহুয়া মুহমিনুন ... ...
ফলহু আযরুহু ইন্দা রব্বিহি
ওয়ালা খওফুন্ 'আলাইহিম
ওয়ালাহুম্ ইয়াহ্ যানুন।

যে আপনাকে আপনার সকল সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বা উপরে নিবেদন ও সমর্পণ করেছে এবং ভাল কাজে রত, তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে পুরস্কার (সুনিশ্চিত) এবং তার কোনও ভয় নেই এবং তাকে কোন দুঃখও করতে হবে না।

কিন্তু যিনি সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত ও আত্মসমর্পিত, ভক্তি ও প্রেমের পথে পরম একের জন্য যাঁর অনন্ত অভিসার, তার কোন পুরস্কারের লোভ নেই, কোনরূপ দুঃখ বা ভয়ভীতিও তাঁকে স্পর্শ করে না, কারণ হাসবুনাল্লাহ্, আল্লাহ্ই তাঁর জন্য যথেষ্ট। ভক্ত সাধক খাজা বাবা ছিলেন এমনি এক পরিপূর্ণ আত্মসমর্পিত সূফী-সাধক। আল্লাহ্ই তাঁর জন্য যথেষ্ট ব'লে তাঁর কোন কিছুই চাইবার ছিল না। বরং তিনি প্রার্থনা করতেন, 'আল্লাহ্ সকল মানুষের পাপ, তাপ, গুনাহ্ যেন আমার নামে লেখা হয়।' সমস্ত পাপী-তাপী ও দুঃখ-দুর্দশা পীড়িত অসহায় মানুষের জন্য তাঁর চিন্তা ও উদ্বেগের অন্ত ছিল না। তিনি ছিলেন সুলতানুল হিন্দ্---এই উপমহাদেশের রাজা-বাদশাহ্ ও সম্রাটগণ অতীতের বুকে অদৃশ্য হয়েছে, বিস্মৃত হয়ে শুধু ইতি-হাসের পৃষ্ঠায় স্তব্ধ হয়ে আছে, কিন্তু ক্লিষ্ট-ক্লান্ত মানুষের দরদী খাজা বাবা হিন্দুস্তানের সকল কালের সুলতানরূপে অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছেন এবং থাকবেনও।

যাঁরা আল্লাহ্‌র পথে চলেন, আল্লাহ্ই যাঁদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান, তাঁরা বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি বলে অলৌকিক কার্য সাধন করতে পারেন।

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) সম্বন্ধে একটি মূল্যবান উক্তি করা হয়ঃ The man who never told a lie. তিনি ছিলেন বাক্‌সিদ্ধ সাধক। যে মুখ কখনো মিথ্যা বলে না, সে মুখ যা বলে তাই-ই সংঘটিত হয়। কারণ সাধনার বলে কামেল পরিসাধক সাধন-লোকের এমন এক স্তরে বা মকামে পৌঁছান, যেখানে তাঁর কথাই আল্লাহ্‌র কথা, তাঁর হাতই আল্লাহ্‌র হাত হয়ে পড়ে--খাজা বাবা ছিলেন এমনি এক কামিল ও ভক্ত সাধক। আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক শক্তিবলে তিনি আজমীর শরীফে আল্লাহ্-রসূলের মাহাত্ম্য প্রচার করেন এবং কালে ইসলামের ছত্রছায়ায় এসে কত লোক ধন্য হয়, পাপীতাপী সকলে শান্তি ও সান্ত্বনা খুঁজে পায়। খাজা বাবার একটি সাধন-বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি তাঁর জীবনের শরীয়ত ও মা'রিফত দু' কূলই রক্ষা করে চলেন। তিনি প্রায় সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র যিকিরে মগ্ন হয়ে প্রেমের আবেগে রসময় ভাব-আনন্দের গভীরে নিমজ্জিত হতেন। তাঁর কোনো বাহ্যজ্ঞান থাকতো না। সালাতের সময় তাঁর কানের কাছে আযান দিলে তিনি সেই ভাব-তন্ময়তার আত্মবিস্মৃত আনন্দ লোক থেকে বাহ্যিক চেতন-লোকে ফিরে এসে বলতেনঃ শরা মুঝকো ছোড়েগা নেহি। ইসলাম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক-মনীষী ইমাম গায্‌যালী (মৃত্যু ১১১১ খ্রীঃ) যুক্তি দিয়ে আপনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে সুন্নী (তথা শরীয়ত) এবং সূফীবাদের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করেন। আর নবীজীই তো সকল পথের উৎস-মূল, প্রেরণার প্রাণকেন্দ্র। রাতে সালাতে মগ্ন হয়ে নবীজী কোথায় কোন্ গভীরে তলিয়ে যেতেন, দীর্ঘকাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে তাঁর পবিত্র পা দু'খানি ফুলে উঠতো। এতে মা আয়শা (রাঃ) অত্যন্ত শঙ্কিতা হয়ে পড়তেন। আর নবীজী বাইরে শরীয়ত রক্ষা ক'রে ভিতর অর্থাৎ অন্তর-লোকে আল্লাহ্‌র সর্বক্ষণের স্মরণ (যিকির শব্দের এই-ই হলো সত্যিকার অর্থ ও তাৎপর্য) তন্ময় হয়ে থাকতেন। হযরত আলী (রাঃ) পরম ভক্তিভাবে উন্মনা হয়ে রাতের অন্ধকারে সন্ধান করতেনঃ আইনা হাবিবী, আইনা হাবিবী,—আমার বন্ধু কোথায়, আমার বন্ধু কোথায়? খাজা বাবার ভক্তি ও কর্ম সাধনায় নবীজীর আদর্শ জীবনের ছায়া প্রতিফলিত হতে দেখি। খাজা বাবা একটি উপদেশ বারবার বিশেষভাবে তাগিদের সঙ্গে সকলকে দিতেনঃ তোমরা নবীজীর উপর দরূদ পাঠাও। একথার তাৎপর্য বিপুলভাবে সাধনা ও উপলব্ধি সাপেক্ষ। পবিত্র কুরআনের ভাষায় নবীজী হলেন রহমাতুল্‌লিল্ আ'লামীন—

সমস্ত বিশ্বের জন্য আল্লাহ্‌র করুণাস্বরূপ। মুসলিম জগতের আউলিয়াদের আধ্যাত্মিক সাধনা শুরু হয়েছে নবীজীর প্রতি তাঁদের অকুণ্ঠ ও অন্তর-গভীর ভালবাসাকে কেন্দ্র ক'রে। কারণ নবীজীকে ভালাবাসাই আল্লাহ্‌কে ভালাবাসা। বিপরীতভাবেও কথাটি সত্য। খাজা বাবা এ মূল তত্ত্বটির তাৎপর্য সমস্ত জীবনের নিষ্ঠা ও সাধনা দিয়ে অনুভব করেছিলেন বলে তাঁর এ তাগিদ—নবীজীর ওপর দরূদ পাঠাও।

খাজা বাবা হিজরী ৫৩৬ সালে সিজিস্তানের সানজার নামক স্থানে এক ধনী ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তখন মুসলিম জগতের এক মহাদুর্দিন ও দুর্যোগের কাল। মধ্য এশিয়া তখন তাতারীদের নৃশংস অত্যাচারে অতিষ্ঠ। পিতা খাজা গিয়াসুদ্দীন অগত্যা সপরিবারে খোরাসানে হিজরত করেন। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। খাজা বাবা ধীরে ধীরে সংসারের প্রতি অনাসক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর অংশের জমিজমা বিক্রি এবং সমস্ত অর্থ দরিদ্র দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ ক'রে সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় তিনি আল্লাহ্‌র পথে বের হলেন। বুখারায় স্বল্পকালের মধ্যে কুরআন শরীফ হিফ্‌য ক'রে হাদীস, তফসীর, ফিকাহ্ প্রভৃতি শাস্ত্রে যাহিরী জ্ঞান অর্জনের পর বাতিনী অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। মুরশিদের সন্ধানে তিনি খুরাসান, ইরাক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণের পর নিশাপুরের হারুন নামক স্থানে তিনি সাধক উসমান হারুনীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। কামিল মুরশিদের খিদমতে থেকে কঠোর সাধনা করে তিনি কামালিয়াত বা সিদ্ধি লাভ করেন। হজ্বের পর তিনি মদীনা শরীফ গমন ক'রে রওযা পাকে নবীজীর উদ্দেশে সালাম দিতেই তিনি তাঁর নিকট থেকে হিন্দুস্তানের বিলায়েত লাভ এবং তাঁর নির্দেশে আজমীর শরীফের উদ্দেশে যাত্রা করেন। আফগানিস্তান সফর শেষ করে তিনি লাহোর এসে পৌঁছালেন। লাহোরে হযরত মখদুম আলী দাতা গঞ্জে বখ্‌শ (রঃ)-এর আস্তানায় দু'মাস আল্লাহ্‌র ধ্যানে কাটিয়ে দিলেন। লাহোর মুসলিম প্রধান ছিল। কিন্তু আজমীর ছিল ঘোর পৌত্তলিকতার কেন্দ্রস্থল। খাজা বাবা আজমীরের পথে চল্লিশজন ভক্তসহ দিল্লীতে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে ইসলাম প্রচার করেন। ইসলামের বাণীতে মুগ্ধ হয়ে দিল্লী-বাসিগণ খাজা বাবার দরবারে ভিড় করতে থাকে, ইসলামের দীক্ষা নিয়ে তাঁর ভক্তে পরিণত হয়। কিন্তু দিল্লীতে আর অধিককাল বাস না করে তিনি আজমীরের দিকে রওনা হলেন। যাত্রার পূর্বে তিনি খাজা কুত্-

বুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ)-কে দিল্লীর জন্য আপন খলীফা নিযুক্ত ক'রে আরো ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেন। আজমীর তখন হিন্দুরাজা পৃথ্বীরাজের রাজত্ব। সেখানে পৌঁছে তিনি নিকটবর্তী আনা সাগরের তীরে অবস্থান করেন। পৃথ্বীরাজ ও তাঁর অনুচরগণ খাজা বাবাকে নানাভাবে উত্যক্ত এবং তাঁর ভক্তদের ওপর নির্যাতন শুরু করে। খাজা বাবা তাঁর অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তি বলে পৃথ্বীরাজের সকল দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিলেন। ব্যর্থ হয়ে পৃথ্বীরাজ খাজা বাবাকে শহর ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দেয়। এ কথা জানতে পেরে খাজা বাবা তাঁর লোকদের নির্দেশ দিলেনঃ রাজাকে বলে দাও, মাত্র তিনদিনের সময় দেওয়া হলো—এই তিন দিনের মধ্যে হয় এ ফকীর, নয়তো স্বয়ং রাজাকে এ শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে। খাজা বাবার এ কথার পর তিনদিন যেতে না যেতেই সুলতান মুহম্মদ ঘোরী আজমীর আক্রমণ করেন। পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও বন্দী হয়। সুলতান বুঝেছিলেন যে, খাজা বাবার দোয়ার বরকতেই তাঁর ভারত বিজয় সম্ভবপর হয়েছে। তাই আজমীর জয়ের পরই তিনি খাজা বাবার সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং তিনদিন পর্যন্ত তাঁর খিদমত ক'রে ধন্য হন।

খাজা বাবা ছিলেন গরীব নাওয়ায---গরীব ও দীন-দুঃখীদের জন্য তাঁর সক্রিয় স্নেহ, দরদ ও সহানুভূতির অন্ত ছিল না। সুযোগ পেলে তিনি অতি সাধারণ মানুষের জন্য কষ্ট স্বীকার করতে তিলমাত্র বিলম্ব বা দ্বিধাবোধ করতেন না। এরূপ অসংখ্য কাহিনী খাজা বাবার নামে প্রচলিত আছে। 'নাওয়ায' শব্দের অর্থ যিনি দরদ ও স্নেহস্পর্শের দ্বারা মানুষের সকল ক্লান্তি, দুঃখ ও দুর্দশা দূর করেন। আমাদের নবীজীর কথা মনে পড়ে। দুই জাহানের বাদশাহ্ সারোয়ারে কায়েনাত নবীজী পথের ধারে ক্লান্ত শ্রমি-কের আড়ষ্ট হাত দু'টি নিজের হাত দিয়ে বুলিয়ে বলতেনঃ আহা! এ হাত দু'টি আল্লাহ্‌র কত প্রিয়! সেই পর দুঃখ-কাতর আল্লাহ্‌র পেয়ারা নবীজীর ভক্ত-অনুসারী খাজা বাবা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল দীনজনের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করতেন। তাই খাজা বাবা গরীব নাওয়ায ছিলেন ক্লিষ্ট ও অসহায় দরিদ্র মানুষের শান্তি ও সান্ত্বনার আশ্রয়স্থল। খাজা বাবা নব্বই বছর পর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন। পরে স্বপ্নে নবীজীর নির্দেশ লাভ করে সুন্নত পালনে সযত্ন হন। খাজা বাবার প্রথম সন্তান কন্যা বিবি হাফিয জামান দিনে রোযা রেখে সারা রাত আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকতেন। খাজা বাবার দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, তাঁরা খাজা বাবার যোগ্য সন্তান ছিলেন।

খাজা বাবার ইন্তিকালের পূর্বে দিল্লী থেকে খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী আপন মুরশিদের দর্শন লাভের জন্য আজমীর আসেন। খাজা বাবা সকলের সমক্ষে খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীকে নিজ খলীফা ও গদ্দিনশীনরূপে মনোনীত এবং এ মর্মে একটি ফরমানে দস্তখত করেন। বিদায়কালে তাঁর হাত ধরে খাজা বাবা দো'আ করে বললেন: আল্লাহ্, আমি কুত্বুদ্দীনকে তোমার হাতে সোপর্দ করছি, তুমি তার হিফাযত করো। শেষ মুহূর্তে খাজা বাবা তাঁকে বললেন: বাবা যেখানেই থাক না কেন মরদের (বীর পুরুষের) মতো থেকো।

খাজা কুত্বুদ্দীনকে খিলাফতের খিরকা দানের বিশ দিন পর খাজা বাবা তাঁর প্রিয়তম মাশুকের সান্নিধ্যে প্রয়াণ করেন।

খাজা বাবা আল্লাহ্‌র প্রেমে প্রায় সর্বক্ষণ মস্‌ত থাকতেন, তাঁর মধুর স্মরণে, ধ্যানে বা মুরাকাবায় মশগুল হতেন। আর খাজা বাবার পোশাক-পরিচ্ছদ ও জীবন যাপনের মধ্যে কোনরূপ আড়ম্বরতা ছিল না। তিনি সকল দিক থেকে নবীজীর সত্যিকার উম্মত এবং তাঁর প্রায় সকল গুণের উত্তরাধিকারী ছিলেন। তাঁর অনাড়ম্বর জীবন যাত্রার কথায় নবীজীকে মনে পড়ে। আমাদের নবীজী খেজুর পাতার মাদুর পেতে শুতেন। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠলে দেখা যেতো তাঁর সোনার পিঠে পাতার দাগ পড়ে গেছে। এখন প্রশ্ন ক'রে দেখুন, আমরা কি সত্যিকারভাবে নবীজীর উম্মত হ'তে পেরেছি?

শরীয়ত ও মা'রিফাতের সমন্বয় সাধন ক'রে খাজা বাবা বলতেন, মা'রিফাত (প্রেম-সাধনা) সফরের প্রথম মনযিল হ'লো শরীয়ত (আনুষ্ঠানিক সাধন-পদ্ধতি)—এ পথে চলতে চলতে সাধক তরীকতের (আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভের) পথের সন্ধান লাভ করে। এ পথে পৌঁছবার পরও যদি পূর্ণভাবে শরীয়তের অনুসারী থাকে, তবে সে মা'রিফাতের পথ পেয়ে যাবে এবং এ স্তর অতিক্রম ক'রে সাধক সর্বোচ্চ হকীকতের পথ বা সত্য সাধনা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সত্য স্বরূপের সন্ধান লাভে সর্বশেষ মকামে প্রয়াণ করে।

খাজা বাবা বলতেন, মা'রিফাতের পথ অতি দুর্গম ও বন্ধুর। এ পথ চলতে হলে দুনিয়ার সমস্ত কিছুর ওপর এমন কি নিজের ওপরও অনাসক্ত ও অসন্তুষ্ট থাকতে হবে। তিনি আরও বলতেন, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্‌র খাস আশিকগণকে জান্নাতে প্রবেশের নির্দেশ দিলে তাঁরা বলবেন: যারা জান্নাতের লোভে তোমার ইবাদত করেছে তারা সেখানে যাক—আমরা

জান্নাত চাই না। (কারণ আল্লাহ্ই তাঁদের জন্য যথেষ্ট।) খাজা বাবা বলতেন, সেই ব্যক্তিই আরিফ বা অধ্যাত্মজ্ঞানী যিনি আল্লাহ্র প্রেমের শরাব পান করে বিভোর থাকেন, সৃষ্টি-সৌন্দর্য-মুগ্ধ দৃষ্টিতে আল্লাহ্র বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির দৃশ্য উপভোগ এবং দাঁড়ানো, বসা বা শায়িত সকল অবস্থায় পরম বন্ধুকে সর্বদা স্মরণ করেন। মা'রিফাতের পথিকজনের মুখে ও মনে সর্বদা আল্লাহ্র যিকির চলবে। খাজা বাবা বলতেনঃ সুখ-দুঃখ সমান মনে করো, সুখে-দুঃখে সব সময় সন্তুষ্ট থেকো এবং আল্লাহ্কে স্মরণ করো। দরিদ্রদের সঙ্গে ওঠা-বসা করবে। নিজের সকল কাজকে আল্লাহ্র হাতে ছেড়ে দেবে অর্থাৎ তাঁর উপর তাওক্কাল করবে, আর অধিক পরিমাণে নবী-জীর নামে দরূদ পাঠ করবে।

আসুন আমরা সকলে খাজা বাবার কথা, উপদেশ ও নির্দেশ মতো চ'লে নবীজীর সত্যিকার উম্মত হয়ে পরম প্রিয়তম বন্ধু আল্লাহ্র সান্নিধ্যে যেন পৌঁছাতে পারি।

খাজা কুত্‌বুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ)

নবীজীর জীবন (যা কুরআন শরীফের একটি ভাষ্যস্বরূপ) এবং বাণী এ উপমহাদেশের (সমগ্র মুসলিম জগতেরও) সূফী-সাধকদের প্রেরণা ও আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তির কেন্দ্র, মূল উৎস ও উত্তরাধিকার। নবীজীকে অনু-রোধ করা হলোঃ রসূলুল্লাহ্ (সঃ), খুব একটি অসাধারণ ভাল কাজ কি হতে পারে? নবীজী উত্তরে বললেনঃ জিহ্বাকে আল্লাহ্র স্মরণে ('যিকির' শব্দের গভীর ও ব্যাপক অর্থ---সর্বক্ষণের জন্য স্মরণ) সর্বদা সিক্ত রাখবে। খাজা বাবা এবং তাঁর খলীফা কুত্‌বুদ্দীন কাকীর সাধন-জীবনে এ কথা আধ্যাত্মিক অনুভবে এবং সর্ব মুহূর্তের সমৃদ্ধিতে ভাবৈকরসের সঞ্চার করে। খাজা বাবা কখনো কখনো সপ্তাহকাল ক্রমাগত রোযা রেখে, দিনে-রাতে না খেয়ে শেষে এক টুকরো রুটি পানি দিয়ে ভিজিয়ে ইফতার করতেন। কুত্‌বুল আখতার বখতিয়ার কাকীও মুরশিদের অনুসরণে ক্রমাগত রোযা রেখে সামান্য ফলমূল আহার করতেন। বখতিয়ার কাকীর অতি প্রিয় খলীফা খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর সামান্য কিছু বন্য তরকারি দিয়ে ইফতার করতেন। খাজা ফরীদুদ্দীনের মানসপুত্র খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া দিনান্তে কয়েকটি মাত্র করলা সেদ্ধ খেতেন। কিন্তু কামিল সূফী-সাধকগণ ধ্যানে, চিল্লা ও মুরাকাবায় এবং যিকিরে ইশ্‌ক-ইলাহীর যে অমৃত পান

করতেন, তাই তাঁদের দেহমন ও আত্মার সম্যক পুষ্টি বিধান করতো। খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া যখন ভোর বেলা তাঁর হুজরা থেকে বের হতেন তখন তাঁর পবিত্র সুন্দর মুখের জ্যোতি দেখে মনে হতো তিনি সারা রাত তাঁর প্রিয়তম মাশুকের সঙ্গলাভে ধন্য ও আরো প্রশান্ত-সুন্দর হয়েছেন। প্রসঙ্গত একটা কথা সবিনয় নিবেদন করছি। যিকির বলতে আমি সর্বক্ষণের জন্য যে স্মরণের কথা বলেছি, তা প্রিয়তমের নাম জপে বেশ কিছু কাল অভ্যস্ত হলে আপনা থেকেই সহজ ও সম্ভবপর হয়ে আসে অর্থাৎ বাইরে জগৎ সংসারের নানা কাজ-কর্মে, কথাবার্তায় লিপ্ত থাকলেও ভিতরে ভিতরে সত্তার অন্তর-গভীরে যিকির আল্লাহ্র নাম-স্মরণ কিন্তু ঠিকভাবে চলে। আমার মতো অতি সাধারণ এক অভাজনের জীবনেও এরূপ অবস্থা সম্ভবপর হয়েছে।

খাজা কুত্বুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ) ভূমিষ্ঠ হয়েই আল্লাহ্র যিকির শুরু করেন। আমাদের কাছে অলৌকিক বলে মনে হলেও আধ্যা-ত্মিক জগতের সাথে আমাদের সাক্ষাত পরিচয় নেই বলে এসব ঘটনা অলৌকিক বলেই মনে হয়। ৫৩০ (মতান্তরে ৫৩৭) হিজরী সালে ফরঘনা অঞ্চলের আওশ নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আড়াই বছর বয়সে তাঁর পিতা সৈয়দ কামালুদ্দীন ইন্তিকাল করেন। মাতার তত্ত্বাবধানে তিনি লালিত-পালিত হন। শিক্ষাশেষে তিনি খাজা বাবার মুরীদ হয়ে মুরশিদের সেবায় ও মা'রিফাত সাধনায় মশগুল থাকার পর তাঁর খিলা-ফতের খিরকা লাভ করেন। বিভিন্ন দেশ সফর শেষে দিল্লীর পথে তিনি কিছুকাল মুলতানে হযরত শয়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া এবং হযরত শয়খ জালালুদ্দীন তাবরীযীর সাথে সাক্ষাত করেন। খাজা বাবা তখন আজমীরে। তাঁর নির্দেশে বখতিয়ার কাকী স্থায়ীভাবে দিল্লীতেই অবস্থান করতে থাকেন। কয়েকবার আজমীরে হাযির হয়ে মুরশিদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। একবার খাজা বাবার সঙ্গ লাভের সময় ফযরের পর তাঁর অন্তরে রুটি খাওয়ার বাসনা জাগে। ঠিক সেই মুহূর্তে আলিমুল গায়িব আল্লাহ্র নিকট থেকে রুটিপূর্ণ একটি খাঞ্চা তাঁর নিকট উপস্থিত হয়। এ ঘটনার পর থেকে তিনি কাকী (রুটিওয়ালা) নামে পরিচিত হ'তে থাকেন।

খাজা কুত্বুদ্দীন শেষ বয়সে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। এরূপ অবস্থায় তিনি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নির্দেশ মতে ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকরকে তাঁর গদীনশীনরূপে মনোনীত করেন। ইন্তিকালের পূর্বে রবিউল আউয়াল

মাসের ১০ তারিখে একটি 'সেমা'র (কাওয়ালী সঙ্গীতের আসর) মজলিসে তিনি কাওয়ালীদের মুখে একটি কবিতা আবৃত্তি শুনে ভাবের আবেগে অধীর হয়ে পড়েন। তাঁর অনুরোধে কাওয়ালিগণ বারবার আবেগ-দীপ্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করতে থাকে ঃ

বন্ধুর খন্‌জরের আঘাতে যারা নিহত হয়
তারা অদৃশ্য থেকে এক বিশেষ জীবন লাভ করে।

অধীরতা প্রশমিত হলে তিনি সালাত আদায় করেন। সালাতের পর আবার সেই 'হাল' শুরু হয়। তাঁর শরীরের প্রতিটি লোমকূপের মুখ থেকে যেন আল্লাহ্ নামের যিকির শুরু হ'তে থাকে। চতুর্থ দিনে কবিতার সেই পংক্তি শুনে তিনি বন্ধুর স্মরণে সকল বাহ্যিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। অন্তর-লোকের যিকির তখনও চলেছে। এক সময় (৬৩৪ হিজরীর রবিউল আও-য়ালের ১৪ তারিখ) যিকিরের মধ্যেই তিনি তাঁর পরম প্রিয়তম বন্ধুর সান্নিধ্য লাভ করেন। দিল্লীর নিকটবর্তী 'মোহরে ওয়ালী'তে তাঁর সমাধি রচিত হয়। আজও লক্ষ লক্ষ ভক্ত প্রেমিক তাঁর মাযার যিয়ারত ক'রে আল্লাহ্‌র যিকিরে মগ্ন হন---আল্লাহ্ আল্লাহ্।

খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রঃ)

আল্লাহু নূরুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ---আল্লাহ্ মর্ত্য ও নক্ষত্র-লোকের আলোক। এ আলোক বিশুদ্ধতম, বস্তুর আলোক তার একটি প্রতিফলন মাত্র। সত্যিকার আলো আল্লাহ্। নূরুন্ আ'লা নূরিন* আলোর ওপর আলো—এ আলো মহান ও মহিমময়, স্বয়ংপ্রভ এবং স্তরের ওপর স্তরে তার মাহাত্ম্য ও হিরণ্ময় স্বতঃপ্রকাশ। এ আলোর জ্যোতির্ময় জালোয়ার কণামাত্র দেখে মূসা নবী হতজ্ঞান হয়েছিলেন। আমাদের নবীজী আল্লাহ্‌র নূরের নূর, নূরুম মিন্ নূরুল্লাহ্। নবীজীর এ নূর প্রসারিত ও বিচ্ছুরিত হয়েছে সূফী-সাধকদের প্রেমে ও ভক্তি সাধনায়। তার সামান্য-তম ছোঁয়ায় আমাদের দেহমন ধন্য, শুদ্ধ এবং পবিত্র হয়। সুলতানুল

---

* ইমাম গাযযালীর 'মিশকাতুল আনোয়ার' গ্রন্থে প্রাণ ও রহস্যময় আল্লাহ্‌র উপমা-রূপকের বিশদ ব্যাখ্যা আছে। বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কার Laser beam (লেইজার বীম) দশ লক্ষ গুণ অধিক বিশুদ্ধতম আলো আমাদের সকল কল্পনা ও ধারণার অতীত। আর সকল আলোর উৎস যে আল্লাহ্‌র আলো তা তো সকল কালের জন্য আমাদের কল্পনার অতীত হয়ে আছে।

আউলিয়া খাজা নিযামুদ্দীন (রঃ) এমনি এক অ. .ধিকারী মহান সাধক ও সিদ্ধ পুরুষ।

সূফী-সাধকগণ সূরায়ে নূরের এ অংশটির (আল্লাহু নূরুস সামা-ওয়াতি ...) শব্দের সাধারণ অর্থের অতীত আত্মিক উপলব্ধিতে পরম জ্যোতির্ময়ের অনুভব ও সন্ধান লাভ করেছেন। সাধক শারমুদ তো সেই আলোর তৃষ্ণায় অধীর হয়ে উন্মাদের মতো বলে উঠেছিলেন, 'আয় মাহেলাকা নেকাব উঠা জালোয়া দেখা, সামনে আ—হে চন্দ্রমুখী, অবগুণ্ঠন খুলে সামনে এসো। তোমার জালোয়া দেখাও।' ভক্তকবি রবীন্দ্রনাথ সেই আনন্দময় আলোর স্পর্শ-আকাঙ্ক্ষায় করুণ মিনতিতে বলেছেন ঃ

আলোয় আলোকময় কর হে
এলে আলোর আলো—
আমার নয়ন হতে আঁধার
মিলালো মিলালো।

সূফী-সাধকদের জীবন ও সাধনার আলোচনায় সেই অনন্ত আলোর কিছুটা স্পর্শ পেয়ে আমরা ধন্য হই, তার মাধুর্য-ছাটায় হৃদয়-মনে উদ্বেলিত ও উচ্ছ্বসিত হই।

৬৩১ হিজরী সালের সফর মাসে বদায়ুনে সুলতানুল আউলিয়া হযরত নিযামুদ্দীনের জন্ম হয়। পাঁচ বছর বয়সে পিতা আহমদ ইবন আলী বুখারী ইন্তিকাল করেন। তের বছর বয়সে মাতার সঙ্গে তিনি দিল্লী চলে আসেন। দিল্লীতেই তাঁর বিদ্যা শিক্ষা শুরু হয়। বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর-এর আধ্যাত্মিক সাধনা-সিদ্ধি বা কামালিয়াতের প্রশংসা শুনে তাঁর বাইআত লাভের জন্য তিনি* উৎসুক হয়ে ওঠেন এবং বিশ বছর বয়সে তিনি ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকরের হাতে বাইআত লাভ ক'রে ধন্য হন। বাবা ফরীদ তাঁকে উপদেশ দিয়ে বললেন, সূফী-সাধক জ্ঞানী হবেন, কারণ তাঁর গভীর ও ব্যাপক তত্ত্বজ্ঞান তাঁকে শয়তানের ধোকা থেকে রক্ষা করবে। শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকে ইল্‌মের সাহায্যে তিনি আত্মরক্ষা করতে পারবেন।

---

* বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকরকে বাল্যকালে সালাতে অভ্যস্ত ক'রে তোলবার জন্য মাতা প্রতিদিন জায়নামাযের নীচে চিনি (শকর) রেখে দিতেন। বালক ফরীদুদ্দীন সালাতের পর নিয়মিত সেই চিনি লাভ করতেন। একদিন মা চিনি রাখতে ভুলে যান—কিন্তু বালক ফরীদ ঠিক মতো সালাতের শেষে তাঁর বরাদ্দ চিনি লাভ করেন। মা তাই জেনে বলে উঠলেন, 'বাবা তুমি একদিন সত্যিকারভাবেই গঞ্জে শকর (চিনির ভাণ্ডার) হবে।' সাধক-জীবনে তিনি আল্লাহ্‌ প্রেমের শকর ভক্তদের মধ্যে বিতরণ ক'রে গেছেন।

আরো কয়েক বছর মুরশিদের খিদমতে কাটিয়ে ৬৭২ হিজরী সালের রবিউল আউয়াল মাসে তাঁর খিলাফতের খিরকা লাভ করে নির্দেশ মতো দিল্লী চলে আসেন। নিযামুদ্দীন আউলিয়ার বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি, বাবা ফরীদ অভাবের মধ্যে দিন কাটাতেন। বাবা ফরীদ বলতেন, দরবেশ লোকেরা না খেয়ে মরবে তবু কারো কাছে কিছু ধার চাইবে না। কারণ তাওয়াক্কাল (আল্লাহ্‌র উপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতা) এবং ঋণ গ্রহণের মধ্যে আসমান যমীনের পার্থক্য। সারাদিন পর বাবা ফরীদ কিছু বন্য তরকারি সেদ্ধ দিয়ে ইফতার করতেন।

মুরশিদের অনুসরণে খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়াও কঠোর সাধনা করতেন, সর্বদা রোযা রাখতেন এবং সামান্য বাসী রুটি দিয়ে ইফতার করতেন। একদিন খাদেম কিছু খাদ্য তাঁর সামনে ধরতেই তিনি বললেন : কত দরিদ্র ও মিসকীন মসজিদে অনাহার আছে, তাদের কথা স্মরণ করলে খাদ্য আমার কণ্ঠের নীচে নামে না যে!

দু' জাহানের বাদশাহ্‌ নবীজীর কথা মনে পড়ে। ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্তির জন্য তিনি পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন। ইশক-ই-ইলাহীর অমৃত পানে তাঁরা সর্বদা তৃপ্ত থাকতেন। আর যাঁরা আল্লাহ্‌র যিকিরে সর্বক্ষণ মগ্ন থাকেন, দেহের ক্ষুধা বা তৃপ্তির দিকে দৃষ্টি-মন দেওয়ার সময় তাঁদের থাকে না। আর সূফী-সাধকদের প্রতি খাজা বাবার স্পষ্ট নির্দেশ—'তরকে উকবা' অর্থাৎ জান্নাতের লোভ ও দোযখের ভয় ত্যাগ করে একমাত্র পরম প্রিয়তমের প্রসন্নতা (রিদওয়ান) অর্জনই সাধকের কাম্য। সেই প্রসন্নতা অর্জনই ছিল খাজা নিযামুদ্দীনের সাধনা। তাই সাধক নিযামুদ্দীনকে সুলতান আলাউদ্দীন অনুরোধ-উপরোধ ক'রে এবং নির্যাতনের ভয় দেখিয়েও এ নিরাসক্ত সাধককে আপন দরবারে আনতে পারেন নি। যতবার বাদশাহ্‌ কুত্‌বুদ্দীন দরবারে হাযিরা দেওয়ার জন্য সাধককে নির্দেশ দিয়েছেন, ততবার তিনি তা উপেক্ষা ক'রে ব'লে পাঠিয়েছেন, 'রাজা-বাদশাহ্‌দের দুয়ারে ধর্ণা দেওয়া আমার মুরশিদগণের রীতি নয়। আর সর্বরিক্ত ফকীর পার্থিব ধনগর্বিত সুলতানের দরবারে কেন যাবেন? বরং সুলতানই ...।' প্রতিদিন আউলিয়ার লংগরখানায় দু' হাজারের অধিক লোক তৃপ্তির সঙ্গে আহার করতো। এতো টাকা তিনি কোথায় পেতেন কেউ জানে না। তিনি খাস খাদেমকে বলে রেখেছিলেন, যখন যত টাকা লাগে অমুক তাকে হাত দিলেই সেই পরিমাণ অর্থ সে পাবে। আমাদের

কাছে অলৌকিক হলেও সাধকদের বেলায় এ একটি সাধারণ ঘটনা। আমরা সম্পদ চাই, যত পাই ততই আরো চাই, কিন্তু সাধকরা তো পার্থিব সম্পদ কামনা করেন না, চানও না, তাই সে-সম্পদ আপনা থেকে, অযাচিতভাবে তাদের কাছে হাযির হয়।

সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুগলক সিংহাসনে বসেই তুগলকাবাদ শহর নির্মাণ শুরু করে দেন। দুর্ভেদ্য প্রাচীরঘেরা নগর নির্মাণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মুগল আক্রমণ প্রতিহত করা। এ নগর নির্মাণ উপলক্ষ করে ফকীর-সুলতানে সংঘর্ষ শুরু হলো। শ্রমিক মজুরের সংখ্যা সীমিত, তারা সুলতানের কাজ করবে, না ফকীর আউলিয়ার জনসাধারণের জন্য পরিকল্পিত বিশাল তালাব তৈরির কাজে হাত দেবে। সুলতানের প্রতি ভয়, ফকীরের প্রতি অফুরন্ত ভক্তি। মজুরগণ ফকীরের কাজ শুরু করে দিল। সুলতান গিয়াসুদ্দীন ক্রুদ্ধ হলেন ঃ তবে রে ...সামান্য এক ফকীরের... কিন্তু বাংলাদেশে যুদ্ধ চলছে। সুলতানকে সেখানে ছুটতে হলো। যাওয়ার আগে সুলতান গিয়াসুদ্দীন ফকীর নিযামুদ্দীনকে চরমপত্র দিলেন, গিয়াসপুর ছেড়ে সমস্ত অনুচরসহ তাকে অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে। আউলিয়ার ভক্ত অনুচরবৃন্দ প্রমাদ গুণলেন। সুলতান বিচক্ষণ ও মুসলমান হলেও বড় নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। অনুচরগণ ফকীরকে অনুরোধ করলেন ঃ দিল্লী ছেড়ে চলে যান, গিয়াসুদ্দীন বাঙলাদেশ থেকে দিল্লী ফিরে এসে ... বিগতভয় ফকীর নির্বিকার কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'দিল্লী দূর আস্ত্।' সুলতানের দিল্লী ফেরার সময় হয়ে এলো। তিনি বিজয়দর্পে যোজনের পর যোজন পথ অতিক্রম ক'রে দিল্লীর দিকে ছুটে আসছেন। অনুচরগণের সেই একই অনুরোধ, নিরাসক্ত ফকীরেরও সেই একই উত্তর, 'দিল্লী দূর আস্ত।' আর একদিনের পথ মাত্র বাকী এবং ভক্ত অনুচরগণ সনির্বন্ধ অনুরোধ, অনুনয়-বিনয় শুরু ক'রে দিলেন ঃ এখনও সময় আছে ... । এবার শেষবারের জন্য সাধক-প্রেমিক ফকীর নিযামুদ্দীন নির্বিকার কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'দিল্লী হনুজ দূর আস্ত্, দিল্লী অ-নে-ক দূরে।' সুলতান তুগলকাবাদে পৌঁছালে তাঁকে এক বিজয়-সম্বর্ধনা দেওয়া হলো। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কিছু পরেই বিশাল মণ্ডপ হঠাৎ ভেঙে পড়লো। সুলতান স্তূপে চাপা পড়ে প্রাণ হারালেন, দিল্লী তাঁর জন্য 'হনুজ দূর অস্ত্' হয়েই রইলো।

খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়ার দেহ থেকে সর্বদাই একটি সুঘ্রাণ বের হতো। তাঁর পবিত্র চেহারায় ছিল নূরের এক অপার্থিব দীপ্তি। একানব্বই

বছর বয়সে হিজরী ৭২৫ সালের রবিউস্ সানীর ১৭ তারিখে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের প্রিয় মাশুক খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রঃ) ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর প্রাক্‌কালে তিনি তাঁর সমস্ত পার্থিব সম্পদ দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দেন, ব্যবহৃত বস্ত্রাদি এবং কিছু না কিছু জিনিস খলীফাদের দান ক'রে যান। সম্পূর্ণ রিক্ত ও নিরাসক্ত হয়ে আশিক তাঁর মাশুকের দরবারে প্রয়াণ করেন।

তুতিয়ে হিন্দ্ আমীর খসরু

ইরানের বিখ্যাত সূফী-সাধক ও কবি শয়খ ফরীদউদ্দীন মুহম্মদ আত্তার (মৃত্যু ১২২০ খ্রী) আশিক-মাশুকের মিলন তত্ত্বের রহস্যময় ভাব-কথা অনেক রূপক কাহিনীতে প্রকাশ করেছেন। এখন একটি কথা ভেবে দেখা দরকার। যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি যদি সীমা ছাড়িয়ে যায়, তবে বিভ্রান্তি ও অবিশ্বাস সৃষ্টি অনিবার্য। তাই ভক্তি ও বিশ্বাস দিয়ে কবি আত্তারের একটি রূপক কাহিনী শোনা যাক।

প্রেমিক এসে প্রিয়তমের দ্বারে আঘাত হানলো। প্রিয়তম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কে ওখানে? ঃ আমি। তখনও অপরিণত, অপরিপক্ক ও আত্মমুগ্ধ বলে প্রিয়তম তাকে ফিরিয়ে দিলেন। দীর্ঘকাল পর পূর্ণ আত্মিক উপলব্ধির আনন্দে আশিক ফিরে এলো মাশুকের দ্বারে। আঘাত করতেই আবার প্রশ্ন হ'লো ঃ কে ওখানে? আত্মহারা আশিক এবার অতি সহজেই উত্তর দিল ঃ এই যে তুমি। আশিককে মাশুক সাদরে নিজের ভিতরে গ্রহণ করলেন। 'তুমি'র ভিতর 'আমি'র আনন্দময় অবসান ঘটলো।

হিন্দের তোতাপাখি আমীর খসরুও সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়ে আত্মনিমজ্জনের পরম আনন্দ-আবেগে বলেছেন ঃ

মন তু শুদম তু মন শুদী
মন তন শুদম তু জাঁ শুদী
তা কস্ না গোয়েদ বাদ আযী
মন দিগরম তু দিগরী।

অর্থাৎ ঃ

আমি হই তুমি, তুমি হও আমি
আমি হই তনু তুমি তার প্রাণ
যেন এর পরে কেহ বলিতে না পারে
তোমাতে আমাতে দূর ব্যবধান।

আমীর খসরুর পিতা আমীর সাইফুদ্দীন মাহমুদ তুরান দেশ থেকে ভারতে আসেন এবং দিল্লীর সুলতান ইলতুতমিশের অধীনে চাকরি গ্রহণ ক'রে ইটা জেলার পাতিয়ালী শহরের অধিবাসী হন। এ পাতিয়ালী শহরে ১২২৫ সালে তুতিয়ে হিন্দ্‌ আমীর খসরু জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক জীবনের অনেক দুঃখ-কষ্ট ও ভাগ্য বিপর্যয়ের পর তিনি সুলতান জালালুদ্দীন খলজীর দরবারে সভাকবির পদে বৃত হন। পরবর্তী সুলতান আলাউদ্দীন খলজীও তাঁকে এ সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত রাখেন। এ পর্যন্ত কবির বিখ্যাত চারটি 'দিওয়ানে'র মধ্যে 'তুহ্‌ফাতুস সিগর' বা তরুণের দান ও 'ওয়াস্‌তুল হায়াত' বা মধ্যবয়সের দান—এ দুখানি দিওয়ান প্রকাশিত হয়েছে। পরিণত বয়সের দান 'গুরবাতুল কামাল' বা পূর্ণ আলোক এবং 'বকেয়া-নকেয়া' তখন প্রেমের পরম উপলব্ধি ও অনুভবের অপেক্ষায় আছে অর্থাৎ সূফী-ভাবের যে নিবিড় বোধময় আনন্দ তাঁর জীবনকে সার্থক ও পূর্ণ পরিণতি দান করেছে, তখন পর্যন্ত যোগ্য মুরশিদের অভাবে তা দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। সাধক-শ্রেষ্ঠ নিযামুদ্দীন আউলিয়ার আধ্যাত্মিক সঙ্গ ও সাহচর্যে আমীর খসরুর সূফী ভাবধারা এবং কবি ও সাধক জীবনের পূর্ণ স্ফূর্তি ও পরিণতি লাভ ঘটে। আমীর খসরুর 'দিওয়ানে' সূফী ভাবধারা রসপক্ক আঙুর ফলের মত জমাট বেঁধে ওঠে। সূফী-দৃষ্টির উদারতা, অন্তরের ভাব-তন্ময়তা ও আবেগ প্রসারের দূরগামিতা তাঁর পরম প্রিয়তমের অনুসন্ধানে এবং প্রসন্নতা লাভে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছে। যুক্তি ও বিচার তর্কের স্থান যে সেখানে নেই! প্রিয়তমের জন্য ভক্ত-প্রেমিক খসরুর প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছে, এই-ই যথেষ্ট। কোন যুক্তি সেই আকুল উন্মাদ-নাকে সংযত বা ব্যাহত করতে পারে না। তাঁর কথায়ঃ

যুক্তি দিয়ে যায় কি ঢাকা
উন্মাদনা সত্যকার
বুদ্ধি-বিচার সকল কিছু
লোপ পেয়েছে আজ আমার।

ওসব বালাই রইলে বিপদ
নইলে সবি চমৎকার।
প্রেম ও বিচার এ দু'টো চিজ
যেন তফাত আগুন জল।

প্রেমিক খসরু অন্ধকারের নিভৃত গোপনে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হয়ে সকল দুঃখ নিরসন করবেন ঃ

কেমন করে বাঁচবো বলো
জীবন-মরণ তোমার হাত
হয় মরণ আজ দাও গো তুমি
কাটে না আর দুখের রাত।
না হয় এসে বাঁচাও মোরে
সইতে নারি আর জ্বলন।
অন্তরালের অন্ধকারে
মিলতে যে চাই তোমার সাথ।

কিন্তু কবি প্রেমাস্পদের দেয়া দুঃখকে ভয় করেন না। রুমীর কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনি বলছেন ঃ

তোমার হাতে সুখ পাবো না
জানি আমি সুনিশ্চয়
দুঃখ যদি দেবেই তবে
যেমন তোমার ইচ্ছে হয়।
পরান ভ'রে দুঃখ দিয়ে যাও
করো নাকো তিল কসুর,
দুখ্ দিয়ে সুখ পেলে তুমি
এই ভেবে খোশ মোর হৃদয়।

বিরহ-তপ্ত হৃদয়ের বর্ণনা দিয়ে আমীর খসরু বলছেন ঃ

মোমের মতো ঝরছে গ'লে
ব্যথা-কাতর এই হৃদয়
কেমন ক'রে কাঁদবো 'উহু'
হৃদয় তো আর দুইটি নয়।
কেমন ক'রে ভুলবো বলো
তোমার কাজল দীঘল চোখ
তোমার নীলিম নয়ন বন্ধু
ছড়িয়ে আছে আকাশময়।

রবীন্দ্রনাথের একটি সঙ্গীতে এই ভাবের ইঙ্গিত আছে ঃ

তুমি যে চেয়ে আছো আকাশ ভ'রে
নিশিদিন অনিমেষে দেখছো মোরে।
আমি চোখ এই আলোকে মেলব যবে
তোমার ঐ চেয়ে দেখা সফল হবে,
এ আকাশ দিন গুণিছে তারি তরে।

বিরহের প্রহর গণন ও অনন্ত বেদনা বক্ষে ধরে প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় জীবন-যাপন ও কাব্যের ভিতর দিয়ে পরম সুন্দরের প্রতি খসরুর আত্মনিবেদনের সাধনা একদিন সার্থক হয়ে দেখা দেয়।

কবির পরিণত বয়সের দান 'গুরবাতুল কামাল'—পূর্ণতার জ্যোতির্ময় নিদর্শন ৬৯৩ হিজরী সালে সংকলিত হয়। আল্লাহ্র প্রশংসামুখর এ কাব্যে কবি পরম প্রিয়তমের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর গভীর অনুভূতি ও উপলব্ধি অপরূপ ছন্দে প্রকাশ করেছেন। কবির চতুর্থ কাব্য 'বকেয়া নকেয়া' ৭১৬ হিজরী সালে আলাউদ্দীন খলজীর মৃত্যুর কিছু পরেই প্রকাশিত হয়। এই কাব্যও আল্লাহ্, রসূল ও মুরশিদ নিযামুদ্দীনের প্রশংসা গানে মুখর হয়ে উঠেছে। 'বকেয়া-নকেয়া'য় কবি ইরানের সূফী কবিদের মত আল্লাহ্র প্রেমের স্বাদ ও তুলনা শরাবের প্রতীক-ব্যবহারের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

যেমন ঃ

আজ ঈদ, তাই সাকী পাত্রে
ঢেলেছে রুবি
তৃষ্ণার্ত উপবাসীদের জন্য শরবত
দান করতে।
শরাব রুগনের
প্রাণ-সঞ্জীবনী,
শরাব তরলিত প্রাণ কিংবা
পাত্রের বুকে বিগলিত সূর্য।

আমীর খসরু একজন বিখ্যাত গীতি ও সুরকার ছিলেন। তাঁর আবিষ্কৃত সেতার এই উপমহাদেশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত ও সুরবাহনরূপে বিরাজ করছে। আমীর খসরু বহু গজল-কবিতাও রচনা

করেন। এ সকল গজলে তিনি আশিকের প্রেমার্ত হৃদয়ের আনন্দ-বেদনা অমর্ত আবেগে প্রকাশ করেছেন:

বন্ধু এসো এই হারানো পথিক জনের পর
তোমার মনের চিন্তা যেন ঝরে নিরন্তর।
রেশমসম পক্ষতলে উজল দু'টি চোখ—
জ্বলছে মধুর ঝরছে নিতি অজানা আলোক।
হায় খসরু দুঃখ যেন দীর্ঘ কালো রাত
দীঘল যেন তোমার কালো চুলের রেখাপাত।

প্রিয়া আমার বন্ধু আমার
বাঁধো কেশের পাশ
পরশ তোমার পাবো আমায়
দাও না সে আশ্বাস।

শুধু সূফী কবি ও সাধক হিসেবে নয়, প্রথম উর্দু লেখক ও ঐতিহাসিক-রূপেও তাঁর দান অতুলনীয়। ফারসী ভাষায় কবিরূপে তিনি হাফিয, জামী ও রুমীর সঙ্গে সগোত্রিত হয়েছেন। একাধারে এরূপ এক বিরাট প্রতিভার আবির্ভাব ও সাক্ষাত বহু শতাব্দীর পরেই ঘটে থাকে।

মুহম্মদ তুগলকের রাজত্বকালের প্রথম দিকে সাধক নিযামুদ্দীন আউলিয়া ইন্তিকাল করেন। দিল্লীর পশ্চিম প্রান্তে বর্তমানের জঙ্গপুরায় তাঁর সমাধি রচিত হয়। মুরশিদের বিরহ আমীর খসরুকে অধিককাল সহ্য করতে হয়নি। তাঁর মৃত্যুর ছ' মাস পর ১৩২৮ সালে তিনিও তাঁর অনুগমন করেন।

পাকিস্তানের সুফী-সাধক

॥ সিন্ধু ॥

শাহ্ আবদুল লতীফ

১৬৯৬ সাল। সিন্ধুর হালা হাবেলি গ্রাম। একটি সুন্দর কক্ষে চার বছরের শিশু শাহ্ লতীফ উস্তাদের হাতে প্রথম সবক গ্রহণ করছেন।

'পড় বাবা, 'আলিফ'।'

'আলিফ।'

'পড়, 'বে'।'

শিশু দ্বিতীয় বর্ণটি উচ্চারণ করলো না, করতে চাইলো না, কিছুতেই না, তাড়নাতেও না। রুদ্ধ স্বরে উস্তাদ আবার বললেন—'পড়, 'বে' ……।'

শিশুর মুখে আর বাণী নেই। আশ্চর্য!

শিশু আলিফ ছাড়া আরবী ভাষার আর কোনো বর্ণই পড়বে না। ঘটনাটি পিতার কর্ণগোচর হ'লো। বিস্মিত পিতা ছুটে এলেন। শিশুর অনমনীয় মনোভাব—অসহ্য। শিশু পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে পিতা কি বুঝলেন, জানি না। উস্তাদকে তিনি বললেন, 'বাবা আমার ঠিকই করেছে উস্তাদ সাহেব। অনাগত সাধকের ভক্তি ও দীপ্তি ওর মুখে-চোখে। 'আলিফ' দিয়ে আল্লাহ্‌র নাম শুরু—আলিফ ছাড়া ও যে আর কিছুই স্বীকার করতে পারে না!' গতানুগতিকতার রুদ্ধ কারাপ্রাচীর থেকে শিশু-সাধককে পিতা মুক্তি দিলেন।

অনেক দিন পরের কথা। শাহ্ লতীফ সাধনার পথে তখন অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। সত্যের আনন্দ-সত্তা তাঁর দেহ-মনকে বারবার অভিভূত করছে,—প্রিয়তমের উপলব্ধি নিবিড়তর হয়ে উঠছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার দিন,

দীর্ঘতর রাত্রি অতিবাহিত হয়ে চলেছে। শাহ্ লতীফ এক বিশাল বনস্পতির কোটরে আশ্রয় নিয়েছেন। প্রিয়তমের নাম-জপের ও সান্নিধ্য লাভের জন্য লোক-বসতি ও জন-কোলাহল থেকে বহুদূরে এই নির্জনতম স্থানে অভিসার জীবন যাপন করছেন। ঝড়ঝঞ্ঝা ও অশ্রান্ত বর্ষণ বাইরে—অন্তরেও তার প্রতিচ্ছবি। ঝড়-বাদলের অশ্রান্ত বর্ষণ আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব—অনন্ত জীবন-জিজ্ঞাসা, সাধনার প্রস্তুতি—বিরহের উচ্ছ্বসিত আবেগ, তপ্ত হাহা-শ্বাস, অশ্রু-বেদনা। এমনিভাবে দিন যায় সাধকের। হাতে তসবীহ্—নাম-জপ, সুমীরণ—'আলিফ', 'আলিফ',—'আল্লাহ্, আল্লাহ্'! এমনি বিরহের একটি বর্ষণ-মুখর দিন। বৃক্ষের পল্লব ঘনছায়ায় দু'জন গয়লানী আশ্রয় নিয়েছে। তাদের কথালাপ রসালাপে পরিণত হয়েছে। সাধক লতীফ অন্ত-রাল থেকে শুনছেন।

প্রথমা—হ্যাঁ লা, তোর নাগর তোকে কত ভালবাসে রে?

দ্বিতীয়া—খুবই ভালবাসে। আমার ভাই ওকে দেখলেই কেন যে খুব লজ্জা করে!

প্রথমা—আ মরি মরি! রসবতীর রঙ্গ দেখে বাঁচিনে! নাগরের নাম দিনে ক'হাজার বার জপ করিস্, বল তো?

দ্বিতীয়া—অনেক বার।

প্রথমা—অনেক বার তো' বুঝলাম—গুণে গুণে ক'বার, ঠিক ক'রে বল্। আমি তো আমার নাগরের নাম দিনে রাতে হাজার একবার জপ করি। সে যে কী আনন্দ!

দ্বিতীয়া—(লজ্জার মাথা খেয়ে) হ্যাঃ, প্রাণের দোসর যে, রসের নাগর যে তার নাম নেব আঙ্গুলে গুণে গুণে? যতবার খুশী তার নাম স্মরণ করি। অগুণ্তি বার—এ ক'টা আঙ্গুল দিয়ে আর কতবার গোণা যায়?

শাহ্ লতীফ ভাবলেন, সত্যিই তো—প্রিয়তমের নাম জপ গুণে গুণে কেন? তাঁর নাম স্মরণ (যিক্র) যে আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে চলে। তস্বীহ্ ফেলে দিয়ে শাহ্ লতীফ আল্লাহ্র নাম-সমুদ্রে নিমজ্জিত হলেন (ইস্তিগ্রাক)।

বহুদিন পর। সাধক চিত্তের উদ্বেগ-অশান্তির ঝড় থেমে গেছে। অশান্ত মনের আবেগ-উচ্ছ্বাস সংযমিত হয়েছে। হৃদয়-মনে তাঁর অপার প্রশান্তি। প্রিয়তম বহুদূরে—তবু তাঁর রাগ-অনুরাগে অন্তর রঞ্জিত হতে

শুরু করেছে। জ্যোতির্ময়ের আগমন আসন্ন। প্রতীক্ষারত সাধক শাহ্ লতীফ একদিন বসে আছেন। একজন শিষ্য এসে রুদ্ধ নিশ্বাসে বলে গেল, 'বাবা, আপনিই এর বিচার করুন।'

'কী—কিসের বিচার?'

'আমাদের গাঁয়ের অমুক মেয়ে কুলে কালি দিয়ে অমুকের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। কি লজ্জার কথা! আপনার কাছেই এর বিচার চাই। মেয়েটির কি শাস্তি হওয়া উচিত, আপনিই বলে দিন।'

সাধকের দৃষ্টি তখন অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—কতকটা স্বগত ও অন্যমনস্ক স্বরে তিনি বললেন, 'কি শাস্তি হতে পারে—তাই তো?'

মুহূর্তে অতি দ্রুত ও আকস্মিকভাবে তিনি চারদিকের সব কিছু যেন ভুলে গেলেন। আত্মবিস্মৃতির অতল গভীরে তিনি ডুব দিলেন। আত্মস্থ সাধকের ভাব-নিমগ্ন অবস্থায় অকস্মাৎ ছেদ পড়লো। হঠাৎ জেগে উঠে তিনি সকলের দিকে চেয়ে বললেন, 'কি আশ্চর্য! মেয়েটির কি সাহস—সব কিছু ভুলে, নিশ্চিত আরাম-আয়িস ত্যাগ ক'রে সে চলে গেল তার প্রিয়তমের সঙ্গে? কী সাহস—ধন্য সেই মেয়েটি! ফিরে এলে তাকে আমার আশিস্ দিয়ো।'

শিষ্যটি অবাক! বিস্মিত কণ্ঠে সে বললে, 'এ কী বলছেন, বাবা! একটা ভ্রষ্টা মেয়েলোকের নির্লজ্জতায়—অসম সাহসিকতায় আপনি মুগ্ধ হয়েছেন—এ তো বড় আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য হওয়ার কথাই বটে, বাবা। সাধারণ একটা মেয়ে—যার শক্তি নেই, সামর্থ্য নেই—তার এতখানি সাহস হলো, প্রেমের দায়ে সে প্রিয়তমের সাথে অন্ধকার পথে এসে দাঁড়ালো—অনিশ্চিতকে বরণ করলো। আর আমরা? পুরুষ হয়েও সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে অভিসার করবার মতো শক্তি-সাহস আজ পর্যন্ত লাভ করতে পারলাম না। কোন্‌টা বেশি আশ্চর্যের কথা, বাবা?'

শিষ্য ও উপস্থিত সকলেই হতবাক। আমরাও হতবাক হয়ে ভাবি: প্রাণ-প্রিয়তম আল্লাহ্‌র সাথে, তাঁর পথে সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও লোলুপতা বিসর্জন দিয়ে একান্ত নিঃস্ব হয়ে যাত্রা করবার মতো, আল্লাহ্‌র সঙ্গে পালিয়ে যাবার শক্তি-সাহস কি আমাদের আছে?

সূফী-তত্ত্বের মর্ম কথা উদ্‌ঘাটন ক'রে শাহ্‌ লতীফ বলছেন :

হৃদয়ে তোমার চলে যেন
আলিফের (আল্লাহ্‌র) খেলা—
তবেই জানবে তুমি
কেতাবী জ্ঞানের অসারতা।
পবিত্র দৃষ্টি দিয়ে যদি তুমি
জীবনকে দেখতে শেখো—
তুমি জানবে :
আল্লাহ্‌র নামই যথেষ্ট।
হৃদয়ে যাদের প্রত্যাশা, তীব্র আকাঙ্ক্ষা
তারা শুধু সেই পৃষ্ঠাই পড়ে
যার বুকে তারা দেখে তাদের প্রিয়তমকে।

সূফীবাদের ব্যাখ্যা এর চাইতে আর কি সহজ ও প্রাঞ্জল হতে পারে! সূফীদের নিবেদিত ভক্ত-জীবনই সূফীতত্ত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছে। কথায় তার বিশদ ব্যাখ্যা বাহুল্যমাত্র। তবু তার কিছুটা প্রয়োজন আছে আমাদের জন্য, যাদের হৃদয় এবং সমগ্র জীবন প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় শুষ্ক ও রিক্ত হয়ে পড়ে আছে, আল্লাহ্‌র অবারিত করুণা-ধারার বর্ষণ আজও যারা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেনি—তাদের জন্য সূফীবাদের মূল কথার একটি সুন্দর ইঙ্গিত রয়েছে কুরআন শরীফের একটি আয়াতে :

ওয়াল্লাহুয়াল্লাযী আন্‌যালা মিনাস্‌ সামায়ি মা'আন্‌
ফা আহ্‌ইয়া বিহিল্‌ 'আরদা বা'দা মওতিহা—
ইন্‌না ফি যালিকাল আয়াতাল লিকওমিঁ ইয়াসমা'উন।

আল্লাহ্‌ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং মৃত্যুর পর পৃথিবীকে
করেন প্রাণবন্ত (সজীব)—নিশ্চয়ই তার ভিতর চিহ্ন
(ইঙ্গিত) আছে—তাদের জন্য, যারা শ্রবণ করে।

মেঘের সজল বর্ষণ মৃত ধরণীর জন্য প্রাণ-সঞ্জীবনী অমৃতের ন্যায় মধুর ও সুধাবর্ষী। আল্লাহ্‌র প্রেম-তৃষিত সাধক-চিত্তের, বেদনাতপ্ত হৃদয়ের শান্তির প্রলেপস্বরূপ। মরুতপ্ত ধরণীর বুকে মেঘের বর্ষণ আধ্যাত্মিক জীবনের একটি প্রতীক। জীবনের নানা দৈন্য-দুঃখ ও দুর্বলতা যখন মানব-মনকে সংকীর্ণ ও আত্মাকে শুষ্ক, আড়ষ্ট ও সংকুচিত করে, আল্লাহ্‌র

অফুরন্ত প্রেমের বর্ষণ (সূফীদের অর্থাৎ ভক্তদের জন্য—সাধারণের জন্য আল্লাহ্‌র বাণী বা ওহি) তখন মানবাত্মাকে সজীব ও স্বাধিকার গৌরবে প্রতিষ্ঠা করে। ভক্ত রবীন্দ্রনাথের কথায় ঃ

জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণাধারায় এসো।

সূফী সাধক প্রেমের দায়ে চিত্ত এবং দেহ-মনকে শুষ্ক ও রিক্ত ক'রে আল্লাহ্‌র (প্রিয়তমের) প্রেম-বর্ষণের আশায়, তাঁর করুণার স্পর্শলাভের প্রতীক্ষায় দিনরাত্রি অতিবাহিত করেন।

সূফীতত্ত্বের মূল কথা প্রেম—আর মরমী সাধকদের হৃদয়ই তাঁদের পথ। এ পথের সুনির্জন প্রচ্ছায়ে প্রিয়তমের সাথে তাঁদের হয় গোপন মিলন। এ প্রেমের আনন্দ-ঘন রসরূপ পৃথিবীর সর্বত্র প্রচ্ছন্ন ও প্রতিফলিত। তাই এ পৃথিবী সাধন-পথের প্রতিকূল নয়—অনুকূল। এ পৃথিবী প্রেম-স্বরূপের লীলাক্ষেত্র। কুরআন শরীফের অন্যত্র ঃ

ইউসাব্‌বিহু লাহু মা ফিস্‌ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্‌।
—বিশ্বে (পৃথিবী ও নক্ষত্র জগতে)
যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র প্রশংসা গান করে।

অন্যত্র—

'লাহুল হামদু ফিল উলা ওয়াল আখীরা'

আদি এবং অন্তে তাঁরই প্রশংসা (উদ্‌গত)।

সেই প্রশংসা গানের ঐকতানে সূফীর ভক্ত-চিত্তের আবেদন ও মর্মসুর যুক্ত ও নিবেদিত হয়। এজন্য সূফী-সাধক নিরস তত্ত্বের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে দেখেন না—তাঁরা রস-পিপাসু মন ও সৌন্দর্যের বিস্ময়-দৃষ্টি দিয়ে বিশ্বসত্তাকে অনুভব করেন। তাই সূফীর প্রেমের ক্ষেত্র তাঁর হৃদয়। রস-রূপের ভেতর দিয়ে তাঁর সর্বানুভূতি—সৌন্দর্যবোধ তাঁর দৃষ্টি ও মনকে রাখে বিস্মিত ও সদা জাগ্রত ক'রে। বৃষ্টিধারার স্পর্শে ধরণীর অকস্মাৎ জাগরণের মতো প্রেম সাধকের চিত্তকে মুহূর্তে সত্য জ্ঞানে পূর্ণ করে—জীবনের উপলব্ধি সহজ ও সার্থক করে। সিন্ধী সূফী

মুরাদ আলীর কথায়ঃ প্রেমের পথেই আমার উপলব্ধি হয়েছে সহজ—প্রেম চোখের এক পলকের মধ্যে আমার জীবনকে করেছে আলোকিত। (ইমারসনের অমর বাণী দ্রষ্টব্য—'তাঁর স্পর্শ আমাদেরকে সৃষ্টি করে—আমাদের অস্তিত্ব হয় শুরু। তাঁর (প্রেমের) দ্বারাই আমরা হয়ে উঠি বাস্তবের জীব—অনন্তের উত্তরাধিকারী)। বস্তুত প্রেমের পথ সূফীদের। নীতিবিদ ও দার্শনিকদের নিরস তত্ত্বজ্ঞান ও দর্শন-ব্যাখ্যার জটিলতাবদ্ধ পথকে তাঁরা সযত্নে পরিহার ক'রে চলেন। গভীর নীরবতার ভিতর দিয়ে সূফী প্রেমের দীক্ষা লাভ করেন। আধ্যাত্মিক জীবনে এ নীরবতার একান্ত প্রয়োজন। নীরবতার গহন গভীরে প্রেমের রস নিবিড়তর হতে থাকে এবং তারই গভীর অতলে সূফী শুনতে পান প্রিয়তমের অতুলনীয় কণ্ঠস্বর ও প্রেমসিক্ত বাণী। সিন্ধী সূফী দরিয়া খানের কথায়ঃ নীরবতার ভেতর থেকেই আসে সেই স্বর। তাই সূফীদের যে প্রিয়তম, তাঁর প্রাসাদ সৌন্দর্যের রূপ-সুষমায় গড়া, প্রশান্তি তাঁর প্রবেশ কক্ষ, নীরবতা তাঁর প্রবেশপথ। সূফী তাই নক্ষত্র-খচিত আকাশের ও নিস্তব্ধ রাতের পৃথিবীর নীরবতা কামনা করেন। ওয়ল্ট হুইটম্যানের কথায়ঃ

'রাত্রির বাতাস যেন রহস্য-গভীর।'

সিন্ধুর উষর ও উর্বর ভূমিতে কিভাবে এ প্রেম-সাধন-রসের বন্যা শুরু হলো এখন সেই কথাই বলবোঃ

১৩৫০ সাল। বাগদাদের খলীফা-দরবারের একজন আমীর উসমান শাহ্। কি জানি হঠাৎ একদিন তাঁর মন তৎকালীন ভারত হিজরত করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। তাঁর এ নবজাত উদ্দেশ্য বা ব্যাকুলতার আর কোনো কারণ থাকতে পারে না। তিনি ছিলেন ধনী, সর্বসম্পদ ও ঐশ্বর্যশালী। তাই তাঁর দেশত্যাগের কারণ অহেতুক না ঐশচালিত, নিশ্চয় ক'রে বলা মুশকিল। খলীফার শত অনুরোধ ও অনুনয় উপেক্ষা ক'রে তিনি ভারত যাত্রার জন্য তৈরী হলেন। তিন বন্ধু—শয়খ বাহাওয়াদ্দীন, ফরীদ গন্‌য্ ও মখদুম জলালুদ্দীন উসমান শাহের সঙ্গ নিলেন। যাত্রার দিন নির্ধারিত হলো। তাঁরা পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, পার্থিব সমাজ বা আরাম-আয়েশের কোনো বস্তুই তাঁরা সঙ্গে নেবেন না। ভারতের উদ্দেশ্যে তাঁদের জাহাজ ভাসলো। আরব সাগরের মধ্যে এসে হঠাৎ তরী ডুবতে শুরু

করলো। উসমান শাহ্ আল্লাহ্র কাছে উদ্ধারের কামনা করে সকলকে প্রার্থনায় রত হ'তে বললেন। সালাতের মুহূর্তে উসমান শাহ্ অনুভব করলেন, তাঁদের মধ্যে একজন পার্থিব সম্পদের কোনো একটি প্রতীক বহন করছেন। সঙ্গীদের মধ্যে তিনি অনুসন্ধান করলেন। শেষে একজন স্বীকার করলেন, দুদিনের জন্য তিনি একখানি সোনার তাল গোপনে বহন করছেন। উসমান শাহ্ সোনার তালটি সমুদ্রে ফেলে দিলেন। জাহাজ আবার নির্বিঘ্নে চলা শুরু করলো। সত্য-অনুসন্ধানকারী আত্মবিলোপ কামনা করে, পার্থিব সম্পদ বা শক্তি-লোভের সঙ্গে তার কোনো রফা হতে পারে না। এক কথায় বিষয়-বুদ্ধির স্থান সাধক-চিত্তে অসম্ভব।

চার বন্ধু সিন্ধু দেশে পেঁছুলেন। সিন্ধুর সেহ্ওয়ানে তাঁরা উপনিবেশ স্থাপন করলেন। তাঁদের রস-সিক্ত প্রাণ-বন্যার ধারা সিন্ধুর চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। গতানুগতিক প্রাণহীন জীবন-যাত্রার মধ্যে প্রেমের বিরাট প্লাবনের সৃষ্টি হলো। সে প্লাবনে অন্ধ আচার ও বিশ্বাস, অচলতা ও অচলায়তন এবং বহু যুগের অন্ধ নিষ্ক্রিয়তা ভেসে গেল। প্রেমের আবেগে ও রস সিঞ্চনে নতুন প্রাণ-চাঞ্চল্য দেখা দিল। প্রাণহীন আচার অনুষ্ঠানের নিগড় থেকে অধীর তৃষ্ণার্ত আত্মা মুক্তি পেল। আল্লাহ্র করুণাধারা ও প্রেমের বর্ষণে তৃষিত মানব-চিত্ত শান্ত হলো। কিছুদিন পর বাহাওয়া-দ্দীন পঞ্জাব-মুলতানের নিকটবর্তী উশে গেলেন—অন্য দু'জন আর দু'টি স্থানে হিজরত করলেন। চার বন্ধুর ভারত আগমনের কিছুকাল পরই বাগদাদ থেকে খাজা হাসান নিযামী সিন্ধু হয়ে দিল্লীতে এসে বাস স্থাপন করলেন। এভাবে সিন্ধুর মারফত সমগ্র উত্তর ভারতে সূফী-ভাবধারা প্রসার লাভ করে। বস্তুত সিন্ধুকে আমরা বিভিন্ন রাজবংশ ও রাজ্য স্থাপন এবং অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসে একটি বিচিত্র সমন্বয় ও আশ্রয়-স্থলরূপে দেখতে পাই।

সিন্ধুর সূফিগণ কি ভাবধারার প্রচার করেছেন? প্রেমের জগত বহু পুরাতন হলেও প্রেমের বিচিত্র ধারা নব নব প্রাণরসে সিঞ্চিত ও পুষ্ট হয়ে সর্বকালের তরুণ ও সাধক চিত্তকে আকর্ষণ করে। সিন্ধুর সূফিগণ সেই একই কথা, একই পুরাতন সুরা নতুন পাত্রে পরিবেশন করেছেন। তাঁরা প্রচার করেছেন আল্লাহ্র প্রেমের কথা। সত্যের অভিসারে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদই শুধু একান্ত নির্জনে একে অন্যের সঙ্গ ও সাক্ষাতলাভ করবে, কারও মধ্যস্থতায় নয়। প্রত্যক্ষ সংযোগ ও আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বারাই হবে

বহু প্রত্যাশিত মিলন। প্রেম-পথের যাঁরা অভিযাত্রী তাঁদের কথা, চাল-চলন ও পথ চলার ভঙ্গিই আলাদা। শাহ্ লতীফ বলেছেন : পৃথিবী যদি ভাটায় চলে, তুমি যাবে স্রোতের উজানে। সাচাল বলেন : পাপ-পুণ্যের পথে আল্লাহ্‌কে কেউ জানে না (অর্থাৎ তাঁকে জানার পথই ভিন্ন)।

বেদিল বলছেন : পুঁথি পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই, শুধু আত্ম-বিলোপের গূঢ় তত্ত্ব শেখো। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। বহু শতাব্দী পূর্বে আফগানিস্তানের একজন বিখ্যাত মনীষী শিষ্যদের একদিন নদীর তীরে ডেকে নিয়ে গেলেন। জীবনের দীর্ঘকাল ধরে যে-বিরাট গ্রন্থমালা তিনি রচনা করেছেন, তার সবগুলো নিয়ে আসতে মনীষী তাঁর শিষ্যদের আদেশ দিলেন। আদেশ পালিত হলো। পুস্তকগুলো একে একে তিনি নদীর পানিতে ফেলে দিয়ে বললেন : পাণ্ডিত্যের সকল অভিমান ও অহংকার শেষ হলো, এখন আমি সত্যকে জানতে সক্ষম হবো। সিন্ধুর সূফী শ্রেষ্ঠ শাহ্ লতীফও একদিন কিড়ার হ্রদের পানিতে তাঁর মনীষার অবদান তথা অহংজ্ঞানের প্রকাশ বিচিত্র গ্রন্থাবলী বিসর্জন দিয়েছিলেন।

সত্য সহজেই ধরা দেয়। কিন্তু আমাদের জীবন আচ্ছন্ন ও আবিষ্ট। এ আচ্ছন্নতা ও আবিষ্টতা অর্থাৎ অসংখ্য কামনার আবিলতা দূর না হলে সত্য কখনও হৃদয়ে সহজে প্রকাশিত হয় না। শাহ্ লতীফ বলছেন :

প্রিয়তমের পথ দিনের মতো স্বচ্ছ ; শুধু
অগুণতি কামনা বাসনা তা' আচ্ছন্ন ক'রে আছে।

হ্যাঁ, প্রিয়তমের প্রেমের স্বাদ যাঁরা লাভ করেছেন তাঁরা নির্বাক হয়ে গেছেন। সেই সত্যের স্বরূপ যিনি অনুভব করেছেন, সেই জ্যোতির স্পর্শ যিনি লাভ করেছেন, তিনি সেই বিচিত্র ও অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করবার সকল ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন। সামি বলছেন :

বোবা যখন মিষ্টি উপভোগ করে, সে
কি তখন কথা বলতে পারে ?

আল্লাহ্‌র জ্ঞান যাঁদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে, তাঁরা বোবা হয়ে গেছেন আর প্রেম শুধু অনুভূতিসাপেক্ষ। ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁর বিশ্লেষণ মানবীয় ভাষায় অচিন্তনীয়। রুমী বলছেন :

প্রেমিক কামনা করে এই প্রেম, অন্য প্রেম আর।
অবশেষে দ্বারে আসে এক মনে প্রেমের রাজার।

যতই করি না ব্যাখ্যা এ প্রেমের—যত বিবরণ
শব্দ তার, কথা তার প্রেমমগ্ন লজ্জিত এ মন।
রসনার ব্যাখ্যা দ্বারা স্বচ্ছ-মুক্ত বহুভাব ভাষা,
প্রেম ভালো অব্যাখ্যাত—ব্যাখ্যা তার একান্ত দুরাশা।

এ দুরাশা কোনো সাধকের নেই। তাই সিন্ধুর সূফীবাদের মর্মধারা যেন আমাদের অনুভূতিশীল প্রেমপ্রবণ মনে আপনাতেই সহজে প্রবাহিত হয়, তার জন্য আমাদের প্রতীক্ষা ক'রে থাকা উচিত। উচিত এজন্য যে, আমাদের দেহ-মন আজ পর্যন্তও যথাযথ তৈরী হয়নি। তৈরী না করেও উপায় নেই। কারণ এ পথেই তাঁর প্রাপ্তি সম্ভবপর—'নান্য পন্থা: বিদ্যতে অয়নায়:'

শাহ্ লতীফের মতো সিন্ধুর মুরাদ আলী, দরীয়া খান, বেদিল ও সাচাল সরমস্ত মরুচারী পথিক-প্রেমিক ছিলেন। মরুর সঙ্গে তাঁদের পিপাসাও হয়ে উঠেছিল প্রবল। তাই বিরহের দীর্ঘতম অমানিশায় গোপনে প্রিয়তমের সঙ্গসুধা-রস আকণ্ঠ পান করেছেন। কি ক'রে তা সম্ভবপর হয়েছে, বলছি। প্রথম হলো সহিষ্ণুতার জন্যে। এ সম্বন্ধে সূফীরা প্রায়ই একটি কাহিনীর উল্লেখ করে থাকেন। একদিন হযরত মূসা এক রাখালকে এভাবে প্রার্থনা করতে শুনলেন: প্রভু, আমি তোমার পোশাক ধুয়ে দেব, চুল আঁচড়ে দেব। হযরত মূসার আর সহ্য হ'লো না, আল্লাহ্‌কে এ-ভাবে ব্যক্তিরূপে কল্পনা করার জন্য তিনি রাখালকে খুব তিরস্কার করলেন। মর্মান্তিকভাবে আহত রাখাল চিরদিনের জন্য নিশ্চুপ হয়ে গেল। আল্লাহ্ হযরত মূসাকে এজন্যে ভর্ৎসনা ক'রে বললেন, 'মূসা শব্দ-বাক্য আমার নিকট অর্থহীন, আমি দেখি হৃদয়।' সূফীরা তাই পরম সহিষ্ণুতার সঙ্গে হৃদয়কে লালিত ও পবিত্র করতে প্রয়াস পান। হৃদয়কে একবার স্পর্শ করতে পারলে জীবনের সকল চিত্র-সৌন্দর্য আলোকিত ও সংহত হবে। কিভাবে তা স্পর্শ করা যায়? মুরাদ আলী বলেছেন: প্রেমের ভিতর দিয়েই আমার জীবনে তা সম্ভবপর হয়েছে—এ প্রেম আমার জীবনকে এক নিমিষে শত সহস্র দলে বিকশিত ও পল্লবিত করেছে। তারপর? প্রেমে পড়লে মানসিক ক্ষেত্রে যা হয়, অমর্ত্য অবস্থাতেও ঠিক তাই অর্থাৎ পরম নিস্তব্ধতা। দরিয়া খান বলছেন, 'নিস্তব্ধতার ভিতর থেকেই আসে তাঁর বাণী।' এ নিবিড় প্রশান্তিপূর্ণ নীরবতাকে সূফীরা বলেছেন, প্রিয়তমের প্রাসাদের প্রথম প্রবেশ কক্ষ। আর এ কক্ষ পাষাণে তৈরী নয়, চাঁদের শান্ত

শোভা-সুষমায় তার রূপ কল্পিত হয়েছে। তাই সূফীদের নিস্তব্ধতা চমৎকার রূপায়িত হয় তারাভরা আকাশের নীচে। এ নিস্তব্ধতা কিসে গভীর ও মর্মময় হয়? বেদনার দ্বারা। সত্য তো কোনও দণ্ড নয়, সত্য একটি পথ। সিন্ধুর সূফী বলছেন: দয়িতকে চাওয়ার তীব্র বেদনা আমার এ পথের সাথী বা পাথেয়। এ পথ যেন দীর্ঘ ও চিরন্তন হয় অর্থাৎ তার যেন শেষ না হয়, শেষ হলে তো তাঁকে পাওয়ার পর সব ফুরিয়ে যাবে। আর এ বেদনাবোধের দ্বারাই আমার সমগ্র সত্তা আলোড়িত হয়। তার আনন্দ আবেগ থেকে যে আমি বঞ্চিত হবো! তাই সূফী বলছেন: প্রিয়তমের সঙ্গে যেন আমার কোন দিনই মিলন না হয়! গ্যোটের মেফিস-টোফিলিস বলেছিলেন: বিধাতা, বিশুদ্ধ ও অনন্ত সত্য তোমাতেই সাজে। আমাকে দাও তোমার জন্য অন্তহীন সন্ধানপরতা ও প্রতীক্ষা।

সবই বুঝলাম, প্রেম প্রশান্তি, বেদনাবোধ ও সন্ধানপরতা—কিন্তু শেষ কথা কি? আসক্তি কামনা বাসনাশূন্যতা? বড় শক্ত ও কঠিন শর্ত। কিন্তু আপনি যদি প্রিয়তমকে একমাত্র পরম বন্ধু বলেই গ্রহণ করতে পারেন, তবে আপনার ভাবনা-কামনার আর প্রয়োজন কি? এভাবেই আপনার আত্মবিলয় ক্রমেই সহজ হয়ে আসবে। শাহ্ লতীফ বলছেন:

> তুমি কি একজন সূফী? তবে
> মনে রেখো না কোন কামনা বাসনা।
> মস্তিষ্ক ত্যাগ কর,
> তা আগুনে দাও ছুঁড়ে
> কারণ এই মাথাই খাজাঞ্চীর মতো।
> লাভ লোকসানের হিসাব-নিকাশ করে।

কুরআন শরীফের কথা—'লা তুলহিকুম আওলাদুকুম, ওয়া আমওয়ালুকুম আন্ যিক্‌রিল্লাহ্।'

> তোমার পুত্র-পরিজন এবং ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে যেন তোমাকে বিভ্রান্ত বা বিচ্ছিন্ন না করে।

তাই লতীফের মতে সূফী তিনি, যিনি পরম প্রিয়তমকে তাঁর সর্বেসর্বা করে তুলেছেন। আজ আমাদের ক্রমবর্ধমান বস্তু-উৎপাদন ও জীবনযাত্রার মান আমাদের কতখানি আসক্ত ও বস্তুনির্ভর করে তুলেছে, আমাদের কৃত্রিম অভাববোধ ও অপ্রয়োজনীয় আয়োজন বৃদ্ধি ক'রে চলেছে। অতি

উদ্বেগে ও উদ্বেলতায় আমাদের মন সংশয়িত ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। এক সময় হয়তো আমরাও নিতান্ত যান্ত্রিক ও গতানুগতিক হয়ে উঠবো। তখন 'জিও পিও কি পাস' আর রাখতে পরবো না——তাও জানি। পক্ষান্তরে যুগধর্মের গতি রুদ্ধ করাও কখনো সম্ভবপর হবে না। তবু শাহ্ লতীফের আবেগ-রসে সিক্ত হয়ে অন্তত হৃদয়কে যদি কোন মতে একটু জাগ্রত ও রসাবিষ্ট রাখতে পারি, তবে জীবনে সে আনন্দের আয়তনও কম প্রসারিত হবে না। আর কুরআন শরীফে তো আশ্বাস আছেই—'রহমতি ওয়াসিয়াত কুল্লা শাই-ইন' —তাঁর করুণা সব কিছুকে পরিবৃত ও পরিধৃত করে আছে।

অন্যত্র গভীর আশ্বাস ঃ 'লাওলা ফদ্‌লুল্লাহি আলাইকুম ওয়া রহ্‌মাতাহু ফিদ্ দুনিয়া ওয়লে আখীরা' ঃ ভূলোক ও দ্যুলোক যদি তাঁর দাক্ষিণ্য ও করুণায় পরিপূর্ণ না থাকতো তবে তাই আমরা এতো দুঃখ-দৈন্যেও তাঁর করুণা ও দাক্ষিণ্য লাভে নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হ'য়ে আছি।

॥ দুই ॥

সিন্ধুর অমর কবি ভীট শরীফের বিখ্যাত শাহ্ 'আবদুল লতীফের জীবনকাল ইংরেজী ১৬৮৯ থেকে ১৭৫২ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁর জীবন ও লেখার আলোচনার পূর্বে সে সময়কার সিন্ধুর ইতিহাস কিছু জানা দরকার।

প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে সিন্ধু উপত্যকা ও ইরাকের প্রসিদ্ধ বাগদাদ শহরের নিকটবর্তী অতি প্রাচীন উর শহর ও তাঁর প্রত্যন্ত ভূমিকে কেন্দ্র ক'রে যে এক সভ্যতা গড়ে ওঠে, তারই ভগ্নাবশেষ সিন্ধুর অন্তর্গত ময়েনজোদাড়োতে আবিষ্কৃত হয়েছে। তার বহু পরে অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব ৩২৫ সালে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার সিন্ধুর নিম্নভূমি দিয়ে সিন্ধুনদ পার হ'য়ে ভারত থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। ৭১১ খ্রীস্টাব্দে তরুণ আরবী যুবক মুহম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু উপত্যকার নিম্নভাগে অবতরণ ক'রে সর্বপ্রথম ভারতে ইসলামের বিজয় পতাকা উত্তোলন করেন। তারপর নানা বিপর্যয় ও দুঃখ বিপদের মধ্যেও সিন্ধু প্রদেশ আপন স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখে।

সিন্ধুদেশ তখন দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তর-সিন্ধু উপত্যকা ও নিম্ন সিন্ধু উপত্যকা। এ দু' ভূমিতে বিভক্ত সিন্ধু প্রদেশের ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয়নি। পূর্ব দিকের বিশাল মরুভূমি ও পশ্চিমের উত্তুঙ্গ পর্বতমালা দেশটিকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে স্বতন্ত্র ও স্বপ্রতিষ্ঠ করে। ১৫৪২ সালে শের শাহ্ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে হুমায়ুন সিন্ধুর অমরকোটে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এ স্থানেই তাঁর পুত্র আকবরের জন্ম হয়। আকবর দিল্লীর বাদশাহ্ হয়েই ১৫৯২ সালে সিন্ধু অধিকার করেন। সে সময় থাট্টা ও বাখার এ দুই শহরই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমান সিন্ধুর বিখ্যাত করাচী, হায়দরাবাদ, শিকারপুর ও শুক্কুর শহর অষ্টাদশ ও বিংশ শতকের মধ্যে গড়ে ওঠে।

মুগল শাসনাধীনে এলেও সিন্ধু প্রদেশ তার স্বকীয়তা বজায় রাখতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। স্থানীয় শক্তিশালী অধিবাসীদের মধ্য থেকেই সিন্ধুর শাসনকর্তা নিযুক্ত হতেন। দিল্লীর সঙ্গে সিন্ধুর সম্বন্ধ ছিল রাজস্ব আদায়ের। নিয়মিত খারাজ (ভূমিকর) পেয়েই দিল্লীশ্বর সন্তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু সিন্ধুর অধিবাসীদের শিক্ষা বা অন্যান্য সুখসুবিধা বিধানের জন্য তিনি এক পয়সাও খরচ করতেন না।

সিন্ধুর বিখ্যাত কালহোরা বংশ প্রথমে জায়গীরদাররূপে আবির্ভূত হয়ে ধীরে ধীরে দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে এবং এ বংশের লোকেরাই মুগল বাদশাহ্ কর্তৃক সরকারের শাসনকর্তা মনোনীত হতেন। ইয়ার মুহম্মদ কালহোরা এ কালহোরা বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নিজে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাসের বংশধর বলে দাবী করতেন। দেশের শাসনতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া ধর্মের ক্ষেত্রেও এ বংশ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গযিবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুগল সাম্রাজ্যের চারদিকে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত শাসনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র দিল্লীর সামরিক শক্তি ক্রমে শিথিল হয়ে আসে। ইউরোপীয় বণিকদের আগমনে তখন ভারতে নতুন ভাবধারা ও নানা অভাবনীয় সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ নব জাগরণ ও চিন্তাধারার সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পারায় মুগল সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এ সুযোগে ১৭০৭ সাল থেকেই কালহোরা বংশ সিন্ধুর সার্বভৌমত্ব ও

স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রে দেশের পূর্ব গৌরব ও স্বাতন্ত্র্য ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সিন্ধুর বুকে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো না। তখন এক যুগ-সন্ধিক্ষণ দেখা দিয়েছে—পুরাতনের সঙ্গে নতুনের বিরোধ শুরু হয়েছে। অশান্তি, অরাজকতা ও আত্মকলহে দেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। ১৭৩৮ সাল পর্যন্ত কালহোরা বংশ স্বাধীনভাবে সিন্ধু শাসন করলেন। ১৭৩৯ সালে নাদির শা'র ভারত আক্রমণের ফলে সিন্ধু আবার স্বাধীনতা হারিয়ে পারস্যের সামন্তরাজ্যে পরিণত হলো। ১৭৪৭ সালে সিন্ধুকে আহমদ শাহ্ দুরানী কাবুলের অধীনে নিয়ে আসেন। ১৭৭৩ সালে আহমদ শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধু আবার বহিঃশক্তির হাত থেকে মুক্ত হয়ে আপন স্বাধীন সত্তা ফিরে পেলো। বৈদেশিক শক্তি-প্রাধান্য যথাসাধ্য অস্বীকার, বিদেশীদের প্রবেশ নিষেধ এবং অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে নানা প্রভাব থেকে আপনাকে রক্ষা ক'রে চারদিকের দুর্গম অচলায়তনের মধ্যে সিন্ধু আপনার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। এমন কি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করা সত্ত্বেও শাসকদের আনুকূল্যের অভাবে সিন্ধু ত্যাগ ক'রে চলে যেতে বাধ্য হয়।

পাঠানদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর—কালহোরা বংশকে আর একটি ক্রমবর্ধমান শক্তির সম্মুখীন হতে হলো। একদা শক্তির চরম শিখরে উঠে কালহোরা-রাজ মিয়া মীর মুহম্মদ উত্তরে অবস্থিত রুক্ষ ও অনুর্বর পর্বতমালার অধিবাসী বালুচদের আপন রাজ্যে অতি সমাদরে আহবান করেন। শুধু তাই নয়, এ মেষপালক বালুচদের তিনি নানা উপহার দিয়ে বিশেষভাবে অনুগৃহীত ও আপ্যায়িত করলেন। তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি যে, এই নিরীহ বালুচরা একদিন সিন্ধুর সামরিক ক্ষমতা লাভের দ্বারা তাঁরই বংশের বিলোপ সাধন করবে।

বিদেশী প্রভাব থেকে পরিত্রাণ পেয়ে কালহোরা বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক গুলাম শাহ্ দেশে আবার শান্তি ও শৃংখলা কতক পরিমাণে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন। ১৭৭১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র সরফরাজ খাঁ সিন্ধুর সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তিনি ছিলেন অদূরদর্শী ও স্বেচ্ছাচারী। তাঁর প্ররোচনায় বালুচ তালপুরীদের একজন নেতা মীর বাহরাম খান তালপুর নিহত হলেন। বালুচ জাতির অন্যতম বিশেষ একটি শাখা এ তালপুররা সিন্ধুর রাজ-দরবারে অশেষ শক্তির অধিকারী হয়ে পড়ে।

এ হত্যা সংঘটিত হবার পর থেকেই কালহোরা ও তালপুরদের মধ্যে এক বিপুল রক্তক্ষয়ী ঘরোয়া যুদ্ধ শুরু হলো এবং তার ফলে অষ্টাদশ শতকের শুরুতে তালপুর-বংশ সিন্ধুর সিংহাসন অধিকার করে বসলো।

এই হলো সিন্ধু প্রদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এখন মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। শাহ্ আবদুল লতীফ ১৬৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনকালের শুরু থেকেই সিন্ধুর শাসনভার মুগলদের হাত থেকে কালহোরাদের হাতে এসে পড়ে। আওরঙ্গযিবের মৃত্যুর সময় আবদুল লতীফ ছিলেন আঠার বছরের যুবক। তাঁর বয়স যখন পঞ্চাশ, তখন নাদির শাহ্ দিল্লীর ধ্বংস সাধন এবং সিন্ধুকে পারস্যের সামন্তরাজ্যে পরিণত করেন। আটান্ন বছর বয়সে তিনি আর এক বিপুল 'পরিবর্তন ঘটতে দেখলেন। মরণোন্মুখে দিল্লীর সাম্রাজ্যকে চুরমার ক'রে দিয়ে আহ্মদ শাহ্ আধুনিক আফগানিস্তান রাজ্য গড়ে তোলেন এবং সিন্ধুকে তার অন্তর্ভুক্ত করেন। এর পাঁচ বছর পরে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণের ছয় বছর পূর্বে শাহ্ লতীফ তেষট্টি বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

উপরের এ বিবরণ থেকে দেখতে পাই, শাহ্ লতীফের জীবিতকালে সিন্ধু তথা মুগল সাম্রাজ্যের বুকে নানা বিপর্যয় ঘটে এবং তার দরুন যে বিক্ষোভ ও অরাজকতার সৃষ্টি হয়, তার ঢেউ এসে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকলের মনকেই স্পর্শ করে। এতে শাহ্ লতীফের কবিমন যে বিচলিত হবে তাতে আর বিচিত্র কি! কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, চারদিকের এ তিক্ততা ও অনিশ্চয়তার মধ্যেও শাহ লতীফ অচঞ্চল ও অপ্রমত্ত চিত্তে অসংখ্য গান ও কবিতা রচনা ক'রে সেই পরমসুন্দর এক আল্লাহ্র প্রতি তাঁর ভক্তি ও প্রেমার্ঘ নিবেদন করেছিলেন। বাইরের ঘটনাবহুল ও পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রাকে তিনি বড় ক'রে দেখেন নি। অন্তরের যে ভাবধারা চিরন্তন, যে সত্য চিরকালের, তারই সাধনায় তিনি অন্তর্মুখী মন নিয়ে এক পরম নিভৃতি রচনা করেছিলেন। কালহোরা বংশের আত্মকলহ, রাজনীতি ক্ষেত্রের নানা ভেদ-বিদ্বেষ ও অভিজাতবিলাসী জীবনের বিকৃত অভিব্যক্তি তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু না হয়ে আল্লাহ্র ধ্যান ও সহজ বোধময় আনন্দই ছিল তাঁর জীবন প্রকাশের একমাত্র অবলম্বন ও উপজীব্য।

শাহ্ লতীফের জীবন ছিল অনাড়ম্বর ও বৈচিত্র্যহীন। কিন্তু তাঁর অন্তরের অপার ঐশ্বর্য বিচিত্র ভাবমূর্তিতে রূপান্তর লাভ ক'রে সুন্দর ও অমর হয়ে আছে।

তাঁর জীবনের অধিকাংশ কাল হায়দরাবাদ (সিন্ধুর) জেলার উত্তরে অবস্থিত হালা হাবেলি, কোত্রী এবং ভিটশাহ্ এ তিনটি গ্রামের গভীর নির্জনতার মধ্যে অতিবাহিত হয়। রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন আন্দোলনেই তিনি যোগদান করেন নি।

বাস্তবকে এভাবে অস্বীকার করার মধ্যে কোনও পলায়নী মনোভাবের পরিচয় নেই। যাঁরা গভীর জীবনের সন্ধান পেয়েছেন, জীবনের গভীরতাকে স্পর্শ করেছেন, তাঁদের চিত্ত বস্তুজগতের চাঞ্চল্য ও পরিবর্তনশীলতার অনেক উর্ধ্বে বিরাজ করে। স্থায়ী জীবন তাঁদের কাম্য, সঞ্চারী জীবনের আনন্দ-বেদনা তাঁদের মনকে চঞ্চল করতে পারে না।

বাল্যে ও যৌবনে তিনি লোকোত্তর প্রতিভার পরিচয় দেন। পীর-দরবেশ ও সাধক-ফকীরদের সাহচর্য তাঁর ভাল লাগতো। নির্জনে চিন্তা করা—সকল কলকোলাহল ও জীবনের সর্বগ্লানি থেকে বহু দূরে গভীর গোপনে বসে আল্লাহ্র ধ্যান করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র আনন্দ। একদিন অন্যান্য মুসলমান সাধকদের মত তিনি দেশভ্রমণে বাহির হলেন। পথ তাঁকে ডাক দিয়েছিল। সুদীর্ঘ দিনের আকুল প্রতীক্ষা ও অন্তরের একান্ত বেদনাবোধ তাঁকে একদিন পথের বুকে ডেকে নিয়ে যায়। তাঁর অন্তরাত্মা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে যেন ব্যাকুল স্বরে বলে উঠলো—

'পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে—
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া,
যাত্রাপথের আনন্দ গান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।'—রবীন্দ্রনাথ

শেখ সাদী একদিন এমনি করে পথে বের হয়েছিলেন। আইন-ই-আকবরীর বিখ্যাত রচয়িতা আবুল ফযলের পূর্বপুরুষ মূসাও একদিন অজানার সন্ধানে পথকে বরণ করে নিয়েছিলেন।

শাহ্ লতীফ ছিলেন হিরাটের অধিবাসী এক বিখ্যাত ধর্মপ্রাণ সইয়্যিদ সাধকের বংশধর। সিন্ধুতে এ বংশের মহাজনগণ ধর্মগুরু বা পীরের সম্মানজনক আসন লাভ করেছিলেন। শাহ্ লতীফের পিতার নাম সইয়্যিদ

হাবীব শাহ্। প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করলেও শাহ্ লতীফ কোনদিন জীবনের সহজলভ্য আরাম-আয়েস বা জাঁকজমক ভালবাসতেন না। তাঁর জীবন ছিল অপূর্বভাবে সংযত। শান্ত, ধীর, মিতভাষী ও সৌজন্যের আধার শাহ্ লতীফের প্রাণ ছিল অত্যন্ত কোমল। মানুষ এমন কি ইতর প্রাণীর দুঃখ-কষ্ট পর্যন্ত তিনি সহ্য করতে পারতেন না। সেই সময়কার অভিজাত বংশের উচ্ছৃঙ্খল ও ভোগসর্বস্ব জীবনযাত্রার পরিবেশের মধ্যে থেকেও তিনি যে আত্মসংযমের পরিচয় দিয়েছেন তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। তাঁর এ সহজ সুন্দর ও নির্লিপ্ত সাধক জীবনের প্রতি অনেকেই শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়ে। একজন যুবকের এ জনপ্রিয়তা দেখে ব্যবসায়ী ধর্মগুরু যাঁরা, তাঁরা নানা-ভাবে তাঁর অনিষ্টের চেষ্টা করতে লাগলেন। কালহোরা বংশের উপর সইয়িদদের প্রভাব ছিল অতুলনীয়। তাঁদেরই প্ররোচনায় নূর মুহম্মদ কালহোরা উদার হৃদয় শাহ্ লতীফের জীবন অতিষ্ঠ করে তুললেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রেম যাঁর কাম্য, মানুষের অসন্তুষ্টি বা অহেতুক রোষ তাঁকে কখনও বিচলিত করতে পারে না। নূর মুহম্মদ অবশেষে তাঁর ভুল বুঝতে পেরে তরুণ সাধক শাহ্ লতীফকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করেন। নূর মুহম্মদের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। জন প্রবাদ যে, শাহ্ লতীফের আশীর্বাদেই তাঁর পুত্র গুলাম শাহ্ কালহোরার জন্ম হয়।

ধীরে ধীরে তিনি সাধনার পথে অগ্রসর হতে থাকেন। আধ্যাত্মিক ভাবাবেগপূর্ণ কবিতা ও গান রচনার দ্বারা তিনি জনসাধারণের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু জনপ্রিয়তা ও প্রশংসা তাঁর মনকে পীড়া দিতে থাকে। শেষে লোকালয় ত্যাগ ক'রে ভিট (সিন্ধি শব্দ, অর্থ বালুর পাহাড়) নামক একটি নির্জন স্থানে তিনি তাঁর কুটির নির্মাণ করেন। তার পার্শ্বদেশ দিয়ে কিড়ার হ্রদের স্বচ্ছ বারিধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, আর তার চারদিকের শ্যামল প্রান্তর ও তরুশ্রেণী সিন্ধুর রুক্ষ প্রকৃতির মধ্যে একটি ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করেছে। ভিট শরীফ শাহ্ লতীফের সাধনার উপযুক্ত স্থানই বটে। ধীরে ধীরে ভিটকে কেন্দ্র ক'রে একটি গ্রাম গড়ে উঠলো। শাহ্ লতীফ নিজের হাতে ঘরবাড়ী তৈরির কাজে সাহায্য করলেন। কিন্তু নির্জনতা চাইলে কি হবে তিনি যে অধ্যাত্ম-সম্পদের অধিকারী হয়েছেন, তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভক্ত জনগণ দলে দলে ভিট শরীফে জড়ো হতে লাগলো।

শাহ্ লতীফ ছিলেন সূফী-সাধক। পারস্যের সাধকশ্রেষ্ঠ সূফী-কবি জলালুদ্দীন রুমী ছিলেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয় কবি। শাহ্ লতীফের গুণমুগ্ধ নূর মুহম্মদ কালহোরা তাঁকে রুমীর একখণ্ড 'মসনভী' কাব্যগ্রন্থ উপহার দিয়ে তাঁর প্রসন্নতা অর্জন করেন। তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল পবিত্র কুরআন গ্রন্থ, একখণ্ড 'মসনভী' ও সিন্ধি কবি শাহ্ করীমের একটি কবিতা পুস্তক। আল্লাহ্‌র ধ্যান ও স্মরণে আপনার ব্যক্তিসত্তা ভুলে তিনি দীর্ঘদিন এক বৃক্ষ-কোটরে বাস করেন। এ সময় তিনি বহির্জগত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। লতীফের এ বহু কষ্টলব্ধ সাধনার অপূর্ব ভাব ও আনন্দ-রসে তাঁর সমস্ত রচনা রূপায়িত হয়েছে। সাধকমনের বেদনা ও সন্ধানপরতা চিরকালের ব'লে তাঁর কবিতা ও গান চিরদিনের সম্পদ হয়ে আছে।

১৭৫২ সালে তিনি অনন্তলোকে যাত্রা করেন। ভিট শরীফে তাঁর কবরের উপর গুলাম শাহ্ কালহোরা বহু অর্থ ব্যয়ে একটি সুন্দর সমাধি-সৌধ তৈরী করে দিয়েছেন। আজও প্রতি শুক্রবার শাহ্ লতীফের সমাধি-স্থানে তাঁর কবিতা আবৃত্তি করা হয়, আর তার চারদিকের গভীর নির্জনতা ভেদ ক'রে ধ্বনি ওঠে 'আল্লাহ—আল্লাহ'।

সূফী-কবি শাহ্ লতীফের কবিতা সঞ্চয়ন (রিসালো জু মুন্তাখাব) সিন্ধি ভাষার এক অমূল্য সম্পদ। আজ পর্যন্ত তাঁর সমকক্ষ কবি সিন্ধুতে জন্মগ্রহণ করেন নি। সিন্ধি ভাষা প্রাকৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত। আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত ক'রে শাহ্ লতীফ সর্বপ্রথম সিন্ধি ভাষার প্রাণশক্তিকে পূর্ণ স্ফূর্তি দান করেন। সিন্ধুর নদী, পাহাড়-পর্বত, রাখাল বালক, কুমার প্রভৃতি অতি পরিচিত ও সাধারণ বিষয়বস্তুর দ্বারা তিনি সিন্ধি ভাষার শক্তি বৃদ্ধি ও তাকে জনপ্রিয় ক'রে তোলেন। সিন্ধি জনগণের মুখে ভাষা এবং নতুন ভাবের ব্যঞ্জনা দিয়ে তিনিই সিন্ধি ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন এবং সর্বত্র তার সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছেন—এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। এ উপমহাদেশের মরমী সাহিত্যের ভাণ্ডারী শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন সুদূর ভিট শরীফে গমন করেছিলেন। শান্তি নিকেতনে বসে তাঁর সে রোমাঞ্চকর ভ্রমণ কাহিনী শুনে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলাম। কারণ তখন পর্যন্ত সিন্ধুতে রেল-লাইন প্রসারিত হয় নি। বলাই বাহুল্য দুর্গম পথে ভক্ত তীর্থ যাত্রীর এই অভিসার কাহিনী ছিল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

শাহ্ লতীফের কয়েকটি কবিতার অনুবাদ দিলাম ঃ

দুর্গম পথ

আমার দুর্বলতা আমাকে দেয় আনন্দ—আল্লাহ্‌র কানে কানে
ধ্বনিত হয় আমার প্রেমার্ত বেদনার আর্তনাদ—
ফাঁসির মঞ্চবৃক্ষে করেছি আস্বাদ (প্রেমের)
দুঃখ আমার জন্য নিয়ে এসেছে কি অপূর্ব মহত্ব!
ফাঁসি-মঞ্চ আমাকে ডাকে—ওগো আমার বন্ধুরা,
তোমরা কেউ কি যাবে আমার সাথে?
প্রেমের নাম যারা জেনেছে, আসবে শুধু তারাই
প্রেমের দায়ে।
ফাঁসির কাঠ—তার প্রলোভন দেয় বিছিয়ে,
ডাকে প্রেমিকদের। পেয়েছো কি সন্ধান—
প্রেম বলে কাকে? যাত্রা করো না (সেই দুর্গম রহস্যের পথে),
(তোমার গর্বিত) শিরের মূল্য দিও না কিছু—
তখন করো জিজ্ঞাসা প্রেমের অর্থ কি—তারপর বলো কথা।

ফাঁসির ফাঁস (বস্তু-আবর্তন জালে তার অস্তিত্ব)
অলঙ্কৃত করে প্রেমিকদের। সইয়িদ করে গান—
তারা দেখেছিল প্রেমের বর্শা—কম্পিত হয়নি তা'তে
স্থির পদে দাঁড়িয়েছিল তারা।

প্রেম তাদের দিয়েছিল ডাক—তারা আপনাদের করে নি আবৃত
প্রেমই তাদের সেখানে গেছে নিয়ে—প্রেমের আদেশ।
নির্মম হাতে প্রেম যখন নেয় ছুরি—
তা ধারালো নয় মোটে—বরং ধারে নেই তার তীক্ষ্ণতা।
তাই প্রেমাস্পদের হাত অনেকক্ষণ ধ'রে
চলবে তোমার উপর দিয়ে।
প্রেম কেন আসে—কি ক'রে যে আসে জান কি তা?
ছুরি পড়ে যায়—মুখে ব'লো নাক উহ ও আহা।
কি ক্ষতে তোমার বক জ্বলে যা হয় অপর জনে
ব'লো না তা—মনের বেদনা মনেই রেখো।

সারি সারি দাঁড়িয়েছে প্রেমিকের দল—
মস্তক প্রস্তুত ক'রে—স্থির অচঞ্চল।

ছিন্ন করো শির যেন না হয় অন্যথা,
হয়তো লভিতে পার তাঁর প্রসন্নতা।
ভূমিতে লুটিয়ে পড়া রক্তমাখা শির
ব্যর্থতায় করবে না অন্তর অধীর।
প্রেমের শরাবখানা হত্যা অগণন,
বন্ধহীন বন্যাস্রোতে চলে অনুক্ষণ।
প্রেমের মদিরা যদি শুধু এতটুকু
পান করিবারে চাও একান্ত উৎসুক—
পানশালা হবে তবে একমাত্র নীড়;
পানপাত্র—পার্শ্বে শুধু পড়ে আছে শির
মূল্য দিয়ে কারো পান উন্মাদ অধীর।

শাহ্ লতীফের রচনা পরিচয়

॥ এক ॥

লীলা ও চানেসার সিন্ধুর একটি বিখ্যাত লোকগাথা। সিন্ধুনদ বিধৌত ও পরিসিক্ত সরস অঞ্চলের সহজ সজীবতার মতো এই গাথাটি লোকজীবনে আবেগময় হয়ে উঠেছে। আবেগময়, কারণ তা থেকে সরস মাটির মতোই রসাবেগ মানব-মনকে বহু যুগ ধ'রে আনন্দ ও তৃপ্তি দান ক'রে এসেছে। সিন্ধুর শাহ্ লতীফ এ গাথাটিকে তাঁর সাধক-জীবনের ভাব-প্রেরণার উপাদানরূপে ব্যবহার করেছেন। মনের বাক্‌পথাতীতে রহস্য উপলব্ধিকে তিনি একটি সহজ সরল কাহিনীর মারফত রূপায়িত করেছেন। আশ্চর্য হয়ে আমরা দেখি, মাটির মলিন রস মূল ও শাখাপল্লবে সঞ্চারিত হয়ে কি ক'রে সহস্র দলের রূপসুষমায় রূপান্তরিত হয়। শাহ্ লতীফের ভাব জীবনের এ সার্থক ও সুন্দর রূপান্তরই আমরা এখানে লক্ষ্য করবো।

এক হিন্দু রাজার কন্যা কাউঁরু—অত্যন্ত গর্বিত ও প্রভুত্বপ্রিয়। একদিন তার সখীরা তাকে বললে, পরম সম্ভ্রান্ত ও গুণবান চানেসার দাস-রোর হৃদয় সে জয় করতে পারবে না; তার পক্ষে তা অসম্ভব। সখীদের বিদ্রূপে উত্তেজিত ও আহত হয়ে কাউঁরু প্রতিজ্ঞা করলে, সখীদের এই বিদ্রূপকে অযৌক্তিক ব'লে সে প্রমাণ করবে।

চানেসারের প্রাসাদে প্রবেশ লাভ ক'রে কাউঁরু তার উজীরের সাহায্য ও সহানুভূতি পেলো। উজীর কিন্তু গোপনে চানেসারকে খবর দিলো, নিজের শক্তি-প্রাধান্য প্রমাণ করবার জন্য কাউঁরু তাকে জয় করতে চায়। এভাবে সতর্কিত হয়ে চানেসার কাউঁরুর সকল আবেদন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলো। কাউঁরু কিন্তু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও অদম্য। প্রতিরোধে নিরাশ না হয়ে দাসীর ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে সে চানেসারের প্রাসাদে নিযুক্ত হলো। চানেসারের স্ত্রী লীলার সঙ্গে তার ভাব জমে উঠলো, ঘনিষ্ঠতা নিবিড়তর

হলো। একদিন সময় ও সুযোগ বুঝে সে লীলাঁর কাছে প্রস্তাব করলে, সে যদি তাকে চানেসারের সঙ্গে একটি মাত্র রাত্রি অতিবাহিত করবার ব্যবস্থা করে, তবে লীলাঁকে সে নয় লক্ষ টাকা দামের একটি হীরার হার উপহার দেবে। প্রলুব্ধ হয়ে লীলাঁ সেই রাত্রে কৌশলে চানেসারকে কাউঁরুর গৃহে প্রেরণ করলো, মদের নেশায় প্রমত্ত অবস্থায় চানেসার কলা-কুতূহলা কাউঁরুর রূপাবেষ্টন ও ছলাকলায় আত্মসমর্পণ করলো। উন্মাদনায় ও ভোগ-মত্ততার ভিতর দিয়ে রাত কেটে গেল। পরদিন কাউঁরুর মা চানেসারকে বললে, এখন থেকে কাউঁরুকে স্ত্রীরূপে তাকে গ্রহণ করতে হবে, কারণ হীরার হারের বিনিময়ে লীলাঁ তাকে কাউঁরুর কাছে বিক্রি করেছে। কপট ব্যবহারের জন্য লীলাঁর উপর পীড়ন শুরু হলো। লীলাঁর নিকট থেকে চানেসার প্রতারণার সকল কথা জেনে রাগে ও দুঃখে তাকে তার দৃষ্টিপথ থেকে দূর করে দিলো, কপট ও ছলনাময়ী স্ত্রী লীলাঁকে সে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলো। প্রতিবাদ ও অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও চানেসার লীলাঁর কথায় আর কান দিলো না। লীলাঁ ব্যর্থ ও হতাশ হয়ে দেখলো, নিজের দোষে সে স্বামীর প্রেম ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। এখন থেকে শুরু হলো লীলাঁর (সঙ্গে সঙ্গে সাধক শাহ্ লতীফেরও) বিলাপ ও ক্রন্দন : 'প্রিয়তম, অসহায় আমি, আমাকে পায়ে ঠেলো না।'

লীলাঁ :

কী ক'রে ঠেলিলে পায়ে—দূর ক'রে দিলে
এই চিন্তা মন থেকে? বিদ্ধ করো তুমি
প্রাণের গভীর দেশ—সান্ত্বনার বাণী,
প্রিয়, কথা বলো তুমি—তুমি মম প্রভু,
আমি যে তোমাকে চাই, বড় প্রয়োজন
আমার জীবনে, বন্ধু লোকচক্ষে আর
অনাবৃত করো নাক' আমাকে ঘৃণায়।
স্বামী, প্রিয়তম, আহা আমি দীনহীন—
দূর ক'রে দিও না ক', প্রাণ-প্রিয়তম
তোমার প্রেমের বড় আঘাত দারুণ
ভূপাতিত করে, তবু তুমি মম স্বামী—
এক স্বামী—বহুজন তোমার পিয়াসী।

প্রিয়, যবে কথা বলো আমাকে বলাও,
এত ঘৃণা কেন বন্ধু? চরণের তলে
আমি বসে আছি---মত্ত চঞ্চল অধীর।
সীমার অতীত জানি পাপ ক'রে আমি
রাজ-অধিরাজ আমি আসিয়াছি দ্বারে
একান্তে তোমার বন্ধু, অভিমান ক'রে
আমাকে ফিরাও যদি—আবাসে তোমার
কোথায় আমার স্থান? প্রভু, মুছে দাও
আমার কলঙ্ক যত, ধূলিসিক্ত দিন।
সখীরা দেখেছে পাপ—দুর্নীতি আমার—
তাদের বিদ্রূপ আমি—শুধু পরিহাস।
বাহুতে পরি নি বাজু, কন্ঠে মুক্তা-হার,
যখন করি নি সাজ, কেশ-প্রসাধন,
দুই চোখে আঁকি নাই সুগন্ধি কাজল,
অভিনব রূপ-সজ্জা, প্রিয়তম আমার
খুঁজেছে একান্তে শুধু আমাকে তখন।
কর্ণে স্বর্ণদুল কম্বু-কণ্ঠে হীরা-হার,
বাহুতে বাজুর ভার—পরিপাটি কেশ
অপূর্ব শৃঙ্গার সাজ—তাই বুঝি প্রিয়
পরিত্যাগ করিয়াছে ভাবনা আমার।—
প্রিয়তম বন্ধু, বড় অসহ্য নির্মম
তোমার বিদ্রূপ-ব্যথা বেদনা আঘাত।
তোমার অনেক আছে অযুত প্রেয়সী,
প্রেমার্থী আশিক; কিন্তু তুমি যে আমার
একমাত্র স্বামী বন্ধু। ফিরে এসো, ফিরে
আবার সদয় হও। করুণা দেখাও
পীড়িত ও আর্তজনে। অসংখ্য রূপসী
তোমার তুষ্টিতে রত। ত্যাগ করিও না।
অসহায় আমি বন্ধু। তা'হলে যে আমি
পথভ্রান্ত একা একা ফিরিব বিপথে।
গলবস্ত্র, ভাগ্য মোর বন্ধু চানেসার
সঁপেছি তোমার হাতে—সৌভাগ্য আমার।

লীলাঁর কণ্ঠে শাহ্ লতীফের যে ভাবাবেগ বাণী রূপ লাভ করেছে, তার মধ্যে আমাদেরও ব্যাকুল চিত্তের আর্তনাদ শুনতে পাই। এই ক্রন্দন চিত্তের গভীরতম দেশ থেকে নিত্য উৎসারিত হয়ে আত্মার চিরন্তন বিরহ দুঃখের মর্মবেদনা নিবেদন ক'রে চলেছে। ধূলায় পরিত্যক্ত, অবলুণ্ঠিত মানবাত্মার শাশ্বত ক্রন্দন——পঙ্কের আবরণ ভেদ ক'রে যে পঙ্কজ সূর্যের স্বপ্ন দেখে, সেই ক্রন্দন ও স্বপ্ন দেখা কবে সার্থক হবে? এই প্রশ্নেরই উত্তর যুগে যুগে সাধকগণ দিয়ে এসেছেন, নানাভাবে ও ভাষায়। আমরা তার কতটুকু বুঝেছি ?

॥ দুই ॥

সাধক মনের বেদনা শুরু হয়েছে কবে থেকে ? কত লক্ষ কোটি বছর পূর্বে ঘটেছে তাঁর বিচ্যুতি প্রিয়তমের প্রসন্নতা থেকে ? কক্ষচ্যুত মনের গ্রহ কত মহাশূন্যের যোজন-কোটি পথ অতিক্রম ক'রে মাটির বুকে আশ্রয় নিয়েছে; তৃণ-মঞ্জরী ও নীল দিগন্ত ব্যাপ্ত ক'রে রোমাঞ্চিত হয়েছে বহু মুহূর্তে। তার বেদনাতপ্ত তনু প্রতিফলিত হয়েছে বৈশাখের দগ্ধতায়। ঋতুর চক্রপথের আবর্তন আছে, বিকাশ ও বিবর্তন আছে। কিন্তু সাধক-চিত্তের যে উত্তাপ, তার নিরসন ঘটে কখন ? প্রিয়তম যখন আসে, তার আশ্বাসে যখন ছন্দে সঙ্গীতে প্রমুক্ত হয়, তখন সাধক এক মুহূর্তে আপনাকে সমর্পণ করে, এক নিমিষে তার 'আমিত্বে'র মৃত্যু ঘটে—নিষ্কলুষ নিখাদ সুন্দর 'আমি' চির সুন্দরের প্রেমনিসিক্ত ভাববন্যায় নিমজ্জিত হয়। নিস্তরঙ্গ নীল সমুদ্রের পানি যেন সূর্যের আলোকবন্যার দাক্ষিণ্য-স্পর্শ লাভ করে, ধন্য হয়।

গিরনারের রাজা রায় দিয়াচ। তাঁর বোনের এক ছেলে; বিজল তার নাম। বিজল সম্বন্ধে একজন ফকীর ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন : দিয়াচকে সে একদিন হত্যা করবে। এই অলক্ষুণে শিশুপুত্রের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত মাতা তাকে একটি বাক্সে বন্ধ ক'রে নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। বাক্স ভেসে চললো সিন্ধু নদের স্রোতে। ভাসতে ভাসতে বাক্স এসে লাগলো এক ঘাটে, এক চারণ-কবির ঘাটে। চারণ কবি সেই শিশুকে সঙ্গীতবিদরূপে গড়ে তোলেন।

অভিজাত বংশ, রাজবংশে তার জন্ম—বিজল তা জানে না। এখন সে একজন বিখ্যাত সুর-শিল্পী; দেশ জোড়া তার নাম। তার সুরের সম্মোহনে পথচলা পাখি ও পথিক থেমে যায়, নদীর স্রোত স্তব্ধ হয়। গাছপালা কান পেতে শোনেঃ সে সুরঝংকারে, আলাপের বিস্তারে, খাদ-নিখাদে কার কথা, কোন্ অজানা বন্ধু ও প্রিয়তম জনের দূরবিশ্রুত সুর শোনা যায়। হয়তো সুরের সূক্ষ্ম কাজের মধ্যেই ধরা পড়ে অব্যক্ত আনন্দ-স্বরূপের অফুরন্ত প্রেমের বর্ষণ-সঙ্গীত—তুষার-ব্যাপ্ত নিস্তব্ধতার ধ্যান ভঙ্গ হয়। রাজা অনেরায়ের কন্যা সুন্দরী সোরাথ; তার রূপে আকৃষ্ট হয়ে দিয়াচ তাকে বিয়ে করলো।

কিছুদিন পর দুই রাজার মধ্যে শত্রুতা দেখা দিল। অনেরায় গিরনার অবরোধ করলেন, কিন্তু দখল করতে পারলেন না। অগত্যা তিনি ঘোষণা করলেন, যে দিয়াচের শির এনে দেবে তাকে তিনি প্রচুর সম্পদ দান করবেন।

বিজল এই ঘোষণার কথা শুনলো। শুনে সে চললো গিরনারে। প্রাসাদে প্রবেশ করে সে দিয়াচের কাছে হাজির হয়ে বললোঃ 'রাজা, সঙ্গীত শোনো।'

—'সঙ্গীত? এই সময়ে?' (বেলা তখন দুপুর)।

—'সঙ্গীতের সময় অসময় নেই, রাজা! ভিতরে বাইরে, আকাশে বাতাসে পাখির গানে, সুখে দুঃখের কান্নায়, আর্তনাদে, অত্যাচারে, উৎকট উল্লাসে, সাধকের সুদীর্ঘ প্রতীক্ষায় সঙ্গীত চলছে, সুর উঠছে—মহাসঙ্গীতের সুর। তারই একটি বিচ্ছিন্ন সুর-ধ্বনি শোনো রাজা।'

—'শুনবো। কিন্তু তোমার পরিচয়?'

—'আমার পরিচয় নেই। সঙ্গীতেই আমার পরিচয় মিলবে, রাজা।'

—'বেশ, তার আগে তোমাকে দেখে নিই—কী সুন্দর তুমি চারণ আর কিরূপ ও সুষমা-সঙ্গতি! আকাশের লাবণ্য, আলোর মঞ্জরী যেন তুমি! গাও তোমার গীত—সুন্দর চারণ!'

সঙ্গীতের ঝংকার উঠলো। প্রভাতের লক্ষ লক্ষ পাখির কাকলি যেন তার কণ্ঠে একসঙ্গে, এক মাত্রায়, হাজার মাত্রায় জেগে উঠলো। গান্ধারে, পঞ্চমে, ধৈবতে কোমলে কড়িতে সুরের খেলা, সুর-তরঙ্গের গতি-ভঙ্গ বিচিত্র ভঙ্গিমায়, উদাত্ত ও লঘু নৃত্য দোলায় বিস্তৃত হয়ে চললো। সেই প্রসারিত সুরের ছন্দপ্রবাহে রাজা ভেসে যায়, সোরাথ ভেসে যায়, রাজ্য-পাট, অহংকার-আভিজাত্য,

মান-অভিমান, হিংসা-দ্বেষ সব ভেসে চলে—নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ভারমুক্ত আমি, লঘুপক্ষ সুন্দর আমি মরালের মতো, সমুদ্র-বিহঙ্গের মতো ডানা মেলে দিয়ে উড়ে যায় অনন্ত নভোদিগন্তে। সুরের পর সুরের জাল, জগতের পর জগত, আনন্দের পর আনন্দের উন্মোচন মধুময় আত্মবিস্মৃতি সৃষ্টি ক'রে চললো বিজলের সঙ্গীত। অকস্মাৎ সমে এসে যখন গান থামলো, রাজা দিয়াচ তখন আত্মবিক্রীত হয়ে গেছেন। মুগ্ধ সম্মোহিত রাজা বললেন, 'বিজল, আমার সকল সম্পদ তোমাকে দিলাম।'

বিজল বললে, 'রাজা, সম্পদ চাইনে, তোমার শির চাই।'

আত্মবিস্মৃত দিয়াচ তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন, 'এই আমার শির, ছিন্ন করে এখনি তুমি নিয়ে যাও।'

শোকে সোরাথ স্তব্ধ, এক কথায় শির দিতে সম্মত হলেন রাজা ? সুরের এতই কি অদম্য সম্মোহন ও সম্মুদ্ধি। সোরাথ অনুনয় করে, 'রাজা একি করলে তুমি? আমার কি হবে একবার ভেবে দেখেছ ?'

রাজা তখন সকল ব্যথা, বিবেচনা, সমস্যা ও সমাধানের বহু উর্ধ্বে। সোরাথের নবনীত কোমল হস্ত সস্নেহে সরিয়ে দিয়ে রাজা বললেন, 'শিরতো সামান্য—সঙ্গীতের সুর-মাহাত্ম্যে আমি বিশ্ব-সঙ্গীতের সুরস্পর্শ লাভ করেছি, আমার মূল ভাব-সত্তার সন্ধান পেয়েছি। আমাকে বাঁধা দিও না, সোরাথ।'

কে বাধা দেবে রাজাকে, সেই সুর যে শুনছে, সে মুহূর্তে নিজেকে নিমজ্জিত করেছে সুর-ধ্বনির আনন্দ-তরঙ্গে।

সেই আহবান-গীতিই কি রাজা শুনেছিলেন ? মূল গাথায় তাঁর ইঙ্গিত নেই। কিন্তু সাধক শাহ্ লতীফের হাতে এই গাথার সার্থক পরিণতি ঘটেছে। আখ্যায়িকা এখানে গৌণ; সুরের সম্মোহনে রাজা শির দিলেন—এই কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে শাহ্ লতীফের যে সুন্দর রস-ব্যঞ্জনা ও কাব্য সৃষ্টি, তাঁর সাধক চিত্তের বৃন্ত-শয়নে পরম ভাব-মুহূর্তের যে আবেগ পদ্মের মতো সহস্র দলে বিকশিত হয়েছে, আমাদের কাছে তাই-ই মুখ্য বা প্রধান ভাব-সম্পদ।

'প্রথম রজনী আসে—পথে পথে নিঃশব্দ গভীর
দুর্গের প্রান্তর-প্রান্তে আগন্তুক চারণ-কবির
ধ্বনিল একটি তারে, আহা তার কণ্ঠে যে কী সুর—
গির্নারে উঠিল রব—কোন্ সাধু কোন্ সে সুদূর।

পথিক-বীণায় বাজে সৃষ্টি করে আশ্চর্য বিস্ময়।
রাজা, চাই শির তব—সে চারণ-কবিকণ্ঠ কয়।
দ্বিতীয় রজনী আসে অন্ধকার পূর্বের মতন
ধীরে ধীরে প্রাসাদের স্তব্ধ-বুকে, শান্ত দূর বন।
রাজার আহ্বানে আসে শ্রান্ত পদে চারণ বিজল
একতারা, বাঁশী হাতে। মুগ্ধ চিত্ত আনন্দ-চঞ্চল
রাজা বলে, আসে নাই পূর্বে আর তোমার মতন
এমন গায়ক দক্ষ সুরকার—প্রাসাদে কখন।
তোমার বাঁশীর সুরে দেহ থেকে আত্মা দূরে যায়
আমার সম্পদ সব আজ তব তুষ্টি কামনায়,
তোমাকে প্রচুর দেবো। এস শিল্পী, এস গীতকার
তোমার যন্ত্রের তারে তুলে দাও সুমিষ্ট ঝঙ্কার।

তৃতীয় রজনী আসে অলক্ষিতে এসেছে যেমন
বহু মাস বর্ষে বর্ষে শান্তিপূর্ণ নীড়, গৃহ-কোণ।
অনেক মানুষ আছে সুমহৎ হাজার হাজার,
কি জানি কি মনে হলো অকস্মাৎ খেয়াল আমার,
তাঁদের ছাড়িয়া আমি এইখানে হয়েছি হাজির—
প্রত্যাশা-অতীত কণ্ঠে বহু রাগ-রাগিণীর ভিড়।

চতুর্থ রজনী আসে স্বাগতম হে কবি চারণ!
একাকার সুখ-দুঃখ দ্বেষ-প্রীতি জীবন-মরণ—
সুরে সুরে একি সৃষ্টি রূপলোকে একি স্বর্ণজাল
সুরের মোহিনী-মায়া! অবলুপ্ত স্থান-পাত্র-কাল
আমার দুঃসহ সত্তা। অবারিত এই ধনাগার
তোমার পায়ের তলে—নিবেদিত তুচ্ছ উপহার।

পঞ্চম রজনী আসে—সম্মোহিত আচ্ছন্ন যেমন
মদিরায় পানাসক্ত অচেতন নির্বিকার জন।
লক্ষ লক্ষ রৌপ্য-মুদ্রা কৌচ ও কুশন অবিরত
আসে আর আসে শুধু তার পদপ্রান্তে শত শত।
বিমুখ বিজল বলে, 'এ নহে আমার উপহার
নিয়ে যাও, হে মহান, এই সব ঐশ্বর্যের ভার।

আমি চাই শির শুধু সমুন্নত মস্তক তোমার,
যেন তুমি সুখী হও লাভ করো প্রশান্তি অপার।'

রাজা। একদিকে সঙ্গীত তোমার
অন্যদিকে একশত মস্তকের ভার
সঙ্গীতের ভার বেশি। আর এই শির তা'ও জানি
একটি হাড়ের খুলি—শূন্যগর্ভ পঙ্গু ব'লে মানি।

চারণ। আমার পোশাক পরো,
সঙ্গীতের তারে তারে বাঁধা
এর তন্তু প্রতি সূত্র শত রাগ-রাগিণীতে সাধা।

অনুরাগ প্রতি মাত্রা তালে তালে সুরের বিস্তারে
সুখ-দুঃখ বেদনার।

রাজা। স্বাগতম শোনো গীতকার।
বুঝেছি কি বলো তুমি আর কিছু নাই বলিবার
পরিষ্কার সব অর্থ—পরিচ্ছন্ন আকাশের মতো
তবে পরিতুষ্ট হও।
কবি (শাহ্ লতীফ)...এই তিন গাথা বারংবার
এক সুরে—ছুরি গ্রীবা এই সুর সঙ্গীতের তার।
তীক্ষ্ণ ছুরি বে'র করে বিজল গায়ক সুরকার
রাজার মাথায় হানে বারবার নির্মম আঘাত।
গির্নারের ফুল তোলা শেষ হলো—কাঁদে পথিজন
শোকাচ্ছন্ন মহিলারা—সোরাথের মতো শত শত
প্রলাপ ও শোকে মত্ত। সুসজ্জিত দিয়াচের শির
নিবেদিত হয় পায়ে বিজলের ; শোকের মাতম
নারী কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে : কাল রাতে রাজা মারা গেছে।

সাধক শারমুদ একদিন স্বেচ্ছায় হাসিমুখে শির পেতে দিয়েছিলেন প্রিয়তমের উদ্দেশে। প্রেমের দায়ে জামীও মাথা পেতে দেন প্রিয়তমের দ্বারে। আর আমাদের ? রক্তে নেই প্রেমের আবেগ ও উষ্ণতা, শিরে নেই নেশার উন্মত্ততা। তাই স্বেচ্ছাকৃত আত্মদানে আমরা বিমুখ হই। দিয়াচ ও বিজলের

গাথাকে অবলম্বন ক'রে আত্মদানের ইঙ্গিত শাহ্ লতীফ করেছেন, সে আত্মদান অর্থপূর্ণ বিলুপ্তি নয়, নিজেকে নিশ্চিহ্ন করা নয়—যে 'আমি প্রিয়তমের প্রেম ও সান্নিধ্য লাভ থেকে সুন্দর আমিকে বঞ্চিত করছে অশেষ দ্বন্দ্ব, দুঃখ ও দ্বিধার সৃষ্টিতে জীবনকে নানাভাবে বিড়ম্বিত করছে, সেই 'আমি'র মৃত্যুই শাহ্ লতীফ এবং সাধকগণ কামনা করেছেন।

আমিত্বের এই মৃত্যু যেন আমাদের দৈহিক মৃত্যুর পূর্বেই ঘটে। আমাদের নবীজীও এই কথা ব'লে আমাদের হুঁশিয়ার করে গেছেন।

শাহ্ লতীফের 'রিসালো'

'মরমী' কথাটি আমরা একটু লঘুভাবেই ব্যবহার ক'রে থাকি। 'ধ্বনি বলি, তার অর্থ সাধারণ বুদ্ধির অতীত গূঢ় আল্লাহ্-তত্ত্ব, তবে ঠিক বলা হবে না। কারণ এ অর্থ একেবারে আভিধানিক, আত্মিক বা অভিজ্ঞতালব্ধ নয়। হৃদয় বা মর্মে যে বাস করে, তার সঙ্গে সাধকের সম্বন্ধ বিচার বা সমন্বয় নির্ণয়, এক কথায়, মর্মে যে এক প্রিয়তমের আসন, তাঁর সঙ্গে সাধক-চিত্তের আনন্দ-বেদনা ও বিচিত্র অনুভূতির ভেতর দিয়ে যে যোগসাধন, তাই হলো মরমী; আর যে দৃষ্টি বা পথ এই যোগ-আবিষ্কার করে বা করতে সাহায্য করে, তাই হলো মরমী-দৃষ্টি।

পরিপূর্ণভাবে আপনার তনু-মন-ধন প্রিয়তমকে অর্পণ করা মরমী-ভাবের এক বিশেষ স্তর বা পথ বলে গণ্য। অবশ্য কোনো কোনো সাধকের মনে হয়, প্রিয়তমও যেন তার তনু-মন-ধনের ভিখারী। তাঁর হৃদয়দ্বারে সে বারবার আঘাত হানছে—দাও, দাও, দাও। সাধক বলছে—নাও, নাও, নাও। এই দেওয়া-নেওয়া একটা অহেতুক (বা অহৈতুক) ব্যাপার। অন্তর নিয়েই কবি ও সাধকের যত বালাই। হৃদয় নিয়েই সাধকের এত জ্বলুনি!

মরমী সাধকের সহজ সারল্য অত্যন্ত বিস্ময়কর। দীনতা স্বীকার তার পক্ষে সহজ--এই জন্য সহজ যে, তার একমাত্র আনন্দ প্রিয়তমকে ঘিরে, তাকে নিয়েই তার সকল গর্ব ও বিচিত্র রসবোধ। সাধক জানে, সে যত নীচেই থাক না কেন, প্রিয়তম নিজেই তার পর্যায়ে নেমে আসবেন।

মরমী সাধকের অনুভবই তার পথ-প্রদর্শক ও সাধনা। এই অনুভূতি বেদনার তীব্রতার অনুভূতি, প্রিয়তম বিচ্ছেদের তপ্ত দাহ এই ব্যথা। সাধকেরই বেদনা এক অদ্ভুত অনুভবময় অভিজ্ঞতা।

এই বেদনা বিরহের বেদনা। বিরহ কি? বিরহ হ'লো তাঁকে পাওয়ার ইচ্ছা। আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা না হ'লে কিছুই পাওয়া যায় না

৬—

এবং পেলেও পাওয়ার আনন্দ মেলে না। প্রেমের ক্ষেত্রে ব্যথাই একমাত্র সাধনা। বিরহ অর্থই বেদনা। বেদনাতে জীবন জাগে, জীবন জাগলে প্রেম জাগে, প্রেম হলে সর্ব ইন্দ্রিয় প্রেমের সাধনাতে হয় প্রবৃত্ত। তখন হৃদয়-মন-চিত্তবৃত্তি সহজে হয় স্থির। তাই প্রেমকে বলে সহজ বা মরমী সাধনা। তাই প্রেমের পথই মরমীদের কাম্য ও গন্তব্য।

সিন্ধুর শ্রেষ্ঠ কাব্য-সংকলন 'রিসালো'র যে মরমী দৃষ্টি, তা সম্পূর্ণ ধর্মীয় ভাবে অনুসিক্ত। মরমীবাদ বা মরমী দৃষ্টি ও ভাবধারা একটু হালকা-ভাবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মরমীবাদ আল্লাহ্‌র প্রতি অদৃশ্য জনের প্রতি মানুষের আবেগগত মনের ভাব বা ভঙ্গি। এই আবেগগত মনোভাব দু'রকমের স্ফূর্তি লাভ করে থাকে। প্রথমত, আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলনের জন্য মানুষের আবেগময় সন্ধান। দ্বিতীয়ত, মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই মরমীবাদের দ্বারা সে সত্য, সৌন্দর্য ও পূর্ণতার ধারণা করতে পারে। যুক্তির দ্বারা এই উপলব্ধি সম্ভবপর নয়। বিশ্বাসের দ্বারা মরমীবাদ বিশেষভাবে অনুরঞ্জিত। মরমীবাদের ইংরেজী প্রতিশব্দ Mysticism 'muein' শব্দ থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ হলো 'চোখ বন্ধ' করা। ইন্দ্রিয়গত দৃষ্টিশক্তির সীমা নির্দেশ—তার পাল্লা খুব বেশি দূরগামী নয়। মরমী সাধক চোখ বন্ধ ক'রে অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর চিন্তা তন্ময়তার দ্বারা সত্য ও সুন্দরকে উপলব্ধি করতে প্রয়াস পান। এই প্রয়াসে আমরা মনীষা ও ভাবাবেগের সংমিশ্রণ দেখি। এই মিশ্রণের বিচিত্র অনুভূতির প্রকাশ রূপক ও উপমা ছাড়া অসম্ভব। তাই মরমী দৃষ্টির আপাত আচ্ছন্নতা ও অস্পষ্টতা আমাদের সন্দেহপ্রবণ মনকে আরও সংশয়িত করে তোলে। আধুনিক প্রগতিশীল চিন্তানায়কদের ভাষায় বলতে গেলে, মরমী সাধকের যে অভিজ্ঞতা তা সম্পূর্ণ আত্মগত অনুভূতি ও ব্যক্তিসর্বস্ব নৈরাশ্যবাদেরই নামান্তর মাত্র। কিন্তু আমাদের ভুল এখানে যে, মরমী সাধকের ঠিক বস্তু জগৎ নয়, বস্তুর অতীত যে বোধময় আনন্দলোক বা অধ্যাত্ম জগৎ তার ভিতরেই তার আত্মরতি। এখন বস্তুর অতীত কিছু আছে কি না, তা সম্পূর্ণ ধ্যান ও অনুভূতি সাপেক্ষ। এ নিয়ে তর্ক করা চলে না। বিশেষ ক'রে, এই অনুভূতি, মরমী বা প্রেম সাধনার মূলে বিশেষভাবে শক্তি ও প্রেরণা দান করে বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের দৃঢ়-তার অভাব আমাদের জীবনে দিন দিন মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে।

পার্থিব ও আধ্যাত্মিক—এই দুই জগৎ ও জীবনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপরেই সকল প্রকার ভাব-সাধনার সার্থকতা নির্ভর করে। মরমীবাদে

আমরা এই ভারসাম্য ও সমন্বয় লক্ষ্য করি, অর্থাৎ সেখানে মনীষা ও আবেগ—দুই-ই বিশেষভাবে কাজ করছে। সত্যিকার মরমী সাধনায় শুধু মনীষা বা নিছক হৃদয়াবেগের স্থান নেই। মনীষা অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও আত্মবোধ না থাকলে হৃদয়াবেগ উচ্ছৃংখল ও অসংযত হয়ে ওঠে, আবার আবেগের অভাবে মনীষা নিরস ও নিষ্প্রাণ হয় এবং সাধকের জীবনকে সংশয়িত ও দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে। 'সিন্ধী' কাব্যে আমরা এই দুইয়ের সংমিশ্রণ দেখি—বিশেষ করে শাহ্ লতীফের জীবন ও কাব্যে। হালের (حال) দিক থেকে এখন আমি মরমীবাদকে লক্ষ্য করবো।

সূফী বা মরমী সাধক অত্যন্ত চঞ্চল ও অধীর। এজন্য অধীর যে, সে নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। সে আরো আত্মোন্নতি কামনা করে। তাই তার মধ্যে আমরা প্রথমেই দেখি, পথিক বা সন্ধানী হবার অবিরাম প্রয়াস ও প্রচেষ্টা।

দ্বিতীয়ত, হৃদয়ের জন্য হৃদয়ের আকুতি তার অত্যন্ত প্রবল। যেন প্রিয়তমের জন্য প্রেমিকের প্রতীক্ষা, প্রত্যাশা ও প্রয়াস। প্রথম হাল বা অবস্থার মূলে আছে মনীষা বা সুসংযত আত্মচিন্তা ও পরিবেশ পর্যায়ে আত্ম-বোধ। দ্বিতীয় অবস্থায় আবেগময়তা বা ভাবাবেগ এত তীব্র ও গভীর-ভাবে মূলগত যে, তার এই অবস্থার মরমী ভাবকে জীবন্ত ও নিশ্চিন্ত আশ্বাসপূর্ণ করে তোলে। এই আশ্বাস এতই সুনিশ্চিত যে, সাধক ভাবে, তার সঙ্গে প্রিয়তমের মিলন অনিবার্য বা মিলনের আনন্দ একদিন তার সকল প্রয়াস ও প্রতীক্ষাকে ধন্য ও সার্থক ক'রে তুলবে। তৃতীয়ত, হৃদয়ের পূর্ণতা লাভের জন্য সাধকের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সাধক তার বহুবিধ দৈন্য ও অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। তাই পূর্ণতা লাভের জন্য তাঁর এই ব্যগ্রতা। এই পথে সে স্বেচ্ছায় চরম সংযম বা কৃচ্ছ্রতা বরণ করে। এই দুঃখ বরণেই তার আনন্দ। কারণ তার শেষে আছে আনন্দময়তা ও পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধি। যখন সে এই অবস্থার শেষে এসে পৌঁছে, তখন সে এমন আবেগময় উন্নত ভাব-গ্রামে কথা বলে, যা শ্রোতার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়। সাগরের অসীম বিস্তার ও প্রাণচাঞ্চল্য যে দেখেছে, যে দেখেনি—তার কাছে সে আর ব্যাখ্যা করবে কিরূপে? তাই এই অবস্থায় সাধক গভীর নিস্তব্ধতায় নিমজ্জিত হন।

মরমী দৃষ্টির শেষ লক্ষ্য—এই দৃষ্টির শেষ পর্যন্ত এক বিশুদ্ধ আনন্দ-লোকের সন্ধান পায় (এই আনন্দ বিশুদ্ধ, কারণ এতে কামনা-বাসনার

কোনো স্বাদ নেই)। এই লোকে অমর সাধকদের প্রাধান্য,—দীপ্তি, জ্ঞান, তৃপ্তি এবং আবেগ সমস্ত সংমিশ্রিত হয়ে এমন এক অখণ্ডতার ঐক্য-বোধের সৃষ্টি করে, যা কোনো একটি ভাষায় প্রকাশ সম্ভবপর নয়। এই একমাত্র ক্ষেত্র—যে ক্ষেত্রে এসে কবিতা ও ধর্মের (আত্মনিবেদন অর্থে) সাক্ষাৎ বা মিশ্রণ ঘটে—যেখানে আবেগ (পরম-ভাব-মুহূর্ত অর্থে) এসে সাধক, কবি ও দার্শনিকের তন্ত্রে একই সুরের ঝংকার তোলে। এইরূপ আধ্যাত্মিকতার আলোক ও আবেগের প্রতিফলন দেখি শাহ্ লতীফের 'সুর আসা'তে :

আমার এই সাধারণ চোখ দু'টি
আমার জন্য নিয়ে এসেছে করুণার দাক্ষিণ্য,
তাদের সামনে যদি থাকেও বা বিপদ
আমি দেখি প্রেম তার বদলে।
সারাদিন তারা দেখে—তবু তারা সেখানে
দেখতে থামে,
তারা দেখেছে এবং চিনেছে প্রেম
এবং ফিরে এসেছে আমার কাছে।

'সুর বরভো'তে আবার দেখি :

প্রিয়তমের শপথ,
মাশুকের মুখ সবচেয়ে সুন্দর ও কমনীয়।
পৃথিবীর এই হ'লো ধারা,
প্রেমের গুণকে মাটিতে করে পরিণত
মানুষের মাংস কেউ খায় না।
এ পৃথিবীতে শুধু পড়ে থাকবে সুরভি-আনন্দ।

মরমী সাধকের আকুলতা, সন্ধানী হওয়ার প্রবণতা, মিলনে সান্ত্বনা লাভ, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগসাধনা, পূর্ণতায় পৌঁছানো এসব ভাবেরই ব্যাখ্যা আমরা দেখি শাহ্ লতীফের কবিতায়। প্রথম দিক্‌কার ভাবধারা তাঁর প্রেমের কাহিনীগুলোতে বিশেষ করে 'সসী পুন্নু'র প্রেম আখ্যানে বর্ণিত হয়েছে যাত্রাপথের বিপদ ও শঙ্কা-ভয়। এই যাত্রার তাৎপর্য দৈহিক নয়, এ-যাত্রা চলে আত্মার বিজন প্রান্তর পথে।

'সীসা'তে আমরা শুনি :

তুমি যত দূরের পথেই যাত্রা কর না কেন,
চেয়ে দেখো বন্ধু তোমার দুয়ারে।
ফিরে এসো। এবং নিজেকে জিজ্ঞাসা করো,
তোমার বন্ধু ঠিক তোমার মেজের উপরেই।
যে প্রিয়তমের জন্য তোমার এত দুঃখ-ভোগ,
সত্যই সে বাস করে তোমার ভিতরে।
ওয়ানকারে যাও না কেন ? এখানেই
তোমার প্রিয়তমকে সন্ধান ক'রে দেখো।
তোমার হৃদয় নিয়ে তোমার প্রিয়তমের কাছে যাও,
সসী, তোমার পায়ের পর্যটন থামাও।
বালুকাকে জিজ্ঞেস ক'রো না পথের কথা,
পূর্ণ হৃদয় নিয়ে যাত্রা করো সাক্ষাৎ লাভের জন্য।

হৃদয়ের জন্য হৃদয়ের আকুতি, মরমীবাদের মানবীয় ভাবপ্রবণ আবেদন, মানুষের এ আবেগ-প্রধান আকুতির প্রয়াস আমরা শাহ্ লতীফের কাব্যের সর্বত্র লক্ষ্য করি। 'সুর সমুনদি'তে যাযাবর আত্মার রূপক প্রকাশ দেখি। প্রিয়তম সেখানে নাবিক। নাবিক দূর সমুদ্রপথে দূরতম দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, পিছনে ফেলে যায় বিমর্ষ প্রেমিকাকে।

আমার বিগলিত আত্মা শূন্য-সুনিশ্চিত,
কারণ সমুদ্রের তীরে যখন আমি দাঁড়িয়েছিলাম,
প্রিয়তম নিজেই এসেছিল। নোঙরের দড়ি খুলে
তীর থেকে তরী দিল ভাসিয়ে।
নাবিকদের কোনো প্রয়োজনীয় গাথাই আমি
জানিনে,
তা হ'লে আমার দেহের শক্তি,
তরী যখন তীরে ছিল দাঁড়িয়ে,
তখন নোঙরের দড়ির সাথে তা থাকতো জড়িয়ে।
ঘাটের ধারে আমি নিজেই ছিলেম দাঁড়িয়ে।
তখন আমার প্রিয়তম কাছি দিল খুলে।
হয়তো আমার হৃদয়েই ছিল কোনো দুর্বলতা,

নয়তো আমার প্রিয়তম আমার কাছে এসে
দেখাতো বিস্ময়কর করুণা ও প্রেম।

'সুর সমুনদি'তে মিলনের আনন্দও পাই ঃ

এখন যদি তুমি এসো, প্রিয়তম,
আমার আত্মা প্রকাশ করবে পূর্ণ আনন্দ।
যদি হঠাৎ আমার প্রেমিক আসে, তবে
তাকে আলিঙ্গন করবো, সংলগ্ন হবো
আমার গৃহে,
আর বলবো তাকে আমার হৃদয়ের যত কথা।

আল্লাহ্‌র সাথে রহস্যময় মিলনের (একাত্মতা) কথা বারবার নানা-ভাবে বলা হয়েছে, এমন ভাষায় তার প্রকাশ যার তাৎপর্য সহজে বোঝা যায়। 'সুর সোরাথে' আমরা পাই ঃ

মানুষ আমরা, রহস্য আমি যে তার,
এইখানেই চাবি যে সকল রহস্যের।
এই বাক্যাংশ গায়ক গানে নিল তুলে,
এই গান সে গাইলো রাজার সম্মুখে,
যখন সে গাইলো কোথায় গেল দুই,
জোড় এক হয়ে একত্বে উঠলো গড়ে।

'রিসালো'র মরমীবাদ ইসলামের তওহীদ-ভাবে অনুরঞ্জিত। সকল প্রকার দ্বিত্ব দূর করাই তার সর্বপ্রকার লক্ষ্য, আল্লাহ্‌র মধ্যে প্রেমপূর্ণ পূর্ণতা লাভের চেয়েও তা গুরুত্বপূর্ণ। শাহ্ লতীফ নীচের কথায় তাঁর বিশ্বাস ঘোষণা করেছেন ঃ

আল্লাহ্ এক, তাঁর নেই কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী,
তাঁর মধ্যেই একত্ব
এবং সত্যের সত্তা। কিন্তু যে
মিথ্যা দ্বিত্বকে আলিঙ্গন করেছে,
সে নিশ্চয়ই হারিয়েছে জীবনের স্বাদ ও গন্ধ।

'সিন্ধী' কাব্যের আর একজন সাধক কবি সাচাল সারমস্ত। তাঁর একটি সুন্দর গানে মরমী হৃদয়ের সব সুরই ধ্বনিত হয়েছে ঃ

গভীর ভালোবাসার ধন প্রিয়তম আমার হৃদয়ে।
দেহের বাগানেই কোকিল পাখি,
প্রেমের সমুদ্র ভিতরেই।
তোমার অন্তরের গভীর দেশে সন্ধান করো প্রিয়তমের।
সেই বাগানে ফুল আছে এবং চাঁদও।
সাচাল বলে প্রিয়তমকে শেষে জানা হ'লো।
আমি তাঁকে আমার হৃদয়ে দেখেছি,
দীপ্তিতে, উজ্জ্বলতায় ভূষিত।
সে এসেছিল আমার চেতনার সীমার ভিতর।

রবীন্দ্রনাথের গানে এই ভাবেরই প্রতিচ্ছবি পাই :

প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
তাই হেরি তাই সকল খানে।
আছে সে নয়ন-তারায়,
আলোক-ধারায় তাই না হারায়,
ওগো তাই হেরি তাই যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যেদিক পানে।
আমি তার মুখের কথা
শুনবো বলে গেলেম কোথা।
শোনা হ'লো না হ'লো না,
শেষে ফিরে এসে নিজের দেশে
এই যে শুনি, শুনি তাহার বাণী
আপন গানে।

আমরাও শুনতে পারি, যদি এ মরমী দৃষ্টির অধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য, তীব্র আনন্দ ও বেদনা-বোধ এবং তপস্যা ও সাধনার আন্তরিকতা অর্থাৎ অন্তরঙ্গতা আমাদের থাকে।

ভাষার মতোই কবিতা প্রাচীন ও বিশ্বব্যাপ্ত। বিশ্ব অর্থে আমরা এখানে বুঝি আমাদের ভাব, চিন্তা ও বাইরের দৃশ্যময় বিচিত্র জগৎ। আদিম মানুষ কবিতার ব্যবহার করেছে, সভ্যতম জাতিও তার চর্চা ও ভাবানুশীলন করেছে। কবিতার আবেদন শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ছেলে-বুড়ো সকলের কাছেই আছে। কারণ, কবিতা আনন্দ দেয়। তাতে মানুষ

বস্তুজগতের চাপ থেকে ভারমুক্ত হয়। আর এ ভারমুক্তির মূলে আছে ভাবরস ও সুসমন্বিত ধ্বনিমাধুর্য। কবিতার রসোপলব্ধি সাধারণ আমোদ-প্রমোদের একটি বিশেষ অঙ্গ বা উপায় নয়, তা' হ'লো মানুষের সমগ্র সত্তার প্রাণকেন্দ্রিক অনুভূতি, পূর্ণাঙ্গ জীবনের পক্ষে তার মূল্যবোধ একান্ত অপরিহার্য। কবিতার রসাবেগে মানুষ হয় মুক্ত, লঘুপক্ষ ও নভোচারী। কবিতা আবেগ ও অনুভূতির বস্তু, তাই তার পূর্ণ সংজ্ঞা কখনো সম্ভবপর হয়নি। আংশিকভাবে বলতে গেলে কবিতা এমন একটি ভাষা বা প্রকাশ-প্রতীক, যা শব্দের আভিধানিক অর্থ ছাড়াও অর্থাৎ সাধারণ তথ্য পরিবেশক ভাষার চেয়ে আরো কিছু বেশী এবং গভীরতর ক'রে বলে। শাহ্ লতীফের একটি কবিতায় ঃ

> যখন আসবে তুমি, পৃথিবীরা শুধু গান গায়,
> পথে পথে তৃণদল পুষ্পগুচ্ছ চুমা খেয়ে যায়।
> যখন তোমাকে দেখি, শঙ্কা ভয়ে বিভ্রান্ত নিমিষে,
> বলো বন্ধু, তোমা ছাড়া আমার এ মন শান্ত হবে কিসে।

এখানে তথ্য নয়। শব্দ ও ভাবের, ধ্বনি ও অর্থের সমন্বয়ে কবি এখানে তাঁর অমূল্য অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। পূর্ণ ও গভীরভাবে এবং অধিকতর সচেতনতার সঙ্গে বাঁচবার জন্য ভেতরের তাগিদ থেকেই আমাদের অভিজ্ঞতার সৃষ্টি। কবির অভিজ্ঞতা স্বতন্ত্র। কবি দেখেন, ভাবেন, কল্পনা করেন, তার ফলে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার জন্ম। এ অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে কবি পছন্দ মতো রত্ন-মানিক বাছাই এবং রঙ ও রূপলোক সৃষ্টির দ্বারা তাঁর উপলব্ধি ও অনুভূতি প্রসারিত ও অন্যে সঞ্চারিত করেন। এক বিশেষ দিকে তাঁর এই অভিজ্ঞতা গঠিত, আকৃষ্ট ও কেন্দ্রীভূত হয় ব'লে পাঠকের কাছে তা' তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ, অধিকতর জীবন-চেতনা লাভ এবং পৃথিবীকে উপভোগ ও অনুভব করতে তা' তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। কাব্য ও সাহিত্য তাই আমাদের অভিজ্ঞতাকে গভীর ও তার পরিসরকে আরো ব্যাপক করে। বর্ষা আমাদের জীবনে একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা মাত্র, কিন্তু কবি-সাধক শাহ্ আবদুল লতীফ তার মাধ্যমে কেমন এর রস ও রূপলোক তুলেছেন দেখুন ঃ

> উত্তর আকাশে জমে কালো মেঘ চুলের মতন,
> বিদ্যুতের ক্ষণ-দীপ্তি নিয়ে আসে নীলের বর্ষণ

রক্তবাসে। যে আমার দূর-বন্ধু এসেছে নিকটে
খুব কাছে, এদিকের এই শূন্য বিলম্বিত তটে
সমুদ্রের। মন কাঁদে, প্রিয়তম, কাছে এসো আজ,
আরো কাছে, বৃষ্টি ঝরে, বড় একা, নেই কোন কাজ।
বসে আছি তাই বন্ধু বড় শান্ত একান্ত আশ্বাসে,
দেখি চেয়ে দলে দলে মৌসুমের মেঘ ভেসে আসে।

রোমান্সের মতো কবিতা তাই অসংজ্ঞেয় এবং অনির্বচনীয় অর্থে পূর্ণ। এ বিপরীত দৃষ্টি দিয়ে আমরা কবিতার বিচার করতে পারি। প্রথমটি তার প্রকাশ্য বা রূপকল্প, ভাষার বিশেষ ধরনের প্রকাশ বা আঙ্গিকতা। দ্বিতীয়টি কবিতার গোপন বা গূঢ় তত্ত্বরূপ। ভাব, চিন্তা এবং বিশেষ অর্থের বাহন হিসেবেই এদিক থেকে কবিতার সার্থকতা ও মহত্ত্বের পরিচয় মেলে। কবিতার সৌন্দর্য-তত্ত্ব ও আনন্দ দানের ক্ষমতাও এ পর্যায়ে পড়ে। সৌন্দর্য-জ্ঞানের মূলে আছে মননশক্তি, বিচার-বুদ্ধি এবং আনন্দ-বোধ। মননশীলতা থেকে আসে সৌন্দর্য বিচার এবং ভাবপ্রবণতা থেকে আসে আনন্দানুভূতি। তাই কবিতার রসানুশীলনে ও রস গ্রহণে মনীষার দীপ্তি ও বিচার-শক্তি এবং সুখানুভূতির অভিজ্ঞতা এসে যায়। অর্থাৎ কবির কাব্য-সৃষ্টির মূলে এবং কিছুটা কবিতার রসোপলব্ধির ক্ষেত্রেও বিশেষ-ভাবে কাজ করে মনন-শক্তি ও হৃদয়াবেগের স্বচ্ছতা। তাই কবি ও কাব্য-রসিক প্রায় কাছাকাছি এসে যায়। একথা অবশ্য প্রসঙ্গত বলছি। এদিক থেকে কবিতা বিচারে আমরা তিনটি নির্দেশ খুঁজে পাই। প্রথম, বাইরের প্রকাশভঙ্গি, শব্দ, ভাষা, ধ্বনি-তরঙ্গ, বিষয়বস্তু ও সঙ্গীত-প্রাণতা এবং আঙ্গিকতার সযত্ন পরীক্ষা। দ্বিতীয়, বাইরের প্রকাশ-রূপে অর্থাৎ রূপকল্পে কবিতার অর্থ ও তার তাৎপর্য সম্পর্কে একটি বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। তৃতীয়, মনের ওপর কবিতার রূপরসের সৃষ্টি ও হৃদয়াবেগের প্রভাব নিরীক্ষা। তৃতীয় পন্থা সম্পূর্ণভাবে মনস্তাত্ত্বিক, দ্বিতীয়টি বিচার-বুদ্ধি-নির্ভর এবং প্রথম পন্থা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-সম্ভব। এ উপায় তিনটির ওপর নির্ভর ক'রে নির্ভয়ে বলা যায়, পূর্ণভাবে যে কোন একটি কবিতার রস গ্রহণ করতে বা বুঝতে হলে তার ভাষা ও ছন্দের রচনা ও নির্মিতির পরীক্ষা, যে ভাব ও ভাবনা তা বহন করে তার অর্থ গ্রহণ এবং যে আনন্দবেগ সেই কবিতা অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চায় তা' অনুভব করা আবশ্যক। তাই ভাল এবং মহৎ কবিতার লক্ষণ হলো স্বচ্ছতা, ভাবধারার মধ্যে সুরুচি ও

চিৎপ্রকর্ষের অকুণ্ঠ প্রকাশ এবং সৌন্দর্য উপভোগের শ্রেষ্ঠতা। কবিতার মূল্যবোধ ও নিরূপণের এ তিনটি মান মানসিক তৎপরতার ওপর একান্ত নির্ভরশীল এবং এ মান অনুসারে কোন কবিতার অর্থই দুরূহ বা রহস্যময় হতে পারে না। যথার্থ তাৎপর্যের ব্যাখ্যা যত কঠিন হোক না কেন, তার ভাব-গঠন ও আনন্দ ব্যঞ্জনা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠবেই।

গানের সম্মোহন আছে, কবিতারও আছে। গানে সুরের কারুকাজ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কথা, আর কবিতার ভাবাবেগ ও শব্দ মাধুর্য তার জন্যে দায়ী। কিন্তু এদিক থেকে কবিতার আবেদন ক্ষণস্থায়ী। ভাবের বাষ্প মিলিয়ে গেলে পাঠক বা শ্রোতার চিন্তাশীল মন সক্রিয় হয়ে ওঠে। কারণ কবিতার ভাষায় ছলনা আছে, সহজে তা' ধরা দিতে বা স্পষ্ট হতে চায় না এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই কবিতা দ্ব্যর্থবোধক, ভাবের সঙ্গে শব্দের সাদৃশ্য থাকলেও রূপক প্রতীক-রূপ ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার সূক্ষ্ম ব্যবহারের জন্যে তার অর্থ হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ ভিন্ন অর্থ আবিষ্কারের জন্য মননশীলতার দরকার, আবেগ সেখানে অসহায়। শাহ্ আবদুল লতীফের কবিতার একটি ভাবানুবাদ ঃ

সমুদ্রের ডাক শুনি, সে ডাক অশান্ত করে,
আমার নাবিক
উন্মনা হয়েছে আহা চলে যাবে জানি আর
আসবে না ঠিক।
আমার জীবনে সেই নাবিকের মধু-স্মৃতি
যেন থেকে যায়
ফুলের গন্ধের মতো। সে কী তীব্র তিক্ত বেদনায়
ছিঁড়েছে বন্ধন, আমি একা পড়ে আছি বহুদূর
সমুদ্র-মরাল আর স্বপ্নসাথী মনে ভাবি এখন মধুর।
প্রিয়তম শোনো শোনো
তোমার সমুদ্র-তরী একটু থামাও,
দ্বিধায় রেখো না আর, আমাকেও সাথে নিয়ে যাও।
আসবে কি ? এসো বন্ধু, নির্জন মুহূর্ত বুঝি,
আর রাত নাই।
তরঙ্গের মতো আমি, তুমি এলে
বলবো যে মনের কথাই।

শাহ্ লতীফ এই কবিতাটিতে এমন উন্নততর ভাষা ব্যবহার করেছেন, সেই ভাষায় এমন এক দৃষ্টিভঙ্গির ছবি এঁকেছেন, যার সঙ্গে বাস্তবের যোগ আছে এবং গভীর আবেগ-বস্তুর ভিতর দিয়ে যুক্তির দ্বারা তার অর্থ বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়।

কাব্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে চিন্তা, ভাব ও ভাবনা থেকে প্রকাশভঙ্গিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখতে হবে, কারণ বহু ভিন্নমুখী ধারা ও উৎস একটি পূর্ণ কবিতার রস ও ভাবরূপ গড়ে তোলে, এই বিভিন্ন ধারার একটির সঙ্গে অন্যটিকে যেন জড়িয়ে না ফেলা হয়। শাহ্ লতীফের মতো সাধক-কবির মরমী ভাবপূর্ণ কবিতার বেলায় এ কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। কারণ, এ ধরনের কবিতাগুলো রূপক-প্রতীক ও গূঢ় অর্থে পূর্ণ এবং তাদের ভাষাও যেন এক সর্বাতীত গুণে সুষমান্বিত হয়ে ওঠে।

নিম্ন সিন্ধুতে তাসাউফ

রস, রসাবেগ ও রসবোধ।

রসের নিবিড়তা পরিমিতি লাভ করে কাব্যে, সাহিত্যে। নদী তটের বন্ধন স্বীকার করে, তাই সে নদী; নয় তো সে বন্যা।

সাধক-চিত্তের যে বেদনা উজ্জ্বল মধুর রসে আর্দ্র ও সিক্ত, তা-ই প্রেম। প্রেমের সাধনা সাধকের, দুঃখ-জয়ী সাধনা তাঁর, ত্যাগের মহত্তর আনন্দের তপস্যা তাঁর।

প্রেমের এই উজ্জ্বল মধুর রসের জোয়ার এসেছে সূফীদের চিত্ত-গহনে, গভীরে, অন্তরতম দেশে। বিপুল রসাবেগে তার সকল সত্তা অধীর হয়েছে- উচ্ছ্বসিত হয়েছে। কূল-প্লাবনী রসস্রোতে বাঁধ ভাঙতে বসেছে। কিন্তু জীবন্ত তওহীদের বন্ধন-শৃংখলায় তা সংহত হয়েছে। সূফীদের এই প্রেম-সংযমই তাসাউফ। তাসাউফ এক অর্থে কাব্যও; কারণ কাব্য রসের সংহত প্রকাশ। অগ্নির অসংযত প্রকাশ দাবাগ্নির সৃষ্টি করে, প্রদীপের স্থির উজ্জ্বল শিখাটি সৃষ্টি করে সুষমান্বিত বিন্যাসের আবেগ ও পরিবেশ। তাসা-উফ তাই কাব্য, তাতে বেদনা আছে, দাহ আছে, কিন্তু সব কিছুর অতীত হ'য়ে তার মধ্যে রূপ লাভ করে একটি প্রেম-প্রসন্ন রসপ্রকাশ। মূলে তীব্র বেদনাবোধ, কিন্তু সাধকের বিচ্ছিন্ন আত্মাকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে তাঁর সর্বত্র প্রসারিত প্রসন্নতা।

সেই প্রসন্নতার স্বাদ পাই তাসাউফে। আমরা অন্য-চিন্তা ও অন্ন-চিন্তায় ব্যস্ত, চিত্ত আমাদের বিক্ষিপ্ত, তুচ্ছ সুখ-দুঃখ ও সাধারণ স্বার্থপরতায় আমাদের তৃপ্তি ও আত্মনির্ণয়। তাসাউফের স্বাদ যদি একটু পাই অন্যমনস্ক ও অনন্য মনে, তবে মুহূর্তের জন্য আমরা এসে পড়ি অনুভবের অসীমায়, প্রমিতি পার হয়ে অপরিমিতিতে। তখন তনু-মন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে দীপ্তি ও দ্যুতিতে, কান্তি ও প্রীতিতে, লালিত্য ও লাবণ্যে।

পরিচারিকা বললে, 'রাবি'আ, দেখুন, বাইরে বসন্তের কি ঐশ্বর্য ও সমারোহ।' রাবি'আ বললেন, 'আমার ভিতরে চেয়ে দেখো, আহ্, সেখানে কি আনন্দ ও আবেগের দিগন্ত প্লাবন!'

এই প্লাবন একদিন এসেছিল নিম্ন সিন্ধুতে। সিন্ধু নদের পানি সৃষ্টি করে শ্যামলিমা, পুষ্ট দেহ; আর সিন্ধুর তাসাউফের রস-বর্ষণ বেদনার্ত তপ্ত চিত্তের তৃষ্ণা দূর করে, আর আত্মার জন্য বহন করে পরম সান্ত্বনা ও সম্পদ।

নিম্ন সিন্ধুতে তাসাউফের বিকাশ ও বিস্তারের পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে 'তুহ্‌ফাতুল কিরাম' গ্রন্থে। তাসাউফ এমন একটি তত্ত্বলোক বা প্রদেশ, যেখানে কাব্য, ধর্ম ও দর্শন একই ক্ষেত্রে এসে মিলিত হয়। মানব মনের গভীরতম ও সূক্ষ্মতম চিন্তাধারার একত্র সমাবেশ ও সমন্বয় অতি সহজেই সম্ভবপর হয়েছে তাসাউফে, সব কিছু যেন সেখানে এক বিশ্ব-বোধে সম্মিলিত হ'য়েছে। সূফীবাদ তাই মানব-চিত্তের আনন্দ-উৎসরূপে বিরাজ করছে এবং করবেও। সূফীবাদের এ গুরুত্ব ও ক্রমবিকাশের ধারা আমরা লক্ষ্য করি 'তুহ্‌ফাতুল কিরাম'-এ। অন্ত অনন্তের সঙ্গ কামনা করে। মধ্যযুগের দাদুজী (দাউদজী, আজমীরের নিকটবর্তী নারানৌর সাধক, সম্রাট আকবরের সমসাময়িক) বলেন ঃ

> বাস কহে হাম ফুল কো পাঁউ ফুল কহে হাম বাস,
> ভাস কহে হাম সতকো পাউঁ সত কহে হাম ভাস।
> রূপ কহে হাম ভাও (ভাব) কো পাউঁ
> ভাও কহে হাম রূপ।
> আপসমে দোউ পূজন মাগৌ পূজা অগাধ অনূপ।*

প্রেম তো এক তরফা হয় না। আমাদের বাঙলার বাউল বলেছেন ঃ

> নিত্য দ্বৈতে নিত্য ঐক্য, প্রেম তার নাম।

এই ভাব-রসের সঞ্চার নিম্ন সিন্ধুতে আমরা প্রথম দেখি সইয়িদ উসমান শাহ্ মারওয়ানদির সাধক জীবনে। সিন্ধুর তাসাউফের ইতিহাসে তাঁকেই আমরা প্রথম পাই। সাধনার পটভূমি হয়তো অখ্যাত সাধকদের দ্বারা রচিত হয়েছিল; তাঁদের কথা ইতিহাসে না থাকলেও আমরা অনুমান করতে পারি এবং তা-ই অত্যন্ত স্বাভাবিক।

---

* রবীন্দ্রনাথের 'ধুপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে'—গানটিতে সীমা-অসীমের এই মিলন-তত্ত্বের দ্বন্দ্ব-লীলা বিদ্যমান।

উসমান শাহ্ 'লাল শাহ্বায' নামে পরিচিত হন। সেহ্ওয়ানে তাঁর লোক-প্রিয় সমাধি বিদ্যমান। তাসাউফ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তিনি বহু পুস্তক রচনা করেন। সিন্ধুর সূফী ইতিহাসে তিনি বিখ্যাত কলান্দার রূপে পরিচিত। জীবিতকালে এবং মৃত্যুর পরও তিনি তাঁর পবিত্রতার জন্য অশেষ খ্যাতির অধিকারী হন। তাঁর সত্তত্ব-প্রাপ্তির দিনে অতীতে এবং আজও বিচিত্র দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। ধর্ম এবং কুসংস্কারের সংমিশ্রণ, হিন্দু এবং মুসলমানদের সম্মিলিত ভক্তমনের উচ্ছ্বাস সিহ্ওয়ানের লাল শাহ্বাযের স্মৃতিকে জাগ্রত করে। ভক্ত সাধকের স্মরণে মানুষের মনে বিচিত্র আবেগের সঞ্চার হয়। আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই দৃশ্য, জীবন্ত ও স্বতঃউৎসারিত আনন্দধারায় যা' পুষ্ট।

লাল শাহ্বায কলান্দার মারওয়ানদি সিন্ধুর প্রথম সূফী ভক্ত-সাধক। সিহ্ওয়ানের সমাধি, চারপাশে পড়েছে অসংখ্য তাঁবু, লাল, নীল, সবুজ —রুক্ষ প্রান্তরে যেন বিচিত্র রঙের ফুল ফুটে আছে অসংখ্য পাপড়ি মেলে, মধ্যে শ্বেত প্রস্তরের শুভ্র পরাগদল। পরাগ রেণুই বটে, ঐ সমাধি সৌরভে আকৃষ্ট হয়েই বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতির মানুষের বিচ্ছিন্ন মনের দলগুলো একত্রে সমাবিষ্ট হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান সকলে মুক্তভাবে মিলছে, গান করছে সূফী-সঙ্গীত। সে সঙ্গীতের ভাবরসে হৃদয় গ'লে যায়। মানুষ আত্মনিমজ্জিত হয়ে ভাবে প্রিয়তমের কথা। যার জন্য লাল শাহ্বাযের মতো কত কলানদার, কত সূফী-দরবেশ ও ব্যাকুল মানুষের মন উতলা হয়েছে, কেঁদেছে, আর ভেবেছে, আমার ইচ্ছা তোমার ইচ্ছার সঙ্গে মিশে যাক। এ অন্তের ইচ্ছার সঙ্গে অনন্তের ইচ্ছার সংযোগই তো প্রেম।

ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে লাল শাহ্বাযের আগমন ও সাধনকাল, অষ্টাদশ শতকে শাহ্ লতীফ ও সাচাল সারমস্তের। কবি হিসেবে সাচালের স্থান সর্বোচ্চে। অবশ্য তিনি সিন্ধুর সূফী-শ্রেষ্ঠ শাহ্ লতীফের আবিষ্কার।

নিম্ন-সিন্ধুর জমালী ও জলালী ফকীরদের কণ্ঠেও তাসাউফের সুর শোনা যায়। তসবীহ্ 'আসা' ও 'গাবরী' (ভিক্ষার ঝুলি) হাতে জলালী ফকীরগণ শহর-গ্রাম-প্রান্তর পরিক্রমণ ক'রে তাসাউফের সুর ছড়িয়ে বেড়াতো (আমাদের দেশের আউল-বাউল ফকীরদের মতো)। জলালীদের মধ্যে চার তরীকার (কাদিরী, নকশবন্দী, সুহ্রাওয়ার্দী ও চিশতী) ফকীর থাকলেও তাদের মধ্যে ক্রমশ নানা অনাচার ও অন্ধবিশ্বাস প্রবেশ করে। যোগী, বৈরাগী আদেইসী এবং অন্যান্য ধর্মের ফকীরদের নানা বিচিত্র ও

ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপ এবং দুষ্ক্রিয়া তাদের জীবনে সংক্রমিত হয়। শাহ্ লতীফ এ সকল ফকীরের কণ্ঠ পরিবেশিত ভাবরসের মূল রস-প্রেরণা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করলেও তার সংস্কারমুক্ত তওহীদবাদী মন তাদের ভ্রান্ত ও নীতিবিরুদ্ধ প্রথা ও ক্রিয়াকর্মের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠেন। একটি কবিতায় তিনি বলেন ঃ

কিন্তু সত্যকার ইবাদত সেই একমাত্র প্রভুর।
পীর এবং নবীদের নয়। তা'রা পাপ করে
পীর পূজায় যারা রত, তার চেয়েও ঘৃণ্য
যারা মূর্তি-পূজারী, অসহায় ভাগ্যহীন তারা,
পথভ্রান্ত হয়ে যারা অসত্যকে ধরেছে আঁকড়ে।
বিশ্বাসী, আত্মাকে পূজা করো না, হৃদয়কে শুদ্ধ করো।
যারা বিশ্বাস করে না, অপমানে তাদের মুখ
কালো হোক।

প্রেমের পথে, ভক্তির যোগে সম্মোহন আছে। এই সম্মোহিত ও আচ্ছন্ন অবস্থায় অনেক সময় অতি স্বাভাবিকভাবেই দুর্নীতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয়। তওহীদবাদী সূফীদের পক্ষে সম্মোহন ও আচ্ছন্নতার (অসংযমও বটে) মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করা অত্যন্ত সহজ। সহজ বলেই সকল প্রকার অন্ধকার স্পর্শ থেকে সিন্ধুর তাসাউফ নির্মল ভাব প্রবাহের ধারায় পুষ্ট ও প্রবাহিত হয়ে এসেছে। তাই তাসাউফের মূলে প্রথমেই দেখি পবিত্র কুরআনের কয়েকটি বিশেষ আয়াতের প্রভাব আল্লাহ্‌র মুখ (ওয়াযহ-মুখ, আল্লাহ্‌র মহিমা, অতুলনীয় ঐশ্বর্য, স্বয়ংপূর্ণ ও স্বয়ংপ্রভ অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্ব অর্থে পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত), তার দর্শন (লিকা'আ রব্বিহি) লাভ ও অনুরূপ ভাব-জ্ঞাপক আয়াতে আল্লাহ্‌র মূল সত্তা ও সারাংশের পরিচয় দিলেও অতিরিক্ত একটি রহস্যময় অর্থ প্রকাশ করে। এ অর্থের মধ্যে সূফী-সাধকগণ এক গভীর আধ্যাত্মিক আত্ম-চেতনার সন্ধান লাভ করেছেন। আল্লাহ্‌র সঙ্গে প্রত্যক্ষ মিলন ও তার প্রসন্নতা লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এ চেতনা বিপুলভাবে স্ফূর্তি লাভ করেছে। এ মিলন ও দর্শন অনাস্বাদিত ভাবরসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, নির্ধারিত ও নিশ্চিত হয়। তাসাউফের মূলে এ ভাবরস বা আবেগমাধুর্য বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছে এবং এ কারণেই শুধু সিন্ধু নয়, সর্বত্রই ইসলামের তাসাউফ

বা ভক্তিবাদ একটি বিশিষ্ট এবং বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশে জীবন্ত ও গৌরবান্বিত হয়েছে। মহিমময়ও বটে, কারণ সূফীদের সমস্ত আবেগ ও উচ্ছ্বাস আশ্চর্য-ভাবে সংযমিত হয়ে যাঁর সবচেয়ে সুন্দর নাম (লাহুল আসমা'উল হুসনা) অর্থাৎ পরম সুন্দর সুন্দরতম যিনি তাঁরই উদ্দেশ্যে প্রসারিত ও প্রধাবিত হয়েছে।

তাসাউফের দ্বিতীয় ভাব-প্রেরণা উৎসারিত হয়েছে যিকির, আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে। পবিত্র কুরআনে যিকির-এর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে (আলা-বি-যিকরিল্লাহ্ ততমায়িন্নাল কুলূব—আল্লাহ্‌র স্মরণ ছাড়া হৃদয় আর কিসে শান্তি লাভ করে।) এবং এই স্মরণের মাধুর্যে সূফীর হৃদয়ের শতদল পরিপূর্ণ হয়েছে। স্মরণের অমৃত-সুধা মধুর মতো তার সমস্ত সত্তায় ক্ষরিত ও সংরক্ষিত হ'য়ে আছে। এ মধুর মদিরায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সাধক প্রিয়তমের নির্মম আঘাতের মুখে শির পেতে দিয়েছে, পার্থিব সকল ঐশ্বর্য ও ভোগ-বিলাসকে তুচ্ছ ভেবে মাশুকের সন্ধানে জীবনের সমস্ত শক্তি ও সাধনা নিয়োগ করেছে।

সুখে তুমি, দুঃখে তুমি, আনন্দে তুমি, বিপদে তুমি, স্বপ্নে তুমি, জাগরণে তুমি, আমার প্রতি নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে তুমি। এই তো স্মরণ, এই তো যিকির। এই যিকিরকে অবলম্বন করেই বিশ্বাস-ব্যাকুলতা, বিবেক বৈরাগ্য, সকল বিক্ষেপের মধ্যে পরম নির্লিপ্ত। এই যিকিরের সঙ্গে শোক্‌র, স্মরণের সঙ্গে প্রশংসা। হযরত বড় পীর সাহেবকে সংবাদ দেওয়া হলো, আপনার পণ্যবাহী সব জাহাজ ডুবে গেছে। শুনে তিনি বললেন, আল্‌হাম্‌দু-লিল্লাহ্। কিছুদিন পর খবর এলো, জাহাজগুলো রক্ষা পেয়েছে। আল্ হামদু লিল্লাহ্। সকল অবস্থায় তাঁর নাম স্মরণ, প্রশংসা গান। তাই সাধকদের সর্বদা আকুল প্রার্থনা, আমাকে তুমিময় করো, তোমার স্মরণে আমার ছোট-আমি নিমজ্জিত হোক্ তোমার রঙে আমাকে রাঙিয়ে দাও। সিবগাতুল্লাহ্—আল্লাহ্‌রও রঙে আমাকে অভিষিক্ত ক'রো। তোমার স্মরণের আনন্দঘন ব্যঞ্জনায় আমি ডুবে যাই, তুমি আমি একীভূত হই।

সিন্ধুর সূফীদের মধ্যে এই যিকির আত্মসম্মোহনের বিস্মৃতি বহন এবং পরম আনন্দ-মুহূর্ত ও ভাব-সমাধির সৃষ্টি করেছে। সূফীদের এই ভাবপ্রবণ ও উদ্দীপন সাধারণ মানুষকে গভীরভাবে আকৃষ্ট এবং তাঁদের সন্তত্ব সম্বন্ধে আস্থাবান ক'রে তুলেছে।

সর্বশেষে তাসাউফের শক্তি ও লালিত্য বৃদ্ধি পেয়েছে সাধকদের সঙ্গ লাভে, ওয়ালীউল্লাহ্দের ভাবানুকূল্যে, যাদের কোনো ভয় নেই, দুঃখের কারণ নেই (লা খওফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহ্যানুন), যারা সর্ব ভয়, দুঃখ ও সাধারণ সুখবোধের ঊর্ধ্বে অর্থাৎ চিত্ত-প্রশান্তি যাঁদের আছে তাঁরাই ওয়ালীউল্লাহ্, আল্লাহ্র বন্ধু। এ বন্ধুদের মধ্যে সিন্ধুতে আল্-খাদির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আল্-খাদির অমরত্বের নীরধারা পান করেছিলেন। সিন্ধে আল্-খাদির খাজা খিযির নামে অলৌকিক খ্যাতি ও শক্তির অধিকারী হয়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছেন। বালুচী কবিতায় খাজা সিন্ধুনদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন, সবুজ পরিচ্ছেদে ভূষিত বৃদ্ধ ব্যক্তি-রূপে কল্পিত ও প্রকাশিত হয়েছেন। একটি বালুচী গান:

> মাজারিগণ ঘাট থেকে নৌকা দিল খুলে,
> এবং ভাসিয়ে দিল খাজার তরঙ্গমালায়।
> পালকহীন তীর এবং চৌপালকের তীরগুলি
> সব একত্রে মিশে। খাজা নিজেও
> মনে রাখবেন এই যুদ্ধের কথা।

সিন্ধুর দরিয়াপন্থিগণ নদীর পবিত্রতায় বিশ্বাসী। সিন্ধী সঙ্গীত ও সূফীবাদের মধ্যে খাজা খিযিরের একটি নিজস্ব স্থান আছে। তিনি এক-জন যিন্দা পীর। জীবনের সঞ্জীবনী সুধা তিনি পান করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকবেন। সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের অনেক গাথা ও সঙ্গীতে সিন্ধু নদকে সরাসরি খাজা খিযির বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

নিম্ন-সিন্ধুর দরবেশদের সাধক-জীবন কেন্দ্র ক'রে যে তাসা-উফ রূপ লাভ করেছে, তাঁদের মৃত্যুর পরও তা বিস্মৃত ও বিগত হয় নাই। কারণ ভক্ত মুসলমানদের বিশ্বাস: সাধকদের মৃত্যু নাই, তাঁরা শুধু ঘুমিয়ে পড়েন, সমাধির ভিতরেই তাঁরা বাস করেন, যা তাঁরা অনায়াসে ত্যাগ করতে পারেন এবং সেখান থেকে অন্যত্র যাত্রাও ক'রে থাকেন। (আমাদের দেশে শাহ্ মখদুমের সমাধি বিহার শরীফ, রাজশাহী এবং আরও কয়েকটি স্থানে বিদ্যমান। অনেক সাধকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেও এই বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়)। তাই আজও সিন্ধুর সাধক ও সিদ্ধ কামিলদের সমাধিস্থান কেন্দ্র ক'রে সূফী সঙ্গীত গীত ও প্রচারিত

হয়। এ দেশের মতো সেদেশেও একতারা আছে, লাউয়ের খোলে তৈরী একই ধরনের একতারায় মনের একটি চিরন্তন সুর ধ্বনিত হয়। একটি মাত্র তার এক পরমতম জনের উদ্দেশ্যে যে রোদন-ভরা সঙ্গীতের ঝংকার ওঠে তা আজ পর্যন্ত সিন্ধুর বাতাসকে অনুরণিত ও অনুগন্ধিত ক'রে রেখেছে। সে সুরের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছে হালে। সাধকভক্তের মনের তার তো এক, তাই সুরের লহরী বিন্যাসেও নিশ্চয় ঐক্য আছে।

তাসাউফের এই শরাব সিন্ধুর সূফী-শ্রেষ্ঠ শাহ্ লতীফের হাতে আরও সুসংস্কৃত ও সুগন্ধিত হয়েছে। অপূর্ব সাধনা ও মনীষার দ্বারা তিনি তাসাউফের এক পরিমার্জিত রূপ উদ্ঘাটন ও রস পরিবেশন করে-ছেন। সে রূপ ও রস বিস্ময়কর রুচি ও পরিচ্ছন্নতার পরিচয় দান ক'রে সর্বকালের ও সর্বজনের আনন্দ অমৃত হয়ে বিরাজ করছে। তাঁর পরিবেশিত রস দ্বিধাহীন চিত্তে ও নিঃসংশয়ে সকলে গ্রহণ করতে পারেন। প্রিয়তমকে আল্লাহ্‌কে তিনি কত সুন্দর নামে ডেকেছেন; নাম ছোট, কিন্তু সে নাম-ডাকের আর্তি দিগন্ত-বিস্তৃত। তাসাউফের মূলে আছে 'আমি' এবং 'তুমি'। যতক্ষণ 'আমি' ততক্ষণ গদ্য, যেই 'তুমি' এলো, অমনি কবিতা, সুর ও ছন্দের সৃষ্টি হ'লো। এই 'আমি'তে 'তুমি'তে মিলে কি অপূর্ব এক প্রাণচাঞ্চল্য ও আনন্দ-আবেদন উৎসারিত হ'লো দেহে-মনে, ছন্দে-গানে। শাহ লতীফ সুন্দরতম অসংখ্য নামের অধিকারীর উদ্দেশে বলেছেন:

হে মধুর এক, চিরকাল ধরে তুমি থাকো তুমি থাকো—
এই নামে যত অকথ্য কথা কান যেন শোনে নাকো।
আরো কাছে এসো, একত্র করো হৃদয় চক্ষুদ্বয়।
শুধু যেন তারা তোমাকে এবং তোমার কথাই কয়।

ভূমিকায় বলতে পারি সূফীবাদ ও রোমান্তিক মতবাদ (ভাব ও বাঙলা রূপরেখার দিক থেকে শুধু রোমান্তিক বলাই শ্রেয় মনে হয়) এই দু'য়ের মধ্যে বেশ কিছুটা সাদৃশ্য ও সগোত্রতা আছে। বিশুদ্ধ রোমান্তিকতা হলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও পরিদৃশ্যমান বস্তুজগতের অন্তরালে যে এক অসীম রহস্য ও আনন্দময় জগৎ বিদ্যমান, কবি দিব্যদৃষ্টি বা কল্পনা-প্রতিভার দ্বারা সেই অতীত জগৎ বা আনন্দলোককে প্রত্যক্ষ এবং তার অলৌকিক বিস্ময় বিচিত্র চিত্র ও রূপকল্পের রসঘন প্রকাশে প্রসারিত করেন অর্থাৎ রোমান্তিক কবি পরিচ্ছন্ন ও পরিদৃশ্যমান বস্তু-চেতনার সৌন্দর্যে সুদূরের ব্যঞ্জনা যোগ ক'রে ইন্দ্রিয়জ চেতনাকে আরো একটি নতুন রূপকে ও লীলায় প্রতিষ্ঠিত করেন। বিশ্বের বৈচিত্র্যের মধ্যে দূরতমকে অনুভব করবার আনন্দ এবং আপন অন্তরতম সত্তার উপলব্ধির নামই লীলা বা বোধ অর্থাৎ পরম জ্ঞান ও আনন্দের অনুভূতি। রোমান্তিক কবির দৃষ্টি রস-দিগন্তে প্রসারিত বলে মানুষের পূর্ণতা, মূলগত সততা ও প্রগতির অনন্ত সম্ভাবনায় তিনি বিশেষভাবে বিশ্বাসী। রোমান্তিকতা ব্যক্তিমানুষকে মুক্তি দিয়ে তার সমগ্র অবিকৃত ব্যক্তিত্ব (যা বস্তুর মধ্যে থেকেও বস্তু-অনুবিদ্ধ নয়, বরং দৃশ্য ও অদৃশ্য সব কিছু সুন্দর, অন্ধকার, অকথ্য, গোপন ও অনির্বচনীয় যার আনন্দ-চেতনায় বিধৃত হয়ে আছে) স্বীকার করে। তাই এ রোমান্তিকতা মানুষের একটা স্থায়ী, মৌলিক ও অবিচ্ছেদ্য চিত্তবৃত্তি, একটি বিশেষ ঐতিহাসিক আন্দোলন বা অনুকৃতিমাত্র নয়।

সূফীবাদ সম্বন্ধে এ একই কথা বলা চলে। শুধু রোমান্তিকতার রস বিশুদ্ধ আনন্দের দ্বারা পরিশুদ্ধ, আর সূফীবাদের রস বা অনুভূতি আধ্যাত্মিকতার উপলব্ধি ও অহেতুক প্রেমের দ্বারা পরিস্নাত। ঠিক রোমান্তিকতার মতোই মানব-মনের একটা চিরন্তন আবেগ, যার অনুবৃত্তি যুগে যুগে নানা রঙে, রসে ও রূপে চলে এসেছে এবং আসবেও। সাহিত্যের

মূল রস যদি আনন্দের হয় (দুঃখ এ আনন্দ-চেতনার অন্তর্ভূত), তবে সূফী তথা অধ্যাত্মবাদের মূলে আছে এ আনন্দেরই অন্য রসরূপ, প্রেম। আর নিত্য প্রবহমান জীবন ও জগতের লীলাস্রোতে অমরতা তথা অজানার সন্ধান লাভের অত্যুগ্র কামনা থেকে উৎসারিত ব'লে এ প্রেম বা আনন্দরস অহেতুক এবং আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, এ প্রেম ও আনন্দরস সকল কালের কবি-সাহিত্যিক ও সাধকদের প্রধান দুর্মর লক্ষ্য। ভাব-জীবন ও বস্তুচেতনার এ সমন্বিত রূপ ও রসের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি, সকল সাহিত্যই রোমান্তিক এবং প্রায় সকল সাধনাই প্রেমধর্মী। সেই সর্বকালের সাধক-মানসের একটি বিশেষ ভাবধারার পরিচয় আমরা পাবো সিন্ধুর সাধক কবি সাচালের জীবনে।

সাচাল বলেছেন—'তুমি আর আমি। তুমি সকল শক্তি ও সৌন্দর্যের মূলে, তুমি চাও বহুর মধ্যে তোমার আনন্দ ও বহু বিচিত্র সৃষ্টি কামনাকে ক্রমাগত প্রসারিত করতে, বৈচিত্র্যের মধ্যে বিশ্বের রূপ-সুষমাকে অকৃপণ ও অফুরন্ত ক'রে তুলতে, আমি চাই এসব বহুর বিস্ময়ে আবেগ-দীপ্ত হয়ে সব কিছু অতিক্রম ক'রে 'তুমি এককে স্পর্শ করতে।' এই বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী লীলার দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বিরহ-মিলন ও রাগবিরাগে রূপ লাভ করেছে সূফীর জগৎ, সূফী-সাধকদের সাধনরঙ্গ ও অন্তরঙ্গতা। কার সঙ্গে এ অন্তরঙ্গতা ? অন্তর দিয়ে কোন্ আনন্দ-সুন্দরকে গভীর অতলে লাভ করা ও ভালবাসা এবং এক অলক্ষ্য পরম আবেগ-মুহূর্তে নিমজ্জিত হওয়া? শুধুমাত্র 'সে'র সঙ্গে, কুরআন শরীফের অসর্বনামীর 'হুয়া'র সাথে।

সূফীদের এ রাগ-রঙ্গ ও অন্তরঙ্গতা তিনটি পথে আবর্তিত হয়েছে। প্রথম—যোগ স্থাপন, দ্বিতীয়—কথোপকথন, তৃতীয়—আত্মচেতনা ও সোজা কথায় চেনা, জানা ও ভালবাসা। বাইরের বিশ্বের সঙ্গে যোগ স্থাপন ক'রে পরিবেশের রূপ-রস-গন্ধ-গানে মুগ্ধ হয়ে অপরিসীম বিস্ময়ের আনন্দে তার সঙ্গে কথা বলা। এ কথা বলার অন্ত নেই। সাচালের উপদেশ, 'মন যখন নানা কারণে ভারাক্রান্ত হবে, প্রকৃতির নির্জনে একা চুপ ক'রে বসে থাকো, শান্তি ও সান্ত্বনা পাবে, আর ভেতরের মন তখন পরম জনের সঙ্গে কত অফুরন্ত কথা বলবে, তার সঙ্গে এমনি নীরবে কথা বলার আর অন্ত খুঁজে পাবে না।' সত্যি তাই। তবে বস্তু-সভ্যতার চাপে পড়ে সে নিস্তব্ধতার আনন্দ ও অন্তর-প্রশান্তি থেকে আমরা বঞ্চিত হতে চলেছি, সে চিন্তা ও ধ্যানের অবসর এখন আর আমাদের জীবনে নেই, আছে শুধু ব্যর্থতা ও

নৈরাশ্যবোধ (Frustration) এবং যুগের ক্লান্তি ও দ্বন্দ্ব-সংশয়। এক কথায় দ্বন্দ্বপীড়িত আত্মভেদী চৈতন্য। তার সঙ্গে নির্জনে এ কথার শেষে আত্মসত্তা অত্যন্ত সচেতন হয়ে ওঠে, সে নিজেকে জানতে চায়, এ জানতে চাওয়া প্রিয়তমকে ভালবাসার প্রথম সোপান বা পদক্ষেপ। তার-পর থেকে শুরু হয় প্রশ্ন, আমি কে? তুমি কে? উত্তর আসে, কিন্তু বড় অস্পষ্ট ও রহস্যময়। তখন তীব্র হয়ে ওঠে সূফী-সাধকের সন্ধান-বেগ ও ব্যাকুলতা। সাচাল বলছেন, 'বেদনার তীব্রতায় আমি তাঁর আলো দেখতে পাই।' এ আলো যে প্রাচ্য থেকেই উৎসারিত হয়েছে। জার্মান ভাষায় একটা কথা আছে, ড্রাং নাশ অসতেন (Drang Nach Osten) পূর্ব দিকের সহজাত প্রেরণা। আমার এক সহপাঠী ছিলেন ডক্টর গোয়েদারদ, জার্মান-ভাষী। সুন্দর গুরু-গম্ভীর তাঁর জার্মান উচ্চারণ। আমাকে দেখলেই তিনি বলে ওঠতেন, ড্রাং নাশ অসতেন—বলেই ইংরেজীতে মন্তব্য করতেন, Light comes from the East—খাঁটি সত্য, প্রাচ্য থেকেই আত্মিক জগতের আলো এসে পৃথিবী উদ্ভাসিত করেছে।

সাচালও বলতেন, হৃদয়ের দিকে চেয়ে দেখো, তাকে লালন করো। কারণ হৃদয় যে সেই পরমতম জনের প্রেম ও প্রসন্নতা সত্যের প্রেমময় দীপ্তি প্রসারণ এবং তাঁর উদ্দেশে নিত্য অভিসার, নিত্য স্মরণ ও চিরন্তন আনন্দ-আবেগ বহন করে। আর এ অভিসারের পটভূমিতে শুধু প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ, আশিক ও মাশুক; আর সে আনন্দময় ইতিবাদে বুদ্ধি নয়, বোধি দিয়ে প্রীতিমান পরিণয়ের অনুভূতি উপভোগ করবে সূফীর সংযত মিতশ্রী মন। এ অভিসার চলবে কোথায়? হৃদয়ে। হৃদয় যে প্রিয়তমের প্রাসাদ। সাধারণের প্রশস্ত রাজপথের বিপরীত চলাই তো তাঁর পথে চলা। সিন্ধুর শাহ্ লতীফ বলেছেন: পৃথিবী যদি স্রোতের অনুকূলে চলে, তুমি চলবে প্রতিকূলে। সাচাল সারমস্ত বলছেন, মসজিদ মকবেরা ও পবিত্র সৌধমালার অন্তরায় দূর না হ'লে তাঁর দর্শন সহজ হবে না।

আচার-অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া-সর্বস্ব ধর্মে সূফীর বিতৃষ্ণা ও বিরূপতা। তাই বেদিল বলেছেন, আশিক যে, ধর্মের প্রতি সে হয় বিরূপ। প্রচলিত অর্থে এ ধর্ম সমগ্র মানুষকে ধারণ করে না, আশিক ও মাশুকের মধ্যে তা এক দুরন্ত সমুদ্র-ব্যবধানের সৃষ্টি করে মাত্র। কারণ প্রাণহীন অনুষ্ঠান এক অন্ধ সম্মোহন সৃষ্টি করে, মানুষের দৃষ্টি-মন তাতেই আবদ্ধ, আসক্ত এবং আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ফলে, আসল লক্ষ্য থেকে সে ক্রমশ দূরে সরে

যায়। তাই সূফীর দৃষ্টি বাইরের দিকে নয়, ভিতরে বৃক্ষের বিচিত্র পত্ররাজির দিকে নয়, মূলে। সকল আনন্দ-সৌন্দর্য, সৃষ্টি-বৈচিত্র্য, প্রীতি-প্রেম ও জন্ম-মৃত্যুর মূলে আছেন সেই পরমতম জন। আর তাঁকে পেতে, চিনতে ও ভালবাসতে হলে চাই অন্তরের গভীর ও নিবিড় প্রশান্তি। সূফী তাই জীবনে এক পরম নিভৃতি রচনা ক'রে একান্তে তাঁর প্রতীক্ষায় থাকেন। সে নিভৃতির নিস্তব্ধতায় প্রিয়তমের কথা শোনা যায়; যেমন রাত্রির গভীর-তম নীরবতায় তারার কানে কানে কথা বলা নিস্তব্ধ ধ্যানরত ভক্তের শ্রবণে আসে। সূফীরা তাই অতল-গভীর নিস্তব্ধতায় ডুব দেন। সাচালও তাই দিয়েছিলেন। জীবনের গূঢ়তম রহস্য সেখানে আলোর মতো সহজ ও সুন্দররূপে প্রতিভাত হয়। অন্তর-সত্তা তাঁর প্রসন্ন আলোকে ধীরে ধীরে দলগুলো মেলে দেয়। আর সে সহস্র দলে প্রিয়তমের প্রেম মধুর মতো নিয়ত সঞ্চিত ও প্রসারিত হ'তে থাকে।

রোমান্তিক মতবাদের মতো সূফীবাদও বুদ্ধিপ্রবণ ও মননশীলতার যুগে একটু পানসে ও আবেদনহীন হয়ে পড়েছে, তার সে রহস্যময়তার আকর্ষণ এবং ভাব-সম্মোহনের শক্তি অত্যন্ত ম্লান ও নিস্তেজ প্রায়। তার কারণ সূফী কবিদের (সাধকদের বাদ দিয়ে কথা বলছি, কারণ যুগের ক্লান্তি ও বিপুল জড়তা-সংশয়ের মধ্যেও তাঁদের গোপন মনে চিরন্তন আবেগ আজও অন্তঃসলীলা ও চিরপ্রবহমান) অনুভূতির প্রতীক (রোমান্তিক কবিদের প্রতীক—সমুদ্র, মরাল. নীড়, শিশির, মেরু-তুষার, নদী বন্যা, নিষ্যন্দ আকাশ, অন্তহীন নীলতা। আর সূফী কবিদের সিম্বল মেঘ, মরুভূমি, প্রিয়তমা। আকুল-কুন্তলা রূপবতী, আশিক-মাশুক ইত্যাদি) এবং বিষয়বস্তুর আত্যা-ন্তিক পুনরাবৃত্তির ফলে সমগ্র ভাব-সৌন্দর্য ম্লান হয়ে এসেছে, তার প্রাথমিক স্বাদের সে রস-মাধুর্যও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। প্রত্যহের পরিচিত ও অভ্যস্ত স্পর্শে প্রথম প্রেমের উন্মাদনাও এমনি ক'রে স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু সূফীর প্রেম কিংবা অজানার জন্য মানুষের সন্ধান-ব্যাকুলতা (এই অজানা বস্তুসত্য বা ভাবসত্তা, দুর্জ্ঞেয় বা রহস্যময়, অনড় বা চৈতন্যময় যাই-হোক না কেন, অদৃশ্যে বিশ্বাস সত্যানুসন্ধিৎসার প্রথম শর্ত। কুরআন শরীফের প্রথমেও এ শর্ত আরোপিত হয়েছে), জীবনের সকল জটিলতা ও সন্দেহ-শৈথিল্য, বস্তু ও সমাজ-চেতনা, সাফল্য ও বৈফল্য, আবেগ ও রাগ-বিরাগ এবং সকল ধাতব-কঠিন ও মূর্ত চিত্রকল্প বিধৃত ক'রে আছে। এ রসবোধ ও ব্যাকুলতা বস্তুগত লৌকিক মনকে মুক্ত রেখে সমগ্র জীবনের

সমতা রক্ষা করে। এ সমন্বয় ও সামঞ্জস্য-চ্যুতি আধুনিক মানুষের জীবনে চরম বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। তাই দেহ ও মনকে যথাক্ষেত্রে সম্পৃক্ত ও প্রসারিত রাখলে বর্তমান কর্মক্লান্ত ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠিত মানুষের জীবনেও এ সমতা ও সমন্বয়-সুষমা দেখা দেবে।

এ সহজ সত্য অনুভব করেছিলেন বলেই সাচাল প্রাণহীন ধর্মাচরণকে আক্রমণ করেন। গতানুগতিক অন্ধ বিশ্বাস প্রেমের আনন্দকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। কাবা বা মসজিদে তাঁকে খোঁজা কেন? সে প্রিয়তম, যে আমাদের অন্তরেই করেন বাস। একটি সুন্দর সঙ্গীতে তিনি বলছেন :

প্রাণ প্রিয়তম আমার হৃদয়ে,
বুলবুল আমার দেহের বাগিচায়।
প্রেমের সমুদ্র আমার ভিতরে,
প্রিয়তমের সন্ধান করো আপন সত্তার গভীরে।
বাগানে ফুল, চাঁদও সেখানে পায় শোভা।
সাচাল বলে, প্রিয়তমকে জানা হলো শেষে,
দেখছি তাঁকে আমার হৃদয়ে,
দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে এসেছিলেন তিনি,
আমার চেতনার মর্মদেশে।

সাচাল কখনও উর্দু কখনও পঞ্জাবী বা সিরাইকি এবং কখনও সিন্ধী ভাষার মাধ্যমে আপনাকে প্রকাশ করেছেন। ফারসীতেও তিনি পুস্তক রচনা করেছেন এবং তাঁর রচিত দর্শন-পুস্তক 'দিওয়ান আশকারা' বিশেষ প্রশংসা ও খ্যাতি অর্জন করেছে। এ মহামূল্য পুস্তকখানি এখন খয়েরপুর রাজ্যের মীরদের খাস সম্পত্তি এবং অমূল্য সম্পদরূপে রক্ষিত।

সাচাল ছিলেন একাধারে সূফী-কবি ও দার্শনিক। তিনি ছিলেন তাঁর প্রিয়তমের হাতের বীণা, তিনি তাঁকে বাজান, তাঁর জীবন নিয়ে খেলা করেন। যে প্রিয়তম বীণকার তাঁর চিরসঙ্গী, জীবন-মরণের সাথী।

তাঁর চেয়ে নিকটতম আর কেহ নেই—
সে যে আমার সঙ্গী,
যার জন্য কেটে যায় আমার নিদ্রাবিহীন রাত্রি।
সে ছিল আমার সাথে,
এখানে সেখানে আমি তাকে খুঁজেছিলাম,

কিন্তু তাঁকে খুঁজে দেখিনি আমার অন্তরে।
হায়, যার জন্য আমি বিরহের অশ্রুপাত করেছি,
সে যে ছিল আমারই সঙ্গে!
হে সাচাল, দূরে বাহিরে করো না তার সন্ধান,
আপনাকে চেনো।
যার জন্য আমি উপহার করেছি সংগ্রহ,
সে যে ছিল আমারই সাথে!

১৮২৯ সালে সাচাল ইন্তিকাল করেন। জীবনের শেষ ভাগে তিনি বিশ্বাস করতেন, মিলনের পরম মুহূর্ত উপস্থিত হ'লে প্রিয়তম নিজেই আসেন মিলনক্ষেত্রের অভিসারে। কণ্টকর ও সচেতন পদক্ষেপ আর প্রেমিকের জন্য হয় না প্রয়োজন। নীচের একটি সঙ্গীতে আত্মোপলব্ধির এই শেষ পর্যায়ে সিন্ধুর বিখ্যাত লোকগাথা সসী ও পুন্নুর প্রেম কাহিনী, বিরহ ও মিলনের মধ্যে রূপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে ঃ

হৃদয়ের মধ্যে আমরা দেখেছি কাবাকে,
মক্কায় গিয়ে কি দরকার আর?
আমার মনই মসজিদ,
অন্যস্থানে সালাত ক'রে কি ফল?
প্রতি শিরায় আছে সে
কলমা পড়ে কি লাভ?
আমার পুন্নু নিজের ইচ্ছায় আসবে আমার কাছে,
কেচ-এ যাবার কি প্রয়োজন?
সাচাল প্রেমের দ্বারাই হয়েছে আহত,
ছুরি দিয়ে আর কেন সে নিজেকে দেবে আঘাত?

সাচালের এ সঙ্গীতটি সিন্ধুর প্রায় প্রতি ব্যক্তির মুখে মুখে শোনা যায়। সাচাল বেহেশতী শরাব আপনার পেয়ালায় পরিবেশন করেছেন, যারা তা পান করেছে রহস্যময়ভাবে তারাই হয়েছে শত শত পেয়ালায় পরিণত। যুগে যুগে তৃষ্ণার্ত পথিকের দল সে পেয়ালা থেকে প্রেমের সুরা পান ক'রে পিয়াসা মেটায়।

বেকাস ও বেদিল

সহজ-তত্ত্ব বা সহজ প্রেমের প্রতি হৃদয়বান ও ভাবপ্রবণ বাঙালীর একটি স্বাভাবিক নাড়ীর যোগ আছে। এ স্বাভাবিক প্রবণতার মূলে যে হৃদয়াবেগ ও ভাবোচ্ছ্বাস বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছে, তা এ বাঙলার মাটির মতোই সরস ও প্রাচীন। এত প্রাচীন যে, ইতিহাসের স্পষ্ট ও স্বচ্ছ দৃষ্টি ততদূর পর্যন্ত পৌঁছায় না। ভাব-গভীর বাঙালীর মন অতি সহজভাবেই এ পরম তত্ত্ব গ্রহণ করেছিল, শূন্যতা থেকে শুরু হ'য়ে এ সহজ-তত্ত্ব ক্রমশ একটি সুস্পষ্ট ভাব রূপ লাভ করে। এ সহজ-তত্ত্ব কি ? অষ্টম শতকের ব্রজযানি (সহজযানি) সিদ্ধাচার্য কানুপা বলছেন ঃ

> ভণ কইসেঁ সহজ বোলবা জাই
> কাঅবাকচিঅ জসুন সমাই।

বল, কি করে সহজ-তত্ত্ব বলা যায় কায়, বাক্য ও চিত্ত যাতে প্রবেশ করতে পারে না। এ সহজ-তত্ত্বের সহজ উপলব্ধি একমাত্র প্রেমের দ্বারাই সম্ভবপর। প্রেম কি? শব্দ-চিত্রময় পদগাথায়, ভাষা ও কথায় তা প্রকাশ করা যায় ; নানাভাবে তার বিচিত্র ব্যঞ্জনা হ'তে পারে। দৈহিক, দেহাতীত, সৌন্দর্যময় শিল্পী-সুষমায়, ভাব ও রূপ-উচ্ছলতায় এবং ধ্যান-তন্ময়তার গভীরতা ও আত্মসমাহিত চিত্তের ভাব-দ্যোতনায় প্রেম বহু ব্যাপক ও দূরপ্রসারী হয়ে প্রকাশ লাভ করেছে। কিন্তু প্রেম কি কথা বলে ? প্রেমের কি সংজ্ঞা সম্ভবপর ?

আত্মবিলয়ের পথে প্রেম লাভ হয়। এ আত্মবিলয় কি ? দ্বিত্বের লোপই আত্মবিলয়। এ তত্ত্ব বেশ স্পষ্ট ক'রে বলেছেন চতুর্দশ শতকের অমর সাধক কবি আমীর খসরু ঃ

> মন তু শুদম তু মন শুদী
> মন তন শুদম তু জাঁ শুদী।

তা কাস না গোয়দ বাদ আযাঁ
মন দীগরম তু দীগরী।

মধ্যযুগের আর একজন ভক্ত সাধক বলছেন :
কব মরি হোঁ কব ভেটি হোঁ পুরণ পরমানন্দ।
কবীর বলেন, কবে মরবো? কবে পূর্ণাঙ্গের সাক্ষাৎ পাবো?
প্রেমের জগতে দুইকে এক হতে হয়। কবীরও বলছেন,

জব মৈঁ থা তব পিও নহী
আব পিও হৈ মৈঁ নহী।
প্রেম গলী অতি সাঁকরী,
তাঁহে দো ন সমাহিঁ।

যখন আমি ছিলাম তখন প্রিয়তম ছিলেন না
এখন প্রিয়তম আছেন, আমি নাই।
প্রেমের পথ অতি সূক্ষ্ম,
দুইয়ের তা'তে ঠাঁই নাই।

প্রেমের প্রথম স্তরে দুই, শেষ স্তরে এক। দুই না হলে প্রেম হয় না; আবার দুই মিলে এক না হলেও প্রেম হয় না। তাই দুই যখন এক হয়, তখনই প্রেমের উদয় ও পূর্ণ সার্থকতা। বাঙলার বাউল বলেন :

নিত্য দ্বৈতে নিত্য ঐক্য প্রেম তার নাম।
কবীর সহজ-তত্ত্বের মূলকথা উদ্‌ঘাটন ক'রে বলেছেন :

সাধো, সহজ সমাধি ভলী,
আঁখ ন মুদোঁ কান ন রুঁধো
কায়া কষ্ট নহি ধারোঁ
খুলে নৈন পহিচানো হঁসি হঁসি
সুন্দর রূপ নিহারোঁ।

এ সহজ সাধকদের, সূফীভাব-পথিকদের প্রেরণা প্রবল ও অনুরাগ-দীপ্ত। এ রাগানুরাগের অনুরাগের বলেই তারা সব বন্ধন অতিক্রম করেন। এক নিমিষে সর্বাতীত হয়ে পড়েন।

এই অনুরাগের একটি কাহিনীই এখন বলছি।

সার্ধ শতকের পূর্বের কথা। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ। সিন্ধুর রোহ্‌রি শহরে বাস করেন যুবক মুহম্মদ মুহ্‌সিন। আজব খেয়ালী

ব'লে তিনি প্রতিবেশীদের নিকট পরিচিত। তাঁর একটি খেয়াল, তিনি তাঁর গৃহে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালাতেন না। অন্ধকারে তিনি বসে থাকতেন; গভীর নিস্তব্ধতার আনন্দে তিনি দেখতেন আকাশের তারা এবং ভাবাবেগে অনু-প্রাণিত আনন্দ-সঙ্গীতে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। ভক্ত রবীন্দ্রনাথের কথায় তিনি যেন বলতেন:

আমি জ্বালবো না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি,
আমি শুনবো বসে আঁধার-ভরা গভীর বাণী।
আমার এ দেহমন মিলায়ে যাক নিশীথ রাতে
আমার লুকিয়ে-ফোটা এই হৃদয়ের পুষ্পপাতে,
থাক না ঢাকা এই বেদনার গন্ধখানি।

একদিন মুহসিন চলেছেন শহরের একটা পথ দিয়ে। পথ চলতে তিনি শুনলেন, এক দোকানদার একটা হিন্দু বালককে ডাকছে, 'কান্-হাইয়া, কান্‌হাইয়া ঘরে আয়, তোর জন্য অপেক্ষা ক'রে যে আমার দিন গেলো!'

জানি না, মুহ্‌সিনের মনের কোন্ এক গোপন তারে বহুকাল বিস্মৃত একটি সুরের গুঞ্জরণ উঠলো। অকস্মাৎ এক অখ্যাত তুচ্ছ ঘটনার আঘাতে তাঁর মনের দুয়ার খুলে গেলো। মুহ্‌সিন ঘরে ফিরে এলেন। যে ঘরে কোনোদিন সন্ধ্যা-দীপ জ্বলেনি, সে ঘরে আজ বাতি জ্বলে উঠলো। প্রতি-বেশীরা অবাক। পাগলের এ আবার কি এক নতুন খেয়াল! খেয়ালই বটে; তবে তা মর্মান্তিক। রাতের পর রাত বাতি জ্বালিয়ে দুয়ার প্রান্তে বসে থাকতেন তরুণ মুহ্‌সিন, সে যদি আসে, সে যদি আসে, ঘর অন্ধকার দেখে সে যদি ফিরে যায়! তাঁর অন্তরে যেন প্রতিবেশীদের সকল বিদ্রূপ ও বিস্ময়কে অতিক্রম ক'রে বলে ওঠে:

'তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্ নি পায়ের ধ্বনি?
সে যে আসে, আসে আসে।'

সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা ও বিরহের আগুনে জ্বলে-পুড়ে মুহ্‌সিন একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ। পৃথিবী বক্ষে তিনি মৃত, কিন্তু এ মৃত্যুই তাঁকে সন্ধান দিল অন্তহীন জীবনের মহত্তর সম্ভাবনার। তরুণ তাঁর আপন সত্তা (ego) আমিত্বকে প্রেমের দায়ে এমনভাবে হারিয়েছিলেন যে, রোহরির অধিবাসীদের নিকট

তিনি বেকাস (সত্তাহীন, আমিত্ব-মুক্ত—egoless) নামে পরিচিত হলেন। প্রেমের তাগিদে আত্মবিলয়ের নিবিড় ভাবময় আনন্দে অধীর হয়ে যে সকল সঙ্গীত তিনি রচনা করে গাইতেন, প্রতিবেশীদের কণ্ঠেও সেসব সঙ্গীত প্রতিধ্বনিত হতো। এভাবে তাঁর রচিত সঙ্গীত রোহরির চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। রোহরির আশেপাশে গ্রামবাসীদের কণ্ঠে আজও তাঁর সঙ্গীত শোনা যায়।

বেকাসের জীবন ও সাধনা সুদীর্ঘ নয়। কিন্তু যে আত্মবিলয়ের কথা পূর্বে বলেছি, তা' তাঁর জীবনে এক বিস্ময়কর পরিণতি লাভ করে। অনেক সাধকই প্রতীক্ষা করেছেন, বিরহের আগুনে জ্বলেছেন, কিন্তু বেকাসের জীবনে তা অল্পকালের মধ্যে এরূপ তীব্রতা লাভ করে যে, তাঁর পক্ষে আত্মবিলয় অতি সহজ ও ত্বরান্বিত হয়ে আসে। প্রেমের পথে বেকাসের এ আত্মবিলয়ের ভাব ও রসরূপ আমাদের মুগ্ধ এবং অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

বিরহের দহনে জ্ব'লে বেকাস পরম সুন্দরের অমেয় প্রেম লাভ করলেন, এ প্রেম যে গভীর স্বাদে পূর্ণ, তার মূলে আছে গভীর তৃপ্তি ও চিরন্তন আত্মরতি। আত্মা চায় পরমাত্মাকে। একে অন্যের সঙ্গে অহেতুক এবং অফুরন্ত প্রেমের বন্ধন ও দায়ে আবদ্ধ। আত্মনিবেদন, আত্মনিমজ্জন (বেকাস— egoless) ও চরম ভাব-সম্মিলনের মারফত বেকাসের চরম অভিজ্ঞতা লাভ হ'লো। এ পরম ও মধুরতম অভিজ্ঞতা লাভের জন্য যুগ যুগ ও জীবন ধ'রে প্রতীক্ষা করে থাকেন কত সাধক! কিন্তু বেকাসের মতো এত অল্প বয়সে সুন্দরতম জনের সান্নিধ্য ও সোহাগ অর্জন অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর বলেই মনে হয়। হ্যাঁ, সম্ভবপর হয়, আল্লাহ্‌র রহমতে তা অত্যন্ত সুগম হয়, সন্দেহ নেই। তাই সেই আনন্দ-রস-স্বরূপের অকৃপণ হস্তের দাক্ষিণ্যের জন্য সাধকগণ এবং সঙ্গে সঙ্গে দীনাতি দীন আমরাও প্রতীক্ষা ক'রে থাকি। চিরবন্ধুর জন্য এ প্রতীক্ষা। বেকাস বলেন :

আবাস ভূমির জন্য এই আকুল প্রতীক্ষা,
এই প্রতীক্ষা দিনরাত চোখে নিয়ে আসে পানি।

প্রিয়তমের আকর্ষণ অদম্য, তাঁর আহ্বান সমস্ত সত্তাকে ব্যাকুল ও বিচলিত করে। তাঁর প্রেমের রীতিই যে এই, সে প্রেমের দায়ে আপনাকে

নির্মমভাবে করতে হয় হত্যা, আত্মসুখ হয় উৎসর্গীকৃত চিরন্তন দুঃখের অভিসারের পথে ও আবর্তে। তাই মধ্যযুগের এক পদকর্তা বলেছেন :

রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি,
বুঝিতে পারিনু বঁধু তোমার পীরিতি।

বেকাস প্রেমের রীতি বুঝেছেন মর্মান্তিকরূপে। তিনি বলেছেন :

প্রিয়তম, এই হলো বিয়োগান্ত,
তোমাকে দেখা অর্থই নিহত হওয়া।

সাধকরা সাধ করেই নিহত হ'তে চেয়েছেন, দুঃখের নিবিড়তার মধ্যেই তাঁরা অনন্ত সুখের, প্রেমের স্বাদ লাভ করেছেন। তাই তাঁদের পক্ষে এ বিয়োগান্তের শেষ অধ্যায় মিলনান্তে পরিণত হয়। কিন্তু এত দুঃখ বরণ, বেদনা স্বীকার কার জন্য ? সে রাজার রাজা যে অন্তরেই বিরাজ করছেন ? বেকাস বলছেন :

যে রাজাকে তুমি সন্ধান করো,
সে-ত তোমার অন্তরেই।

হ্যাঁ, অন্তরেই তিনি আছেন, অপেক্ষা শুধু আমিত্ব বা দ্বৈতকে নিশ্চিহ্ন (সুফীদের পরিভাষায় নিহত) করা। মহাজন বলছেন :

আজ বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা,
তোরা নিসাড় হইয়া আয় লো সজনি
আঁধার পেরিয়ে আলা।

আঁধার অর্থ, আমিত্বের ব্যবধান ও আচ্ছন্নতা। এ আচ্ছন্নতা দূর হয় সাধকের ক্ষুদ্র সত্তার স্বার্থবোধের মৃত্যুতে। মহাজন তাই শেষ কথা বলছেন :

পীরিতি লাগিয়া পরান ছাড়িলে
পীরিতি মিলয়ে তথা।

একদিন সে আসে, সেদিন সাধক তাঁর সুদীর্ঘ বিরহজর্জরিত জীবনকে ধন্য মনে করেন, ধন্য হয় তাঁর নিদ্রাবিহীন গগনতলের দুঃখের রাত্রি-যাপন। এমনি এক পরম শুভলগ্নে কবীর বলেছিলেন :

হাম ঘর আয়ে পরম ভরতার,
ধন ধন ভাগ হামার।

বেকাসও এমনি ভাবের চরম আবেগে বন্ধুদের উদ্দেশে বলেছিলেন ঃ

প্রিয়তম আমার দেশে এসেছে,
সহচর সবে, তোমরা আমাকে আজ
তোমাদের অভিনন্দন ও আশিস্ পাঠাও।

সকল পরম প্রাপ্তি ও তৃপ্তির মূলে আছে প্রিয়তমের রহমত। যাকে খুশী তাকে তিনি তাঁর রহমত দান করেন, তাঁর উপর প্রসন্ন হন। এ প্রসন্নতা তাঁর কৃপা, সাধকের দাবী নয়। সাধকের পক্ষে তাই পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের পর প্রতীক্ষা, আত্মবিলয়ের পর ধৈর্যশীলতা একান্ত প্রয়োজন।

আত্মবিলয়ের পরই আসে অকস্মাৎ সমগ্র ভাব ও আনন্দ-সত্তার অপূর্ব শিহরণ ও বিস্ময়কর অপ্রত্যাশিত জাগরণ, দাক্ষিণ্য বা রহমতের অবিরাম এবং অকৃপণ বর্ষণ। বেকাসের জীবনে এই উপলব্ধির আবেগ-সঞ্চার দেখতে পাই। তাঁর কথায় ঃ

সেই জাগে প্রিয়তম যাকে জাগান।
আর কেউ নয়, আর কেউ নয়।

আর কে? সেই এক বিশ্বের পরম আনন্দঘন রসস্বরূপ প্রেমাস্পদ, সেই এক। হ্যাঁ, প্রেমাস্পদই তিনি। সাধকগণ বিনা শর্তে না দেখেই শুধু দূরাগত বাঁশীর সুর শুনেই তাঁরা তাঁকে সব কিছু নিবেদন ক'রে বসে থাকেন। তন-মন-ধন সব কিছু।

বেদিলও তাই করেছিলেন। বেকাসের পূর্ববর্তী তিনি।

সূফী কাদির বখ্শ প্রিয়তমকে দিল্ দিয়ে তিনি হ'লেন বে-দিল। বেদিল তার আত্মবিলোপের কাহিনী ও আত্মকথা সহজ সিন্ধীতে সোজা ক'রেই প্রকাশ করেছেন ঃ

জীবনের সকল চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ করো,
যদি প্রেমের সুরা পান করতে চাও।
ছুরিকে এড়ানো কাঁচা ও নাজুক প্রেমের চিহ্ন।
মৃত্যু থেকে মুখ ফিরিয়ো না,
এসো, তলোয়ারের নীচে মাথা রাখো,

পৃথিবীর সকল বন্ধন রশি ছিঁড়ে ফেলো।
বেদিল বলে, কথা শোনো,
প্রেম যদি করতে চাও, তবে শেষ পর্যন্ত
থাকো বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত।

রুমী, বেদিল, শারমুদ প্রেমের দায়ে দুঃখ, বেদনা ও বিরহের আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরেছিলেন, প্রিয়তমের চরম নিষ্ঠুর আঘাতের নীচে মাথা পেতে দিয়েছিলেন, কারণ দুঃখ ও তীব্র বেদনার দহনে যে জীবন কলুষমুক্ত, অহমিকা বর্জিত, সার্থক সুন্দর ও নিবেদিত, সে জীবনেই প্রিয়তমের প্রেম ও প্রসন্নতা লাভ অতি সহজ ও সুনিশ্চিত।

আমি খুঁজে বেড়াই তারে
যে জন আমায় কাঁদায় অন্ধকারে।

সূফী মনের এই স্বতঃউৎসারিত ভাবরস উৎসরণের মধ্যে তত্ত্ব কোথায়? অতি সাধারণ কয়েকটি শব্দের মধ্যে সূফী মনের যে আবেগ প্রসারিত হয়েছে, তা অপরাপর সন্ধানপর মনকে স্পর্শ করে; কিন্তু সেখানে তত্ত্ব প্রশ্ন জাগায় কি? এ কয়টি শব্দ যেন তাদের অর্থ (অভিধানগত) বহন করতে পারছে না, নতুন অনেক কথা ও ভাবের কলরব তুলে তারা একটা বেদনার্ত মনের ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছে। তত্ত্ব যদি থাকে তবে আছে প্রচ্ছন্নভাবে, শব্দের ও রসাশ্রিত ভাবের পরিচর্যার মধ্যে। তা তাত্ত্বিক যে, সে তত্ত্ব খুঁজবে, কিন্তু আমরা? তত্ত্ব-নিরপেক্ষ যে সৌন্দর্য, নিবিড় জীবন-রস-সিক্ত গভীর অনুভূতিলব্ধ যে সৌন্দর্য, তারই পরিবেশন আমরা দেখি এ কয়েকটি মাত্র কথায়। এখানে অলংকরণ বা পাণ্ডিত্য প্রকাশের কোনো চেষ্টা নেই। মনের গভীর গহনে যে বেদনা—বেদনার মন্থরতা ক্রমশ দ্রুত হয়ে অব্যক্ত ভাবাবেগে কবিকে বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত করেছে, এ অংশ তারই এক বিচিত্র ও পরম মুহূর্তের খণ্ড-ঐক্য, খণ্ড হলেও অগ্র-পশ্চাতের সকল জীবন-প্রবাহ যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। সূফী এ ভাব-প্রকাশের বেদনারসে সজীব হয়ে উঠেছেন।

সূফীতত্ত্ব আমাদের বিচার্য নয়, সূফীভাবের আস্বাদন আমাদের লক্ষ্য। চলমান জীবনের এ আস্বাদ, এ অনুভূতি সমস্ত তত্ত্ব-জ্ঞানের মূল উৎস ও সাক্ষাৎ চিৎপ্রকর্ষের দীপ্তি এবং উৎসাহ। শক্তির (energy) অস্তিত্ব আমরা দু' রকমে অনুভব ক'রে থাকি—গতি ও উত্তাপ। সূফীর প্রেমও একটা শক্তি। এ শক্তির গতির দিকে সে চঞ্চল, সন্ধানপর ও ভাবোচ্ছল; উত্তাপের দিকে সে প্রেমের দাহ, বিরহের তপ্ততা ও ব্যবধানের ব্যাকুলতা

অনুভব করে। সূফী জীবনের এ গতি ও সূফী-ভাবের উত্তাপ আমরা উপলব্ধি করবো। তত্ত্বের বিশ্লেষণ, বিক্ষেপণ ও বিবর্ধনের চেয়ে এ ভাবের তথা উত্তপ্ত সূফীচিত্তের বেদনার প্রকাশ-রূপকে অনুভব করার ভিতরই আমাদের মতো সাধারণ মনের সার্থকতা ও সজীবতা লাভ।

সিন্ধুর হায়দরাবাদ অঞ্চলের সূফী দরিয়া খানের সময়কাল আমাদের অজ্ঞাত, কিন্তু তাঁর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবরসের স্বাদ থেকে আমরা বঞ্চিত নই। দরিয়া খানের সংগৃহীত গানগুলোর সঙ্গে অন্যতম সূফী সাধক রোহালের সঙ্গীত প্রক্ষিপ্ত হয়ে আছে। প্রেমের গতি ও উত্তাপের অনুভূতি তাতে ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয় না। দরিয়া খান ও রোহালের সঙ্গীত ঃ

'প্রিয়তমকে যখন অনুভব করি হৃদয়ে
যেখানে থাকে না কোন রূপ,
শুধু প্রেমের পূর্ণতা।
অতীতকে আমি গ্রহণ করিনে,
ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষাও আমার নেই
কারণ অনুভূতিই চির এবং নতুন।'

প্রিয়তমের প্রতিধ্বনি যখন কানে পেঁছোয়, তখন তারা (কর্ণদ্বয়) বিস্ময়ের পৃথিবীতে প্রবেশ করে এবং আর কিছুই শোনে না।

যে সকল কুমারী মুক্ত ক্ষেত্রে আসে
তাদের নিকটেই প্রিয়তমের দরজা,
গুণ্ঠনবতী যারা তারা বরের সঙ্গ পায় না।
আপনার আমিত্ব থেকে যে নিজেকে করছিল মুক্ত
সে দেখলে সমস্ত ভূমিই তার।
চোখ যখন দেখতে থাকে,
প্রিয়তম দূর থেকে দূরতর হন।
নিজেকে যতই ভুলতে থাকি,
প্রিয়তম ততই আপনাকে উন্মোচন করেন।
ব্যাকুলতা থেকেই আলো আসবে।

৮—

প্রেমিকগণ কাবায় দাঁড়ায় না,
তারা হৃদয়ের মিহ্‌রাবে সাজ্‌দা করে,
মক্কা তাদের বাহিরে নয়, ভিতরে।
তাদের আত্মা প্রতি মুহূর্তের তীর্থ-পথিক।

সোহাল-ভ্রাতা শাহর কয়েকটি সঙ্গীতের প্রথম কলি :
ভাই, এমন এক গৃহে আমি বিচরণ করি,
যেখানে তুমি নেই, আমিও নেই, এই পৃথিবীও নেই।
তিন জগতে কেউ বাস করে না,
আমাদের জগৎ চতুর্থ, নাম তার
'যে শহরে দুঃখ নাই।'

সূফীদের এই ভাব-জগতে আমাদের হয়তো প্রবেশের অধিকার নেই। তবু দূর থেকে বিস্মিত চোখে তার কারু-কৃতিত্ব ও মানস-সৌকর্যের বৈচিত্র্য দেখি। অন্তর দিয়ে অনুভব করতে চেষ্টা করি তাদের গভীর ভাবরসের চিরন্তন আবেগ-উচ্ছ্বাস ও উদ্বেলতা।

প্রেমিকের আকুল আহবানে তুষার-শীতল নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয়। কারণ মিলনের তাগিদ, প্রাণের টান তো এক তরফা নয়। সাধকদের প্রশান্ত জীবনের দিকে চেয়ে দেখো। দেখবে, কোন্ মৃগমদের আকুল গন্ধে মন তার উদ্‌ভ্রান্ত ও ব্যাকুল। সে অনুভূতির আনন্দরসে জীবন নিমজ্জিত। নিমজ্জনে সাধক ভুলেছে আপনাকে, সেই আপনাকে যা ভিতরের মানুষকে করে আচ্ছন্ন, উদাসীন ও সর্বস্বান্ত। তাই সাধকদের ছোট আমি, আমিত্বের মৃত্যুই তাঁর মিলন-পথের প্রথম পদক্ষেপ।

পূর্ণানন্দের স্বরূপ মিলনের শুভ লগ্নে উদ্‌ঘাটিত হয়। তখন চন্দ্র-সূর্যের সাধ্য কি তার সেই জালওয়া ঢেকে রাখে। এই জালওয়া বা জ্যোতি বড় তৃপ্তিকর; কিন্তু অদর্শনে তা জ্বালার সৃষ্টি করে পূর্বরাগের প্রথম স্তরে। পূর্বরাগের বিরহ উত্তর রাগে মিলন। বিরহের রাগদীপ্ত জীবনের যে আকুলতা, যে রিক্ততা, তা যেন বিকাশোন্মুখ একটি গুলাব। গন্ধ আছে, প্রকাশের ব্যাকুলতা আছে, কিন্তু পথ নেই। এক দিন আলোকের নিঃশব্দ স্পর্শে তার দল প্রসারিত হয়ে ওঠে, তার গন্ধ-রূপ-রসও মর্ত্যলোক ছাড়িয়ে নক্ষত্রলোকে পৌঁছে যায়। সেই মনের দিগন্তে রূপকারের সাক্ষাৎ মেলে। সাধককে দেখেছি, বসে বসে পল-অনুপলে প্রহর গুণছে, মিলনের এই দিগন্ত আর কত দূর? আমাদের কামনা: জীবন সুদীর্ঘ হোক, ভোগ-সম্ভোগে বিলম্বিত হোক দেহের সমাপ্তি। সাধকের বাসনা, স্বল্প হোক জীবনের এই পরিসর। উন্মুখ হয়ে থাকে তাঁর ডাকের অপেক্ষায়। অন্তরে বাইরে দৃশ্য-গন্ধ-গানে; প্রেম, প্রীতি ও মমত্বে ভুল ক'রে বারবার সেই ডাক সে শোনে। আহা, যখন ডাক আসে, আর কি তর সয়! ভারমুক্ত শুভ্রপক্ষ মরাল নভোদিগন্তে মুক্তির পাখা মেলে দেয়। সাধক-জীবনের এই উন্মেষ, ক্রম-বিকাশ ও পরিণতির ভাবরূপ আমরা বাইরে থেকে লক্ষ্য করি। কিন্তু তার রস-রূপ? সে স্বাদের কণা আমরা পাই কি ক'রে? আমাদের তো আকুলতা নেই, আর্তি নেই। চন্দ্র, সূর্য তো বিরাট, আমাদের ধন-সঞ্চয়-স্পৃহা, শক্তি-

লোলুপতা, স্বার্থপরতা—জীবনের অসংখ্য ক্ষুদ্রতা তাকে ঢেকে রয়েছে। সাধকের মন মুক্ত, সে মন মাটি ছেড়ে নীলকে স্পর্শ করে। সে নীলেই কি তার বাস? সে নীল পার হয়ে সপ্ত আকাশের আবরণ ভেদ ক'রে জাগ্রত ও সন্ধানপর সাধক-চিত্ত তার অনুসন্ধানে রত হয়। চন্দ্র-সূর্য কি তাকে ঢেকে রাখতে পারে? দেখা-না-দেখায় মেশা এই আনন্দ অনুভূতিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে পঞ্জাবের সূফীশ্রেষ্ঠ বুলেহ্ শা একদা এক পরম ভাবমুহূর্তে বলেছেনঃ

পায়া হায় কুচ পায়া হায়
সৎ গুরু নে অলখ লখাইয়া হায়।
কহুঁ বইর পড়া, কহুঁ বেলি হায়
কহুঁ মজনু হায় কহুঁ লায়লী হায়।
কহুঁ আপ গুরু কহুঁ চেলী হায়
সব আপনা রাহ্ দিখায়া হায়।
কহুঁ চোর বানা কহুঁ শাহ্জী হায়
কহুঁ মম্বর তে বহী কাযী হায়।
কহুঁ তেগ বাহাদুর গাযী হায়
আপ আপনা পন্থ বতায়া হায়
কহুঁ মসজদ কা বরতারা হায়
কহুঁ বণিয়া ঠাকুর দুয়ারা হায়।
কহুঁ বৈরাগী জপ ধারা হায়
কহুঁ শেখন বন্ বন্ আইয়া হায়।
কহুঁ তুরক মুসল্লা পড়্হ্ দে হো
কহুঁ ভগত হিন্দু জপ করদে হো।
কহু গোর কনী বিচ পড়দে হো
হর ঘর ঘর লাড লাডাইয়া হায়।
বুলহা শাহ দা মাই মুহতায হুয়া
মাহ্‌রাজ মিলে মেরা কাজ হুয়া।
দর্শন পিয়া দা ইলাজ হুয়া
লগ্‌গা ইশক তা য়েহ গুণ গায়া হায়।
পায়া হায় কুচ পায়া হায়।

বাঙলার সমগোত্র পঞ্জাবী ভাষা এখানে অত্যন্ত সরল, প্রাঞ্জল ও সহজ-বোধ্য হয়ে উঠেছে বুলেহ্ শা'র সাধনা ও আন্তরিকতার স্পর্শে হৃদয়া-

বেগের দীপ্তিতে। অনুভূতির স্বচ্ছতাও আছে এই সহজ প্রকাশের পেছনে। সৎগুরু—শিখ ও মধ্যযুগীয় অন্যান্য সহজপন্থীদের মধ্যে সৎগুরু কথাটি অত্যন্ত প্রচলিত। সৎগুরু, সৎসঙ্গ ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারও এ সকল মতবাদে প্রচুর দেখা যায়। অলখ-অলক্ষ্য, অদৃশ্য। বইর-বৈর, শত্রু। চেলী-চেলা, শিষ্য। শাহজী—দাতা, মম্বর—মিমবর, উচ্চ আসন বা বেদী। তেগ বাহাদুর—শস্ত্রবীর। পন্থ—পথ। তুরক—তুর্ক, মুসলিম অর্থে ব্যবহৃত। কবীরের দোঁহায় মুসলিম অর্থে তুরকের ব্যবহার প্রচুর বিদ্যমান। বরতারা—ব্যবহার। মহারাজ—এখানে গুরু শাহ্ ইনায়েতকে মহারাজ বলা হয়েছে। দর্শন—manifestation প্রকাশ। ইলাজ—চিকিৎসা।

> প্রিয়-দর্শন ছিল আরোগ্য ও চিকিৎসা আমার।
> পড়েছি তাঁহার প্রেমে—গাহিয়াছি গুণগান তাঁর।
> পেয়েছি পেয়েছি কিছু।

বিরহের একমাত্র প্রলেপ মিলন। সাধকগণ একান্তে এই প্রিয়-মিলনের আকাঙক্ষী। কিন্তু প্রিয় কে? বিরহ-ই বা কেন? মিলনের প্রয়োজনই বা কি? সব পাগলের প্রলাপ। প্রলাপই বটে! এই গূঢ় আনন্দের আবেগ, এই অদৃশ্য জনের স্পর্শ বস্তুগ্রাহ্য বা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ নয়। তাই ভক্ত ও প্রেমসিক্ত অন্তরের উদ্গত উচ্ছ্বাস ও আনন্দের গতিবেগ অবান্তর প্রলাপ বলেই মনে হয়। আর সাধকরা তো পাগলই বটে, গতানুগতিক পথে তাঁরা চলেন না, বৈষয়িক বুদ্ধি নেই, ভোগ-বিলাসের স্পৃহা নেই, নির্বস্তুক কী এক স্বপ্নাবেশে সম্মোহিতের মতো কত কি যে কথা বলেন! উপরের কবিতায় বুলেহ্ শা'র যে ভাব স্পষ্ট হয়েছে তা সর্বানুভূতির আবেগ। সব কিছুর মধ্যে তাঁর স্পর্শ অনুভব করা। দিল্লীর সাধক শারমুদকে দেখেছি। ঘাতকের সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ উদ্যত। মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাঁর পাগলামি—প্রিয়তম, কত বেশেই তো দেখা দিলে, এ বেশে আর ভয় দেখাও কেন? একেবারে যাকে বলে God-Intoxicated man আল্লাহ্‌র মস্ত সাধক, আল্লাহ্‌র মস্তানা। আমাদের দৃষ্টি তো খণ্ডক্ষুদ্র বিচ্ছিন্নভাবে দেখি সব কিছু; সমগ্রের অনুভূতি ও দর্শন কোথায়? সাধক পাগল, তাই তাঁর বুকের কথা মুখে এসে যায়। প্রিয়তমের স্পর্শের উষ্ণতা তাঁর বুকে, অন্তরের পাত্র গূঢ় ভাবরসে পূর্ণ ও উচ্ছ্বসিত। সে রস তো উপচে পড়বেই, বুকের ভিতরে যে গন্ধ দেহ মনকে আকুল করছে, তার প্রকাশ তো বাইরে অনিবার্য। যে কথা গোপন রাখা উচিত ছিল, বুলেহ্ শাহ্ তাই বিশেষ আবেগ ও উৎসাহের সঙ্গে

প্রকাশ করেছেন। এই প্রকাশের মধ্যে দর্শনের নিগূঢ় সত্য ও তথ্য আছে, কিন্তু জটিলতার প্রশ্রয় নেই। তাঁর কথায় আমরা যে গতিবেগ ও প্রকাশ-মাধুর্য লক্ষ্য করি, তার মূলে আছে সাধকের আন্তরিকতা ও শত মিলন মুহূর্তের অমৃত মধু সঞ্চয়।

মুঁহ আঈ বাত না রহিনদি হাই
ঝুট আখা তে কুচ বচ্ দা হাই,
সচ আখিয়া ভমবর মচ্দা হাই।
(মুখে আসে বাত রোধ করা তারে কভু নাহি যায়;
ঝুট বলি তবু রয়ে যায় কিছু নীরব সত্যে অগ্নি ছড়ায়।)
দিল দোহাঁ গল্লাঁ তো জচদা হাই,
জচ জচ কে জেহ্‌বা কাহিনদি হাই।
(হৃদয় তাক্ত উভয় ক্ষেত্রে, কথা বিরক্ত এই জিহবায়।)
ইক লাযম বাত আদব দী হাই
সানু বাত মালুমী সব দি হাই।
(আদবে বিশেষে একটিই বাত, মোর সাথে সব স্পষ্ট প্রভায়।)
হর হর বিচ সুরত রব দী হাই
কাঁহি যহর কাঁহি ছুপ্পে দি হাই।
(সব কিছুতেই রবের সুরত প্রকাশিত কি বা গুপ্ত গুহায়।)
যিস পাইয়া ভেত কলন্দর দা
রাহ খোজিয়া অপনে অন্দর দা।
সুখবাসী হাই ইস মন্দর দা, যিতথে চড়্‌হদি হাই না
লাইনদি হাই।
(যে পায় পীরের গোপন তত্ত্ব, অন্তরে পথ খুঁজে সে কি পায়—
সে মন্দিরের সুখবাসী যেথা উদয়-অস্ত নাই কো যেথায়।)
এতথে দুনিয়া বিচ হনেরা হাই অতে তিলকান
বাজী বেহড়া হাই।
অন্দর বড়কে দেখো কেহড়া হাই
বাহার খলকাত পাই ধুনদেঁ দি হাই।
(এদিকে মর্ত্যে অন্ধকার যে প্রাঙ্গণ-পথ ক্ষণে পিছলায়,
অন্দরে দেখো কে আছে সেথায়?
বাহিরে জনতা সন্ধান চায়।)

এতথে লেখা পাউঁ পসারা হাই ইসদা
বকখারা ভেত নিয়ারা হাই,
ইক সুরত দা চমকারা হাই জিঁউ চিনাগ দারু
বিচ পাইদী হায়।
(এখানে লেখায় প্রসারিত পদ, ভেদ ও
ভিন্ন নাই যে তাহায়,
সুরতে তাহার চমকায় আলো,
স্ফুলিঙ্গ ঝরে যেন মদিরায়।)
কিতে নাযো অদা দিখলাই দা
কিতে হো রসুল মিলাই দা
কিতে আশক্ বন্ বন্ আই দা,
কিতে জান জুদাঈ সাহিনদি হাই।
(কোথায় দেখায় ছলাকলা সে যে, রসুলে লইয়া কোথা চ'লে যায়
প্রেমিক কোথাও চিত্ত আর্ত বিরহ-তীব্র সেই যে ব্যথায়।)
যদো যহর হোয়ে নূর হোরি
জল গায়ে পাহাড় কোহ্তুর হোরি
তদো দার চড়হে মনসুর হোরি
উতথে শেখি না মাইঁডী তইডি হাই।
(প্রকাশিত যবে আলোক তখন সারা কোহে তুরে
আগুন ছড়ায়,
মনসুর চড়ে শূলে যে তোমার আমার গর্ব নাই যে তাহায়।)
জে যহর ক'রা অসরার তাঈঁ সব ভুল
যাবন তকরার তাঈঁ,
ফির মারন বুলেহ্ ইয়ার তাঈঁ
অতথে মখ্ফী গল সোহিনদে হাই।
(গূঢ় তত্ত্ব বলি যদি, তবে ঝগড়া ফাসাদ সব থেমে যায়।
বন্ধু বুলেহ্কে মারিবে তাহারা (ধর্মযাজক)
যত মাধুর্য ঘোরালো কথায়।)
বল্হা শাহ্ আসাঁথোঁ বখ নহী
বিন শাহ্ থিঁ দুজা কক্খ নাহি ?

পর বেকখন বালী আখ নহি তাহিঁ জান
পাই দুখ সাহিনদী হাই।
মুঁই আঈ বাত না রহিনদী হাই।
(বুলেহ্, সে নহে পৃথক ভিন্ন
প্রভু ছাড়া কারো।স্থিতি যে নাই,
শুধু নাহি চোখ দেখিবার তাই
আত্মায় দাহ দুঃখ সদাই।)

সে তো আমাদের থেকে পৃথক নয়! কিন্তু সে সৃষ্টি কোথায়, যে সৃষ্টি তৃণ থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত সেই সুন্দর প্রিয়তমের লীলা-বৈচিত্র্যে ও অফুরন্ত প্রাণ-শক্তিতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে? সে মুগ্ধ বিস্মিত চক্ষু কোথায়, যেখানে নিয়ত প্রতিফলিত হয় আকাশ ও সমুদ্রের নীল ছায়া, প্রভাত ও সন্ধ্যার বর্ণ-সমারোহ? সেই চোখ নেই, বিস্ময়বোধ নেই। তাই তো আত্মার এ দুর্দশা, বন্দীত্বভোগ। মনে হয়ঃ

এই যে আকাশ বন্ধু চারিদিকে বনের বিস্ময়,
এই তৃণ মধুগন্ধী পল্লবিত চারু কিশলয়,
সবুজে সবুজে প্রাণ, শিহরণ রোমাঞ্চ লতায়,
নীলের পেলব স্পর্শ সমুদ্র ও আকাশের গায়।
এই যে তোমার পত্র প্রতিভাত প্রথম প্রভাতে,
অসংখ্য অক্ষরে কথা তারা-ভরা অন্ধকার রাতে,
একা বসে চেয়ে দেখি, তবু সেই চোখের তারায়,
কোথায় তোমার ছায়া? আপনার দিগন্ত হারায়
খণ্ড ক্ষুদ্র বাসনায়। পঙ্ক বুকে পদ্মের উদ্ভব।
তবুও প্রতিটি দলে অফুরন্ত সূর্যের বিভব।

শয়খ ইব্‌রাহীম

পঞ্জাবের প্রথম সূফী কবি ও সাধক শয়খ ইব্‌রাহীম* ছিলেন চিশতীয়া তরীকার একজন বিখ্যাত পীর। তাঁর জীবনকাল ১৪৫০ সাল থেকে ১৫৭০ সাল পর্যন্ত নির্ণীত হয়েছে।

চিশতীয়া তরীকা এই উপমহাদেশে প্রথম প্রবর্তন করেন চিশতের আবু-ইসহাক শামী। কিন্তু পঞ্জাবে এই তরীকাকে পুনরুদ্ধার করেন ফরীদ উদ্দীন। সাধারণত তিনি গন্‌য-ই-শক্কর এ নামেই বিশেষ পরিচিত। ফরীদ উদ্দীনের পিতামহ পারস্য থেকে এ দেশে আসেন দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে। তাঁর আগমনের পঞ্চাশ বছর পর মুলতানের নিকটবর্তী খোটাস গ্রামে ফরীদ জন্ম-গ্রহণ করেন (১১৭১-৭২ সাল)। তিনি দিল্লীর বিখ্যাত মুরশিদ শাহ্‌ কুতবুদ্দী-নের মুরীদ হন। মুরশিদের ওফাতের পর তিনি তাঁর খিরকা লাভ এবং পাক পাটানে (পবিত্র শহর) বসবাস শুরু করেন।

পাক-পাটান থেকে ফরীদুদ্দীন ইসলামের প্রচার কার্য শুরু করেন। গন্‌য-ই-শকরের ওফাতের পর তাঁর মুরীদগণ সমস্ত উত্তর ভারতে তাঁর বাণী ও শিক্ষা এবং ইসলাম প্রচার করেন। পাক-পাটানকে তাঁরা সব সময়ই আধ্যাত্মিক শক্তির প্রাণকেন্দ্র বলে মনে করতেন। ফরীদুদ্দীনের অন্যতম প্রধান শিষ্য হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া দিল্লীর নিকটবর্তী গিয়াসপুরে সাধনকেন্দ্র স্থাপন এবং বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তির জ্যোতি বিকিরণ করেন। তাঁরই প্রিয়তম শিষ্য উর্দু ও ফারসী সাহিত্যের অমর কবি ও সাধক আমীর খসরু বহু গযল ও কবিতার মধ্যে মুরশিদ ও আপনার সাধন-জীবনের গভীরতম উপলব্ধি এবং ভাবধারা প্রকাশের দ্বারা সূফীবাদের সুন্দরতম অভিব্যক্তির রূপ দেন।

শয়খ ইব্‌রাহীম ফরীদুদ্দীনের অধঃস্তন একাদশ পুরুষ। তাঁর জন্ম তারিখ সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। গতানুগতিকভাবে সাধারণ শিক্ষালাভ করে তিনি চিশতীয়া তরীকার অন্তর্ভুক্ত হন এবং সূফী জীবন লাভের জন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করতে থাকেন। পিতা খাজা শয়খ মুহম্মদের ওফাতের

---

* এ নামের তাৎপর্য-ব্যাখ্যা খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়ার অধ্যায়ে বর্তমান।

পর তিনি গদীনশীন হন। চেহারা ও পবিত্রতায় তিনি সানী বা দ্বিতীয় ফরীদ নামে পরিচিত হন।

ফরীদ সানী এক বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হন। হিন্দু জনগণের উপর তাঁর বিরাট প্রভাব ছিল। তিনি তাদের নিকট শয়খ ব্রাম (ইব্রাহীমের অপভ্রংশ) নামে বিশেষ প্রিয় ছিলেন। সেই সময়কার দেশ-শাসকগণ সূফী দরবেশদের ভালো নযরে দেখতেন না। তার ফলে সূফিগণ জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ ক'রে আপনাদের নিরাপত্তা বিধানে বিশেষভাবে তৎপর হন। জনগণের উপর তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য স্বেচ্ছাচারী রাজা-বাদশাহ্গণ সূফী-সাধকদের কার্যকলাপে ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হতেন না।

পাক-পাটানের ও সাধকগণের সাধনা ও সহযোগিতার দ্বারা ইসলামী দর্শন ও সূফিবাদের বিশেষ চর্চা ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। পূর্বেই বলেছি, ফরীদ সানী এক বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হন। নানা অলৌকিক ঘটনার ভিতর দিয়ে তাঁর এ শক্তির বিস্ময়কর পরিচয় পাওয়া যায়। 'গুলযার-ই-ফরীদী' গ্রন্থে তাঁকে তাঁর কেরামত বা অলৌকিক কাণ্ডসমূহের জন্য বিশেষভাবে প্রশংসা করা হয়। সূফী সাধকগণ আপনাদের সাধনা ভক্তিবলে আল্লাহ্‌র অনন্ত শক্তি ও সিফাতের ক্ষুদ্রতম অংশের অধিকারী হন। ফলে তাঁরা লৌকিক শক্তির আয়ত্ত বা কল্পনার অতীত এমন সমস্ত কার্য করেন যা সাধারণ লোকচক্ষুকে বিস্মিত ও অভিভূত করে। তাঁরা যা করেন তা আল্লাহ্‌র শক্তিতেই করেন। আল্লাহ্‌র অতি নিকটবর্তী বলেই তাঁদের পক্ষে কেরামত প্রদর্শন অতি সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। সূফী কবি ও সাধক ফরীদ সানীও এভাবে বস্তু ও অধ্যাত্ম জগতের উপর প্রভাব বিস্তার এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লাভ করেন। 'গুলযার-ই-ফরীদী'তে বর্ণিত একটি ঘটনা : রাত্রে ফরীদ সানীর ঘরে চোর ঢুকেছে। কিন্তু সাধকের ক্ষতি হবে, আল্লাহ্ তা সহ্য করলেন না। চোর অন্ধ হয়ে বসে রইলো। ভোর বেলা শয়খ সাহেবের জন্য ওযুর পানি আনতে গিয়ে খাদেম চোরকে দেখতে পেলো। চোর শয়খ সাহেবের নিকট দোষ স্বীকার এবং তাঁর মার্জনা ভিক্ষা করলো। শয়খ সাহেব আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করলেন, চোর তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলো। সে ঘৃণ্য বৃত্তি ত্যাগ করে তাঁর মুরীদ হ'য়ে এক নতুন জীবনের স্বাদ পেয়ে ধন্য হলো।

একবার পঞ্জাবে ভীষণ অনাবৃষ্টি দেখা দিল। চারদিকে মরুতপ্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হলো। শুষ্ক বনভূমি, তৃষ্ণার্ত কৃষিক্ষেত্র, মানবকণ্ঠে আর্তধ্বনি। হাহাকার উঠলো—তাপহরা, তৃষাহরা বৃষ্টিধারা কোথায় ? আল্লাহ্,

এক বিন্দু পানি দাও। শয়খ সাহেবের নিকট দলে দলে লোক এসে এই মুসিবত ও আল্লাহ্‌র গযবের হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে আকুল আবেদন জানালো। আর্ত-দুঃস্থদের কাতরতায় বিচলিত হয়ে শয়খ সাহেব তাঁর পাগড়ি খুলে চারদিকে ঘুরাতে লাগলেন। পাগড়ির উপর অজস্রধারে বর্ষণ শুরু হলো।

শয়খ ইব্‌রাহীম ফরীদ সানীর বহু বিখ্যাত মুরীদ ছিলেন। ফতেহপুর সিক্রির স্বনামধন্য সাধক ও বাদশাহ্ আকবরের বিশেষ ভক্তির পাত্র শেখ সলিম চিশতী তাঁদের অন্যতম।

শয়খ ইব্‌রাহীম ফরীদ সানীর সাহিত্য সৃষ্টির ধারা পরিচয় কতকগুলো কাফিয়ার সমষ্টি ও একশ তিরিশটি শ্লোকে লাভ করা যায়। এ ছাড়া তাঁর 'নসিহতনামা'য় অমূল্য ধর্মীয় অনুশাসন এবং সূফী-বিশ্বাস ও মতবাদ লিপিবদ্ধ হয়েছে। ফরীদের অন্যান্য কবিতা শিখদের ধর্মগ্রন্থ 'আদিগ্রন্থে' দৃষ্ট হয়। উচ্চ সূফীভাব ও ভক্তিরসে অনুসিক্ত বলে শিখগুরু বাবা নানক* শয়খ ইব্রাহী-মের অনুমতি নিয়ে 'আদিগ্রন্থে' এ সকল কবিতা সংযোজিত করেন। 'গ্রন্থে' সংযোজিত হওয়ার পরও পুনরায় তা শয়খ সাহেবের বিশেষ অনুমোদন লাভ করে। বলা বাহুল্য, শয়খ সাহেব পঞ্জাবী ভাষায় তাঁর কবিতা ও কাফিয়া রচনা করেন।

পঞ্জাবী ভাষা জনগণের ভাষা ; কিন্তু শিক্ষিত ও অভিজাত পঞ্জাবিগণ দেশীয় ভাষা পঞ্জাবীকে ঘৃণার চক্ষে দেখে থাকেন। সেজন্য শয়খ সাহেবের কবিতাবলী অশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করলেও শিক্ষিত ও শরীফগণ দেশের জীবন্ত তথা চলিত ভাষায় প্রকাশিত শয়খ সাহেবের ভাব ধারাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখেন নি।

তাই শয়খ সাহেবের কবিতা ও কাফিয়া রক্ষার কৃতিত্ব এবং প্রশংসা একমাত্র গুরু অর্জুনের প্রাপ্য।

অনেকের মতে 'গ্রন্থসাহেবে' প্রকাশিত কবিতাবলী একমাত্র ফরীদ সানীর রচিত নয়, প্রথম ফরীদের (গন্‌য-ই-শকর) রচনাও তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছে। গ্রন্থসাহেবের উল্লিখিত রচনা দুই ফরীদের এ মতবাদের খণ্ডন গ্রন্থসাহেবেই আছে :

---

* গুলযার-ই-ফরীদীতে বর্ণিত গুরু নানক স্বয়ং আদিগুরু নহেন। 'আদিগ্রন্থ' বা গ্রন্থ সাহেব সংকলন করেন পঞ্চম গুরু অর্জুন সিং। তিনি ফরীদের পরবর্তী সাধকের অনুমতি ও অনুমোদন লাভ করেন। শিখ গুরুগণ একে অন্যকে নানক বলে সম্বোধন করতেন।

'শেখ হায়াতী জগ্‌না কোঈ থিরু রহিয়া
জিসু আসনা হাম বইটঠে কেটে বনস গইয়া।'
ওগো শেখ, পৃথিবীতে এ জীবন নহে নহে থির,
যে আসনে বসে আছি, সেথা বসেছেন বহু পীর।

এ থেকেই প্রমাণিত হয়, 'গ্রন্থসাহেবে'র এই রচনাগুলো ফরীদুদ্দীনের নয়, ফরীদ নামে তাঁর একজন বংশধরের অর্থাৎ দ্বিতীয় ফরীদের (ফরীদ সানীর।)

শয়খ ইব্‌রাহীম পঞ্জাবী ভাষায় পাক-পাটানে সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রচারকার্য করতেন। তাই তাঁর ভাষা পঞ্জাবী, পঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষায়, বিশেষ ক'রে মুলতানী পঞ্জাবীর প্রভাব তাতে বিদ্যমান। শয়খ সাহেবের ভাষা সহজ, সরল ও স্বাভাবিক। হিন্দি ও ফারসী শব্দের ব্যবহার ইতস্ততঃ থাকলেও সে সকলের অর্থ জনসাধারণের নিকট অতি সুপরিচিত।

হিন্দি ভাষাতেও তিনি কবিতা রচনা করেন। এতে হিন্দি ভাষার উপরে তাঁর বিশেষ দখলের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে পঞ্জাবী ভাষায় রচিত কবিতাবলীই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা ও সাহিত্য সৃষ্টি। তাঁর কবিতার ভাব সরল, প্রকাশ-ভঙ্গি সাবলীল, শক্তিশালী ও চিত্তাকর্ষক। আল্লাহ্‌র সন্দর্শন ও সঙ্গলাভের জন্যে সূফী চিত্তের যে ব্যাকুলতা ও উচ্ছ্বাস-আবেগ, তা তাঁর কবিতায় অতি সুন্দর-ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি যে উপমা ও প্রতীক ব্যবহার করেছেন তা পারস্যের সূফী-সাধকদের ন্যায় মার্জিত ও সুসঙ্গত না হলেও সে সকল উপমা সাধারণের নিকট সুপরিচিত ও বোধগম্য বলে তাঁর রচনা জনসাধারণের চিত্ত একান্ত সহজেই গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। বিশেষ করে তিনিই পঞ্জাবের প্রথম মুসলমান সাধক যিনি পঞ্জাবী ভাষায় কবিতা রচনা করেন। বস্তুত পঞ্জাবী সূফী কবিতা রচনা ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম পথপ্রদর্শক ও দিগ্‌দর্শী।

আল্লাহ্‌র একত্ব ও নবীজীর জীবন-দর্শনই ছিল তাঁর সাধন-পথের প্রধান অবলম্বন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ইসলামের সহজ, সরল ও সুন্দর পথই তাঁকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে। অন্যান্য সূফীর মত তিনি মনে করতেন, তালি দেওয়া কোর্তা ও দীনহীন বেশ হৃদয়কে বিনীত এবং মুক্তি লাভে সাহায্য করে। তিনি উপদেশ দিতেন,

'পাড় পটোলা ধজ করি
কম্বলড়ী পহিরোঈ

জিনী বেসি সাহু মিলই
সোই বেস করোঙ্গ।

অর্থাৎ

কাপড় ছিঁড়ে টুকরো করো,
কমলি পরো গায়,
সে বেশ পরো, যে বেশে মোর
পিতাম মিলায়।

শয়খ ইব্‌রাহীমের মতে বিশ্বাস ও নিষ্ঠা মূল লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করে। অন্তরের সত্যিকার ব্যাকুলতা ও তীব্র বেদনাবোধ সাধককে প্রিয়তমের নিকট পৌঁছে দেয়।

রবীন্দ্রনাথের কথায়——
মিথ্যা আমি কি সন্ধানে যাবো কাহার দ্বার,
পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার।
শুধাতে যাই যারই কাছে
কথার কি তার অন্ত আছে,
যতই শুনি চক্ষে ততই
লাগায় অন্ধকার।

অথবা, আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে,
তুমি আপনি এসে দ্বার খুলে দাও, ডাকো তারে।
বাহু পাশের কাঙাল সে যে
চলেছে তাই সকল ত্যেজে,
কাঁটার পথে ধায় সে তোমার অভিসারে।
তুমি আপনি এসে দ্বার খুলে দাও, ডাকো তারে।

শয়খ সাহেবের একমাত্র ভরসা আল্লাহ্‌র করুণা ও দয়া। সংসার জীবনের প্রাত্যহিক তুচ্ছতা ও দীনতা তাঁর শুভ্র আত্মাকে কলঙ্কিত করে না। শুভ্র মরালের মত তাঁর আত্মা আল্লাহ্‌র প্রেম-সায়রে বিচরণ করে, কিন্তু তাঁর পদে পদে বহু বাধা ও প্রতিবন্ধকতা। তাঁর এই স্বচ্ছন্দ বিচরণের সকল অন্তরায় আল্লাহ্‌ই দূর করবেন, সেই ভরসায় তিনি আছেন। ফরীদ বলেছেন,

সায়রে সাঁতার কাটিছে মরাল,
পথে পঞ্চাশ ফাঁদ,

হে সত্য এক, ভরসা যে তুমি
(ভেঙে দেবে ভয়-বাঁধ।)

এই মরাল নিরাসক্ত ও পূত পবিত্র শুভ্র আত্মা, সায়র পৃথিবী এবং সাধনজগত।

মানব-প্রীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। অন্যের মনে দুঃখ দিয়ে প্রিয়তমকে লাভ করা যায় না। ফরীদ ছিলেন কবি, তাই কবি-চিত্ত মানুষের স্পর্শ-কাতরতা ও বেদনাবোধের তীব্রতা অনুভব করতো। মানুষের মনে দুঃখ দিও না। কবি ফরীদ বলছেন,

মানুষের হৃদয় যেন মুক্তা,
তাকে দুঃখ দেওয়া তো ভাল নয়।
প্রিয়তমকে যদি চাও, তবে
কারও হৃদয়ে দিও না ব্যথা।

বিনয় ও নম্রতা ছিল শয়খ ফরীদের চরিত্রের অন্যতম গুণ। তিনি বলেছেন ঃ

ফরীদ, ধূলিকে করো না ঘৃণা,
তার মত আর কিছু নেই।
যখন জীবিত থাকি, ধূলি থাকে পায়ের নীচে।
মৃত হলে ধূলি থাকে আমাদের উপরে।

পঞ্জাবে চিশতীপন্থী সাধক ও সাধনা বিস্মৃতপ্রায়। কিন্তু আজও পঞ্জাবের প্রতি ঘরে ঘরে জনগণের মুখে মুখে ফরীদের কবিতা, কাফিয়াঁ ও শ্লোক উচ্চারিত হয়। বিষাক্ত সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে এখনও পঞ্জাবের হিন্দু মুসলমান ও শিখদের মানসলোকে তিনি বিচরণ করেন। তাঁর অসংখ্য সূফী-ভাবব্যঞ্জক কবিতা ও শব্দ-ধ্বনি তাঁর উচ্চ সাধন ও কবি-প্রতিভার পরিচয় বহন করে পঞ্জাবীদের সন্তপ্ত চিত্তে সান্ত্বনা ও আনন্দরূপে অক্ষত সত্তায় বিরাজিত।

মাধো লাল হুসাইন

১৫৬২ সাল। উত্তর পঞ্জাবের নির্মম শীতের রাত্রি-ঘন কুয়াশার অন্তরালে রাভি নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে। শীতের নদী, তবুও খরস্রোতা। হিমালয়ের কোথাও হয়তো তুষার স্তূপ ধসে পড়েছে। তারই শীতলতা ও স্রোতধারা রাভি নদীর ক্ষীণ তনুতে অকাল যৌবনের সঞ্চার করেছে। পঞ্জাবের রাভি, বিয়াস ও সাটলেজ এমনি হিমতুষারের অকারণ দাক্ষিণ্যে যৌবনপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু সে যৌবনের উষ্ণতা নেই, উচ্ছলতা আছে। এমনি শীতের রাত্রে রাভি নদীর এক বুক পানিতে দাঁড়িয়ে আছেন এক দীর্ঘদেহ পঞ্জাবী যুবক—সবল বাহু, উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত বক্ষ, বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। যুবক অনর্গল কুরআনের আয়াত আবৃত্তি ক'রে চলেছেন--আয়াতের পর আয়াত। আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণীর বিচিত্র সুর, ছন্দ ও ঝঙ্কারে রাত্রির অন্ধকার, দুর্ভেদ্য কুয়াশার জাল ও গভীর নিস্তব্ধতার হিম আবরণ ছিন্ন করে প্রসারিত হয়ে চলেছে বাণীর পর বাণী। এ রাত্রি, ছিন্ন অন্ধকার, নদী, নক্ষত্র-খচিত আকাশ, চারদিকের সব কিছু তাঁরই, তাঁর নিকট থেকে সমস্ত কিছুর আবর্তন প্রাণশক্তির বিপুল প্রকাশ ও পরিণতি।

শুধু একটি রাত্রি নয়, রাত্রির পর রাত্রি, পৃথিবীর পরম নির্জন ও গোপন মুহূর্তে আল্লাহ্‌র বাণীর ধ্বনি মারফত চলে তাঁর পরম প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষাৎ সান্নিধ্য লাভের সাধনা। কে এই তরুণ সাধক, আল্লাহ্‌র জন্য যাঁর জীবন হয়েছে একান্তে উৎসর্গীকৃত? ইনি পঞ্জাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সূফী-সাধক মাধো লাল হুসাইন।

সূফী সাধক হুসাইন ১৫৩৯ সালে (হিজরী ৯৪৫) লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন রাজপুত হিন্দু। হুসাইনের জন্মকালে পরিবারের দুর্দশা চরমে ওঠে। পিতা শয়খ উসমান গভীর দারিদ্র্যে জীবন যাপন করেন। তিনি ছিলেন তাঁতী।

খুব অল্প বয়সেই হুসাইন হাফিয হন। ঝাং জেলার চিনিয়ট শহরের বিখ্যাত সূফী সাধক শয়খ বাহ্‌লুল তাঁকে শিষ্যত্ব দান করেন। বাহ্‌লুল ছিলেন একজন সিদ্ধ সাধক ও কামেল ফকীর।

ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি পীরের সঙ্গ ছেড়ে মনীষী সা'দুল্লার ছাত্র-রূপে সূফী-সাধনার বহু গ্রন্থ পাঠ করেন। অধ্যয়নকালে একদিন তিনি উস্‌তাদের গৃহ ত্যাগ করে আসছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর মনে হলো, তিনি আল্লাহ্‌র গোপন তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছেন। সাফল্যে অধীর হয়ে কূপের মধ্যে তিনি কুরআন শরীফ নিক্ষেপ করেন। সঙ্গিগণ তাঁর এই কুফরী কার্যে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কূপের ভিতর থেকে কুরআন শরীফ অলৌকিকভাবে উত্তোলন করেন। সহচরগণ বিস্মিত হয়ে দেখলেন, গ্রন্থখানি পূর্বের ন্যায় শুষ্ক ও অক্ষত অবস্থায় আছে। (হুসাইনের এ সিদ্ধি লাভের ঘটনা 'তাহ্‌কিকাত-ই-চিশ্‌তি' পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে)।

এ বিচিত্র অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও অনুভূতির পর থেকে তিনি সকল সামাজিক আইন-কানুন ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে নৃত্য, গীত ও শরাব পানে মত্ত হলেন। তিনি হয়ে উঠলেন মরমীবাদী-সাধক। কোনো কোনো সূফী-সাধক পান করেছেন শরাব, নেশায় ও রঙ্গে তা তাঁদের অন্তরে এনেছে পরম আরাধ্যের জন্য মত্ততা, প্রেমোন্মত্ততা। কিন্তু হুসাইনের মত্ততা বা উচ্ছৃংখলতা কলঙ্কের অপবাদে রূপায়িত হয়ে লোকমুখে প্রচার লাভ করলো। পীর শাহ্‌ বাহ্‌লুল শিষ্যের এ অধোগতি ও কলঙ্কের কথা শুনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং সমস্ত ব্যাপার নিজের চোখে দেখবার জন্যে লাহোরে এসে উপস্থিত হলেন। হুসাইনের সঙ্গে কথা বলে তিনি তাঁর সাধুত্ব ও সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে চিনিয়টে ফিরে গেলেন।

হুসাইন লাল রঙের পোশাক পরতেন। সেজন্যে তিনি লাল হুসাইন নামে পরিচিত হন। রাভি নদীর অপর তীরবর্তী শাহ্‌দারা গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পুত্র মাধোর প্রতি হুসাইন অনুরক্ত হয়ে পড়েন। এ অনুরাগ সূফী-সাধকদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ সুন্দর মুখের ভিতর তাঁরা এ পরম সুন্দর (যাঁর সবচেয়ে সুন্দর নাম এবং সেজন্য সবচেয়ে সুন্দর তিনি) আল্লাহ্‌র অনন্ত সুষমা ও অপরূপ মাধুর্যের রশ্মিকণা প্রতিফলিত দেখেন। তাই এ অনুরাগের মূলে কুৎসিত আসক্তি বা ভোগবিলাসের বাসনা নেই, আছে শুধু অফুরন্ত সৌন্দর্য পিপাসার অনাসক্ত আকুতি।

সুন্দর তরুণ কিশোর মাধোকে হুসাইন প্রীতির চক্ষে দেখতেন, সূফী সাধকগণ যেরূপভাবে পছন্দ করতেন নারী-পুরুষের সুন্দর মুখ, অপরূপ তনুশ্রী; সেই শ্রীর মধ্যে তাঁদের চক্ষে ফুটে উঠতো শাশ্বত সৌন্দর্যের এবং অসীমের সীমিত ও সার্থক প্রকাশ।

কিশোর মাধোও হুসাইনের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে শয়খ মাধো নামে তিনি পরিচিত হন এবং তাঁর নাম সাধক লাল হুসাইনের নামের পূর্বে জড়িত হয়ে হুসাইনকে মাধো লাল হুসাইন নামে খ্যাত করে। মাধো ও সাধক হুসাইনের পারস্পরিক প্রীতি ও সৌহার্দ্য সম্বন্ধে বহু কল্পিত ও অতিরঞ্জিত গাল-গল্প প্রচলিত আছে।

মাধো লাল হুসাইন মুগল বাদশাহ্ আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু আকবরের রাজত্বকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। বাদশাহ্ আকবর হুসাইনকে জানতেন। শাহ্যাদা দারা লিখেছেন, শাহ্যাদা সেলিম এবং আকবর বাদশাহের অন্তঃপুরচারিণিগণ তাঁর অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাসী ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। (History of Lahore) 'তাহ্কিকাত-ই-চিশ্তী' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, শাহ্যাদা (পরে বাদ্শাহ) সেলিম সাধক হুসাইনের একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন এবং বাহার খান নামে একজন অফিসারকে তাঁর দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করবার জন্য নিযুক্ত করেন। এই ঘটনাবলী পরে একত্র সংকলিত হয়ে 'বাহারিয়া' গ্রন্থ নামে প্রকাশিত হয়। 'বাহারিয়া' সাধকের অলৌকিক শক্তি ও লোকোত্তর সাধন-প্রতিভার পরিচয় বহন করছে।

মাধো লাল হুসাইন হিন্দু ও মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। বহু লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে ধন্য হয়।

তেপ্পান্ন বছর বয়সে ১৫৯৩ সালে (১০০৮ হিজরী) শাহ্দারায় সাধক হুসাইন ইন্তিকাল করেন। শাহ্দারায় তাঁর সমাধি রচিত হয়। এর কয়েক বছর পর রাভি নদীর প্লাবনে তাঁর সমাধি বিধৌত হয়ে যায়। এ সম্বন্ধে সাধক পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেন। শয়খ মাধো তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার ক'রে বাগবানপুরায় জাঁকজমকের সঙ্গে পুনরায় কবর দেন। সেই সমাধির পার্শ্বেই সাধকের প্রিয় সুহৃদ মাধোর সমাধি বিদ্যমান। সমাধির উত্তর দিকে অবস্থিত একটি সুউচ্চ মিনারে কদম-ই-রসূল (রসূলের পদচিহ্ন) ভক্তির

৯—

সঙ্গে সুরক্ষিত, পশ্চিম দিকে রণজিৎ সিংহের অন্যতমা পত্নী মোরা কর্তৃক নির্মিত একটি মসজিদ।

শিখগুরু অর্জুনের সঙ্গে মাধো লাল হুসাইনর পরিচয় ছিল। গুরু অর্জুন শিখধর্মের 'আদিগ্রন্থ' বা 'গ্রন্থসাহেব' সংকলিত করেন। এই সংকলনে হুসাইনের কবিতা স্থান না পেলেও ভক্ত শিখগণ হুসাইনের কবিতা ও কাফিয়া অতি ভক্তির সঙ্গে আবৃত্তি ও ধর্ম গ্রন্থালোচনায় উদ্ধৃত ক'রে থাকেন। আদিগ্রন্থের প্রথম অধ্যায় জপজীর ইংরেজী অনুবাদের প্রথমেই হুসাইনের কবিতার দু' লাইন ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে :

Without, within us, is the Lord,
To Whom in silence we address us.

হুসাইনের এই নিঃসঙ্গতা-প্রীতি বিস্ময়কর। মাধো তাঁর এই নিঃসঙ্গতার কিছুটা অংশ অধিকার করেন। কিন্তু তারও মূলে ছিল সাধকের যৌবন-প্রীতি (youth love—গ্রীকদের নিকট থেকে পারসিকগণ এই ভাবধারার আমদানি করেন। শিল্পীর যেমন একটা মডেলের প্রয়োজন, তেমনি চিরসুন্দরের ধারণা ও তাঁর পূর্ণ উপলব্ধির জন্য মানুষের সবচেয়ে মহিমময় ও সুন্দর প্রকাশ যৌবনের শরণ কোনো কোনো সূফী গ্রহণ করেন। সূফীবাদের বিরুদ্ধবাদিগণ এই তত্ত্বের বিপরীত ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন।)

হুসাইনের সূফীবাদ পারসিক ও বাংলা-পাক-ভারতীয় সূফীমতের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। মরমী ভাবধারা ও বিশ্বাসের দিক থেকে তিনি ছিলেন বাংলা-পাক-ভারতীয় ; কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে তিনি পারসিক সূফীদের জীবনপ্রণালী ও পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। শরাব পানে তাঁর আসক্তি বিস্ময়কর, কিন্তু তার চাইতেও বিস্ময়কর ছিল, তিনি বস্তুপ্রণোদিত মত্ততাকে আল্লাহ্‌র প্রেম-উন্মাদনায় পরিণত করতে পারতেন এবং সেই অবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রেমের প্রচার ও প্রকাশের দ্বারা অপূর্ব সংহত ও প্রেমসিক্ত চিত্তের পরিচয় দিতেন। এদিক থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ পারসিক প্রভাবে প্রভাবিত।

হুসাইন কোনো লিখিত গ্রন্থ রেখে যান নি। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাফিয়া তাঁর সূফী ও কবি-জীবনের উচ্চ মরমীবাদ ও ভাবধারার পরিচয় বহন করছে। কবিতা ও গান তিনি সহজ পঞ্জাবী ভাষায় রচনা করেন, সে পঞ্জাবীতে আরবী ও ফারসী শব্দের ব্যবহার প্রচুর। ভাবের সাবলীলতা ও চিন্তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। ইব্‌রাহীম ফরীদ সানির পঞ্জাবীর তুলনায় তা আরও সহজ, সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। উর্দু কবিতার জৌলুস বা চাকচিক্য

তাতে নেই, কিন্তু শব্দের সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহার এবং ছন্দের বলিষ্ঠতা তাকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য করেছে। হুসাইনের কবিতা মরমী ভাবরসের সঙ্গে অন্তরে তীব্র বেদনা ও অন্তর্দাহের সৃষ্টি করে।

হুসাইন ফানা-ফিল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী অর্থাৎ আমিত্বের মৃত্যুর দ্বারা (Death to self) আল্লাহ্‌র বিশ্বময় সত্তার মধ্যে আত্মনিমজ্জনকামী হলেও তিনি 'আনাল হক' মতবাদের (আনাল হক---I am the Creative truth—আমিই সেই সৃজনশীল সত্য) প্রতি তাঁর আস্থা ছিল না। কারণ তাঁর সমগ্র জীবনের লক্ষ্য ছিল সন্ধানপরতা। তাঁর প্রিয়তম (আল্লাহ্‌) সর্বব্যাপী, সর্বস্থানে তাঁর বহু প্রত্যাশিত উপস্থিতি, কিন্তু তিনি তাঁকে দেখতে পারছেন না। রবীন্দ্রনাথের কথায় ঃ

কাছে থেকে দূর রচিলে কেন গো আঁধারে,
আমার এ জীবন রবে কি কেবলি আধা রে।

এই কাছে থেকে দূর রচনার জন্য কবির অন্তরে বিরহের জ্বালা অতি তীব্র হয়ে উঠেছে। যে সবখানে আছে, তাঁকে কাছে পাইনে এই দুঃখই অঞ্জন-ঘন বেদনা হয়ে সাধকের চিত্তাকাশ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এমনি বিরহের অশ্রান্ত ক্রন্দন আমরা শুনেছি ফকীর লালন শা'র সাধন সংগীতে ঃ

আমার বাড়ীর কাছে এক আরশী নগর
সেথায় এক পড়শী বসত করে।

*　　*　　*

সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে।

প্রিয়তমের সঙ্গে সাধকের এই লক্ষ যোজনের ব্যবধান, এই ব্যবধান ঘুচাতে হুসাইনের সারা জীবন কেটেছে। এজন্যেই বুল্লেহ শা'র মতো প্রিয়তমের সঙ্গে তাঁর মিলন হয়নি। মিলন হয়নি বলেই হুসাইনের কবিতা ও সঙ্গীত হৃদয়ের অফুরন্ত বেদনা গুচ্ছ গুচ্ছ আংগুর ফলের মত মর্মান্তিক রসোচ্ছ্বাসে দানা বেঁধে ওঠেছে। নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় আমরা দেখবো, কি মর্মস্পর্শী ভাষা ও কারুণ্য-রস-ব্যঞ্জনায় বিশ্ব-আত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন শাহ্‌ হুসাইনের বিরহ-তপ্ত আত্মার ব্যাকুল নিবেদন রূপ লাভ করেছে।

দরদ বিছোড়ে দা হাল নী মাঈ
কে-হ-নুঁ আক্‌খাঁ---

সুলাঁ মার দিওয়ানী কিত্তি বিরহু পিয়া খিয়াল
নী মাই কেহনু আক্খাঁ।
জঙ্গল জঙ্গল ফিরাঁ ঢুঁডেঁদী অজে না আয়া
মাহিয়াল, নী মায় কেহ্নু আক্খাঁ।

ধুকখন ধুয়ে শাহাঁ ভালে জাঁক্রোলাঁ তাঁ লাল
নী মায় কেহনু আক্খাঁ।

কহে হুসাইন ফকীর রাব্বানা বেখ নিমানিয়া দা হাল
নী মায় কেহ্নু আক্খাঁ।
বিরহের এই ব্যথার কথা বলবো কারে হায়,
এই যে ব্যথা আমাকে যে দিওয়ানা বানায়
খেয়ালে মোর এই বিরহ—বলবো কারে হায়!

জঙ্গলে জঙ্গলে আমি ফিরি যে সন্ধানে,
মাহিয়াল এলো না আজও—কোথা সে কে জানে!
ধিকি ধিকি অগ্নি জ্বলে কালো শিখা তার,
যখনই নাড়ি যে দেখি লাল যে আমার।
হুসাইন ফকীর কহে—আল্লার ফকীর,
ভাগ্য দেখো নয়নত যে জন অধীর।

বিরহের বেদনা-তপ্ত অগ্নিশিখার মধ্যে সাধক তাঁর লালকে (ভালবাসার ধন—যে প্রিয়তম আমাদের মায়া বা অজ্ঞানতার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছেন। আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান এবং বহু দৈন্য দুর্বলতা পরম প্রিয়তম ও আমাদের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান ও অচলায়তনের সৃষ্টি করেছে। এই কণ্টকর ব্যবধান দূর করার জন্যই সাধকদের আজীবন সাধনা ও প্রয়াস) তীব্রতম অনুভূতির ভিতর দর্শন করেন। এই কবিতাটির মধ্যে সাধক হুসাইনের সমস্ত জীবন ও কাব্যের মূল কথা ও ভাবরসের পূর্ণ প্রকাশ লাভ হয়েছে। সাধক তাঁর সন্ধানে বনে বনে ও পথে পথে ঘুরে বেড়ান, কিন্তু মাহিয়ালের সাক্ষাৎ তাঁর মিললো না, সুহিনী চিরদিন নিঃসঙ্গই থেকে গেল (সুহিনী ও মাহিয়াল বা মেহার, সিন্ধু পঞ্জাবের বিখ্যাত লোক-গাথা। এই গাথায় নায়ক মাহিয়াল ও নায়িকা সুহিনীর বিচ্ছেদ-মিলনকে ভাব-প্রতীকরূপে ব্যবহার ক'রে সিন্ধু-পঞ্জাবের সুফিগণ বিরহ-কাতর প্রাণের আবেগ ও বেদনা প্রকাশ করেছেন।)

হুসাইনের এই সন্ধানপরতা ও নিঃসঙ্গতা-প্রীতি বিচিত্র ভাবরসে সিক্ত হ'য়ে কবিতা ও সঙ্গীতে বহুরূপে প্রকাশ লাভ করেছে।

হুসাইন প্রিয়তমের প্রেম-ভাবে মত্ত হয়ে উঠতেন। সে সময় তাঁর বিপুল ভাবাবেগ ও অধীর আত্মপ্রকাশ নৃত্য-ছন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো, ভক্ত প্রাণের ভাবরস শত ধারায় উচ্ছ্বসিত এবং নৃত্যেই হতো তার সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। এই আবেগপূর্ণ নৃত্য-বিলাসের ব্যাখ্যা ক'রে হুসাইন বলছেন:

শক গিয়া বেশকী হোঈ
তাঁ মাইঁ অগণ নাচ্চি হাঁ,
জে শাহ নাল মাইঁ ঝুমের পাওয়াঁ
সদা সুহাগণ সাচ্চি হাঁ,
ঝুঠে দা মুঁহ কালা হয়া
আশক দী গল সাচ্চি হায়,
শক গিয়া বেশকী হোঈ
তাঁ মাঁই অগণ নাচ্চি হাঁ।

শখ দূরে গেছে বেশখী হয়েছে গুণহীন নাচি আমি,
প্রিয়তম সাথে এই খেলা তাই সূফী সোহাগিনী আমি।
মিথ্যাবাদীর মুখ কালো হলো আশিকের কথা খাঁটি,
সন্দেহ দূরে নিঃসন্দেহে গুণহীন নাচি আমি।

এই নৃত্যের ভিতর দিয়ে একদিন সূফীশ্রেষ্ঠ রুমী মাশুকের প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে উঠেছিলেন এবং পাক-ভারত ও পারসিক নৃত্যকলার মূলে বিশেষ-ভাবে প্রেরণা দিয়েছে প্রধানত আধ্যাত্মিক ভাবরস ও অদৃশ্য প্রিয়তমের প্রতি উৎসারিত ভক্তজনের হৃদয়াবেগ ও আনন্দ-বিহ্বলতা (পাক-ভারতের কথাকলি ও পারস্যের মৌলভী সম্প্রদায়ের নৃত্য)।

সাধারণের পায়ে-চলা প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে হুসাইন চলেন নি। অন্তরের তীব্র বেদনাবোধের দ্বারা তিনি নিজের পথ নিজেই রচনা করেন। আর সাধকদের জীবন যাপন, কথাবার্তা, চালচলন ও প্রকাশভঙ্গির ধরনই আলাদা। প্রিয়তমের সন্ধান যাঁদের জীবনের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ও লক্ষ্য, তাঁদের জীবন সাধারণের জীবন থেকে যে সম্পূর্ণ পৃথক হবে তাতে আর সন্দেহ কি? তাই তাঁরা অনেক সময়ই সাধারণের ও প্রাণহীন আচারপন্থীদের বিদ্রূপ ও উপহাসের পাত্র হয়ে পড়েন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্যাতিতও হন।

সাধারণের বিদ্রূপ ও তীব্র সমালোচনার হাত থেকে হুসাইনও রেহাই পান নি। কিন্তু বিরোধিতা ও বিরূপতা যত বেশী প্রবল হয়েছে, প্রিয়তমের সন্ধানস্পৃহা তাঁর তত বেশী অদম্য হ'য়ে উঠেছে। বিরহ-কাতর মন প্রিয়তমের জন্য আরও গভীরভাবে সন্ধানপর হয়েছে।

রব্বা মোর অগণ চিট্‌ না ধরীঁ
অগণ হারি কো গুণ নায়ি অন্দরেঁ, ফযল করীঁ
দুনিয়াঁ বালিয়াঁ নুঁ দুনিয়াঁ দা মানা
নংগাঁ নুঁ নংগ ন্নোঈ,
না আঁসী নংগ না দুনিয়াঁ বালে সানুঁ
হাস দি জনী কনী
কহে হুসাইন ফকীর সাঁঈ দা সাডি,
ভাচে নাল বণী।

রাব্বি আমার দোষ ধরিও না, দোষভরা আমি গুণহীন
অন্দর থেকে দেখাও করুণা আলোক আমি যে অর্বাচীন।
দুনিয়াদারীর কাছে দুনিয়ার গর্বফকর অহংকার,
যে জন নাংগা সংসার-ত্যাগ এই জীবনের পর্দা তার।
বৈরাগী নহি সংসারী আমি তাই যদি হাসে যে সাধারণ,
কহিছে হুসাইন খুদার ফকীর, বন্ধু আমার ভীষণ জন।

ভীষণ জন, ভয়ঙ্কর যিনি, অসাধারণ বন্ধুত্ব তাঁরই সঙ্গে। আল্লাহ্‌র রহমত ও মাগফিরাতের সঙ্গে সাধক তাঁর আঘাতকেও কামনা করেন। কারণ একদিকে তিনি যেমন সুন্দর করুণাময়, অন্যদিকে তিনি তেমনি অদম্য ভয়ঙ্কর ও রুদ্র-ভয়াল (জব্বার, কাহ্‌হার, শদীদুল ইকা'ব) আর প্রেমের দায়ে সাধক তাঁর নির্মমতাকেও ভালবাসেন, কারণ প্রিয়তমের দেয়া আঘাতও তাঁর প্রেমের মতই মধুর ও বরণীয়। (দ্রষ্টব্য : রুমীর—

প্রিয়তম এখন আমি একা
আমার বুকের পাঁজরগুলি ভেঙে দিয়ে
নির্মমভাবে তোমার রথ চালিয়ে যাও।
তোমার আঘাত যে আমার মধুর লাগে।)

সাধকদের জীবন-ধারা স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ নতুন ও সাধারণের অপরিচিত খাতে প্রবাহিত। তাই তাঁরা সাধারণের সন্দেহ ও পরিহাসের পাত্র হয়ে

পড়েন। কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্ব এমন একজনের সঙ্গে, যিনি সাধকদের অপমানে রুদ্র-ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেন।

হুসাইন প্রধানত বিরহের কবি। বিচ্ছেদের সাধনা তাঁর সাধক-জীবনকে এত ব্যাকুল ও বিহবল করে তুলেছে যে, তিনি মিলনের কথা বিস্মৃত হয়েছেন। বিরহের তীব্র বেদনাবোধ তাঁর চিত্ত গভীরভাবে আলোড়িত করে। এই আলোড়নের মধ্যে তিনি অধিক আনন্দ লাভ করেছেন। প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের কামনা তিনি করেন নি, তাঁর কারণ প্রিয়তমের সাক্ষাতে যে তাঁর জীবন-সাধনা ও ব্যক্তিসত্তার পরিসমাপ্তি, তাঁর সুদীর্ঘ বিরহ রাত্রির চির অবসান। তাই তাঁর প্রেমার্ত চিত্তের বেদনা ও আবেগ মর্মস্পর্শী ভাষায় করুণ রস-ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়েছে। মিলন তাঁর জন্য নয়, তিনি বরণ করে নিয়েছেন অনন্ত দুঃখ ও প্রয়াস। যতক্ষণ তাঁর এই দুঃখ এবং ব্যবধানের দূরত্ব ও পীড়ন, ততক্ষণ তিনি স্বতন্ত্র, তিনি প্রেমিক। প্রেমিকের এই গৌরব ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নিয়েই তাঁর মহিমময় সত্তা। কিন্তু আত্মনিমজ্জনে, প্রিয়তম মিলনে বা নদী-সমুদ্র-সংগমে তাঁর সকল সত্তার অবসান। তাই তিনি খুঁজেছেন, সারা জীবন দিয়ে প্রিয়তমকে খুঁজেছেন, হয়তো বিদেহী জীবনের লোকালোকেও তিনি তাঁকে খুঁজবেন। বিরহ ও সন্ধানপরতার সাধনায় হুসাইন যে স্বাতন্ত্র্য ও বলিষ্ঠ আত্মনিবেদনের পরিচয় দিয়েছেন, আর কোনো সূফী-সাধকদের জীবনে তা প্রায় দুর্লভ।

সজ্জন বিন রাতাঁ হোইয়াঁ বাড়্ডিআঁ।
মাঁস ঝ'ড়ে ঝ'ড়ে পিংজর হোইয়া কংকন গেইআঁ হাড়্ডিয়াঁ।
ইশক ছুপদা নাহীঁ বিরহোঁ তণাভাঁ গড়্ডিআঁ।
রাঁঝা যোগী মাঈ যোগিয়াণী মাইঁ কে করছড্ডিআঁ।
কহে শাহ্ হুসাইন ফকীর সাঈঁ দা তেরে দামন লগ্গেইআঁ।

সজ্জন (বন্ধু) বিনে রাতগুলি মোর হলো যে হায় দীর্ঘতর
মাস ঝরে গেছে কংকাল দেহ, হাড়ে কংকন মর্মে-মরো।
ইশক্ রহেনা ছুপায়ে যখন বিরহ ফেলেছে তাঁবু যে তার
রানঝা যে যোগী আমি যে যোগিনী কি করেছে আহা সে যে
আমার।

হুসাইন কহিছে খুদার ফকীর
ধরেছি বসন-প্রান্ত তাঁর।

হুসাইনের কাফিয়াঁ পঞ্জাবী মুসলমান ও শিখ এবং সকলের হৃদয় গভীর-ভাবে স্পর্শ করেছে। শিখদের নিকট তিনি সাধক শাহ্ হুসাইন নামে পরিচিত। শিখ সাধকগণ তাঁদের জীবন ও কার্যে শাহ্ হুসাইনের জীবন সাধনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

বিরহ-কাতর ও প্রতীক্ষারত ছিল তাঁর জীবন। সে জীবনের স্বাদ কর্মক্লান্ত জীবনের ফাঁকে ফাঁকে আমরাও যেন গভীরভাবে লাভ করি।

শাহ্ ইনায়েত

আমাদের দুঃখ-তপ্ত জীবনের সঙ্গে তুলনা হতে পারে মরুভূমির। সাধক-সজ্জনদের প্রশান্ত ও পরিতৃপ্ত জীবন সেই মরুভূমির মধ্যে [illegible] করে মরূদ্যান। বৈশাখের উষ্ণতপ্ত দিনের মতোই জীবনের দিনগুলি রুক্ষ ও তৃষ্ণার্ত। অতৃপ্ত জীবনের দুর্বিষহ ভার বহন ক'রে আমরা চলি, সম্মুখে অসংখ্য মৃগ-তৃষ্ণিকা। অকস্মাৎ এক সময়ে এসে উপস্থিত হই মরূদ্যানে। সেখানকার গভীর তৃপ্তি ও ছায়া-শান্তির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে জীবনের অবাঞ্ছিত রূপ ভুলে যাই, ভুলে যাই ক্ষণকালের জন্য যত অন্ধতা ও লোলুপতা অর্থাৎ জীবনের নির্লজ্জ ও নগ্ন রূপটি।

সাধক কামনা করে 'আনো তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গ-সুধা, বিরহিণী চাহিয়া আছে আকাশে'। আমাদের প্রার্থনা : আরো সুখ, আরো সম্পদ ও স্বার্থের পরিতৃপ্তি। কিন্তু তৃপ্তি আসে না, আসে অতৃপ্তি, জীবনভরা অসন্তোষ। সাধকের জীবন তদ্গত, তাই অফুরন্ত করুণা-বর্ষণের ধারা তার জীবনকে সিক্ত, শান্ত ও পরিতৃপ্ত করে। সে বর্ষণ অযাচিত, অবারিত ও অবিশ্রান্ত। কিন্তু আমরা আবদ্ধ অসংখ্য ভাবনা-বাসনা ও লক্ষ কামনার এবং ভোগ-সর্বস্ব খণ্ডক্ষুদ্র জীবনের অচলায়তনের মধ্যে। সাধকের জীবন তাঁর ব্যাপ্তিতে সমগ্র, পরিপূর্ণ। তাই তাঁর জীবন দিগব্যাপ্ত ও অনন্ত প্রসারিত। হ্যাঁ, এই ব্যাপ্তি ও প্রসারণ আমাদের জীবনেও সম্ভবপর। কিন্তু সেজন্য ব্যাকুলতা আছে কি ? আত্মবিলয়ের অর্থাৎ আত্মসুখের বিলুপ্তি সংঘটনের সাহস আছে কি ? আপনার ছোট 'আমি' কে মুছে ফেলুন, দেখবেন বড় 'আমি' বিরাটের সঙ্গে অতি সহজেই যুক্ত বা সন্নিকট হয়েছে। বড় কাছে এসে গেছে।

কী প্রয়োজন এই 'আমি'কে নিয়ে ? 'আমি'র ভার তো অনেক দিন বহন করেছি। এখন নিমজ্জিত হই সেই বিরাট 'আমি'র সাগরে। হ্যাঁ, তা'তে তৃপ্তি আছে, আর আছে অমৃতের আস্বাদ। সে স্বাদ কেমন ? কথায় বোঝানো যায় না। সেই স্বাদ লাভ করেছিলেন একদিন শাহ্ ইনায়েত।

শাহ্ ইনায়েত ১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দে লাহোর জেলার কাসুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন বাগবান। কথিত আছে, তিনি নিজেও লাহোরের

শালিমার বাগের প্রধান বাগবান ছিলেন। অবশ্য সাধকরা মূলে বাগবান স্বভাবের। তাঁদের প্রকৃতি সুন্দর, প্রিয়তমের যা কিছু মধুর ও সুন্দর তাই চয়ন করা ও চোখ ভরে দেখা। শাহ্ ইনায়েতের কিশোর জীবনের বিস্ময়ের কথা আমরা জানি। যেদিন কাশ্মিরী গুলাবের নধর-চিক্কণ গাছে প্রথম ফুল ফুটেছিল, সেদিন কিশোর ইনায়েত তা বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, আর ভেবেছিলেন, মাটির মলিন রসে অভিষিক্ত কাঁটাভরা ডালপালার ভিতর থেকে এমন অপূর্ব প্রসন্ন এই রূপের স্ফূর্তি হলো কি ক'রে? এই শোভা-সুষমার মূল উৎস কোথায়? জানি না, সেদিন তাঁর মনে আধ্যাত্মিকতা না দার্শনিকতা কোন্‌টা প্রবল হয়ে উঠেছিল! তবে মনে হয়, তাঁর কিশোর মন কতকটা অগোচরেই এবং অচেতন আন্তঃপ্রকৃতির প্রেরণা বশেই গুলাবের প্রস্ফুটিত রূপকে কেন্দ্র ক'রে অরূপকে স্পর্শ করতে চেষ্টা করেছিল। তাঁর মনের দিগন্তে যে আনন্দঘন রসের সঞ্চার হয়েছিল তা এই কথার জমাট রূপ দেখতে পাই :

> আমার কাননে এই গুলাবের সুগন্ধ সুরভি,
> এই যে প্রথম ফুল, তোমার রচনা যেন কবি।
> কে তুমি? জানি না, শুধু স্পর্শ-সুধা অন্তরে সঞ্চিত
> ফুলের, আমার বুকে। এত কাছে তবুও বঞ্চিত
> তোমার সুষমা থেকে। আজ শুধু চোখ চেয়ে দেখা,
> বিশ্বের লাবণ্য-কান্তি ভাবরস চিন্তা একা একা
> মনের গভীর দেশে, অনুভূতি এখনো অস্ফুট,
> তোমার করুণা মাগে চিনারের কচি পত্রপুট।

প্রথম জীবনের কথা। পরবর্তী জীবনে তাঁর এই পত্রপুট করুণা ও প্রেমের বর্ষণে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই এবং পত্রের বহির্দেশের উচ্ছলিত রসধারার সিঞ্চনেই তার প্রমাণ পাই।

শাহ্ ইনায়েত ছিলেন আওরঙ্গযিবের সমসাময়িক। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালের কতকাংশও তিনি দেখেছিলেন। যুগোপযোগী শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন। আরবী ও ফারসীতে তাঁর বিশেষ দখল ছিল। বাল্য-কাল থেকে তিনি মরমী ভাবাপন্ন ছিলেন। গুলাবের গন্ধে তাঁর মনের দল মেলতে শুরু করেছিল। সে কালের বিখ্যাত সূফী ও সাধক-মনীষী মুহাম্মদ আলী রযা শত্তারীকে তিনি মুরশিদরূপে গ্রহণ করেন। এর পরই

তিনি কাসুর থেকে লাহোরে এসে বসবাস করতে থাকেন। এই জন্মভূমি ত্যাগের পিছনে হয়তো মুরশিদের নির্দেশ ছিল।

পঞ্জাবের কাদিরীপন্থী সূফিগন দার্শনিক তত্ত্ব-ব্যাখ্যা ও আলোচনার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁদেরই প্রভাবে দারা শিকোহ্ কাদেরী-সুফী মত-বাদের ভক্ত হয়ে পড়েন। শাহ্ ইনায়েত এই পন্থার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। হিন্দু দর্শন ও যোগ-সাধনও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। প্রাচীন হিন্দু সাধকগণ কিরূপে এবং কি কি প্রক্রিয়া অবলম্বনে মুক্তি লাভ করতেন, সেই বিবরণ আমরা তাঁর বিখ্যাত 'দসতুর-উল আমল' গ্রন্থে পাই। এই গ্রন্থে সাতটি পন্থার উল্লেখ আছে। তাঁর মতে শেষ পন্থাই অধ্যাত্মলোকের পরমহংস স্তর লাভের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই গ্রন্থ ছাড়া তিনি সুফী মতবাদের বিশ্লেষণ ও ক্রমোন্নতির ধারা পরিচয় দিয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা ক'রে গেছেন। তার মধ্যে 'ইসলাহ্-উল-আলম' 'লতায়িফ গাইরিয়া', 'ইর-শাদ-উল তালিবীন' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুরআন শরীফের একটি তফসীরও তিনি রচনা করেন। শাহ্ ইনায়েতের নিজস্ব একটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। শিখ আমলে চারদিকে যে দাবানল জ্ব'লে ওঠে, তারই গ্রাসে তা ভস্মীভূত হয়ে যায়। শিখরাই এজন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী বলে অনেকে মনে করেন।

১৭৩৫ সালে শাহ্ ইনায়েত ইন্তিকাল করেন। তাঁরই ভাবরসে উচ্ছ্বসিত হয়ে বুলেহ্ শাহ্ তাঁর বিস্ময়কর কাব্য-গাঁথা ও সঙ্গীত রচনা করেন। শাহ্ ইনায়েতের নিকট তাঁর ঋণের কথা তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন--

'বুল্লেহ্ শাহ্ দি সুনো হাকায়েত
হাদী পাকড়িয়া হোগ্ হাদায়েত
মেরে মুরশিদ শাহ্ ইনায়েত
উহ্ লংঘাই পার।'

ভাষা পঞ্জাবী হলেও সরল প্রকাশের জন্য তার অর্থ বেশ স্পষ্ট।

শাহ্ ইনায়েত বন্দনালোকে প্রেমের যে রস-বর্ষণ করেছিলেন, বিরহ মিলনের অশ্রুতে অনুসিক্ত হয়ে তা বুলেহ্ শা'র কাব্য ও জীবনকে প্লাবিত করে। সে প্লাবন এখনও অব্যাহত চলেছে ভক্তের মনে, রসপিপাসু কবি-সাধকের চিত্তে। সেই 'তোমারি ঝরনা তলার নির্জনে' বসে আমরা তার রস-প্লাবনের অফুরন্ত ধারায় অবগাহন করি। চারদিকের তিক্ততা ও রুক্ষতার মধ্যে আমরা চাই শুধু একটু শীতলতা ও আনন্দ-আশ্রয়, মরুর মধ্যে একটি ছায়া-মধুর মরূদ্যান।

সুলতান বাহু

মিসটিক কবি সুলতান বাহু পূর্ব ও পশ্চিম পঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ মরমী সাধক-দের অন্যতম। শুধু তাই নয়, সমগ্র উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও সুফী-সাধকরূপেও তিনি সর্বজনস্বীকৃত। সুলতান বাহু (باهو) সে-সাথী। আল্লাহু উচ্চারণের শেষের দীর্ঘ-বিলম্বিত 'হু' সুফী-সাধকদের অত্যন্ত প্রিয় ও মধুরতম ধ্বনি। তা ছাড়া শুধু শব্দটিও সর্বনামের 'সে' প্রিয়তমকে বোঝায় এবং কুরআন শরীফের কয়েকটি আয়াতে শুধু (هو) শব্দ-টির দ্বারা আল্লাহ্‌র কথা বলা হয়েছে---যেমন হুয়াল্ লাহুল খালিকুল বারীউল মুসাওবেরু ......। ১৬৩০ সালে আভানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৬৯১ সালে (হিজরী ১১০২ সালের জমাদিউস্ সানি মাসের প্রথম শুক্রবার সকালে।) সুলতান বাহুর পিতা পশ্চিম পঞ্জাবের ঝাং জেলায় শোরকোট শহরের অধিবাসী হন। তিনি অতি শান্ত ও ধীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। বাহুর মাতা বিবি রাসৃতি কুদহস্ সারাও * ছিলেন এক স্থির গম্ভীর ও উদার প্রকৃতির মহিলা। সুলতান বাহুর বাল্যকাল সম্বন্ধে বহু বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক ঘটনার উল্লেখ আছে। বাল্যকালেই সুলতান বাহু এরূপ এক নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন যে, তাঁর মুখমণ্ডলের চারধারে সর্বদা একটি জ্যোতির দীপ্তি উজ্জ্বল ও প্রসারিত হয়ে থাকতো। যখনই কোন হিন্দু সেই আলোকদীপ্তি দর্শন করতো, তখনই সে নিজের সব কিছু ভুলে আপন ধর্ম বিসর্জন দিয়ে মুসলমান হতো।

গৃহেই সুলতান বাহুর শিক্ষা শুরু হয় এবং এই শিক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তাঁর মাতা। মাতার আদর্শ ও সত্যনিষ্ঠা এবং সার্থক সাধক জীবন তাঁর উপর এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। পুত্র-কন্যার পিতা হয়ে তিনি মাতাকেই পীর বা মুরশিদরূপে গ্রহণ করতে আগ্রহী হন। কিন্তু মাতা রাজী হলেন না, কারণ ইসলামে নারী কখনও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মুর-শিদের স্থান অধিকার করতে পারে না। মায়ের নির্দেশে তিনি বাগদাদের হযরত হাবীবুল্লাহ্ কাদিরীর নিকট গমন করেন। বাগদাদ (ইরাকের বাগদাদ নয়) রাভী নদীর তীরে অবস্থিত একটি গ্রাম। কিছুদিন পর

---

* একটি ফারসী কবিতায় সুলতান বাহু বলেছেন : রহমতে হক বারুরা ওরা রাসাতি রাসতি বা রাসতি আ- রাসতি।

মুরশিদকে কারামতে (অলৌকিক শক্তিতে) পরাজিত ক'রে অন্য মুরশিদের সন্ধানে দিল্লী হাযির হন। সেখানে তিনি পীর সইয়িদ আবদুর রহমানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পীর আবদুর রহমান সম্রাট শাহ্জাহানের একজন মনসবদার হলেও এক অনন্য আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। পীর সুফী আবদুর রহমানের নিকট বাহু তাঁর প্রার্থিত আত্মিক শক্তি ও সম্পদ লাভ করেন।

মৃত্যুর পর চিনাব নদীর অনতিদূরে কাহার জানানে তাঁর সমাধি রচিত এবং কিছুকাল পর চিনাবের গতি পরিবর্তনের ফলে এই রওযা বিধৌত হয়। ১৭৭৫ সালে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। এক অলৌকিক উপায়ে সুলতান বাহুর লাশ উদ্ধৃত এবং একটি শিমূল গাছের নীচে সগৌরবে সমাধিত হয়।

সাধক সুলতান বাহু আরবী ও ফারসী ভাষায় একশ' চল্লিশটি পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকগুলোর মধ্যে ত্রিশটি গ্রন্থ অদ্যাপি বিদ্যমান। 'আবিয়াত' পঞ্জাবী ভাষায় রচিত তাঁর একমাত্র কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটির সম্পূর্ণ নাম 'মজমু'আ: আবিয়াত সুলতান বাহু পঞ্জাবী'। ঝাং জিলায় প্রচলিত (অধুনা সচরাচর ব্যবহৃত হয় না) পঞ্জাবী উপ-ভাষায় রচিত আবিয়াতে ১৭৯টি সি-হারফি বা চতুষ্পদী কবিতা রচিত। আবিয়াত সূফী সুলতান বাহুর স্মৃতি ও সার্থক মরমী সাধনাকে চিরস্মরণীয় করে তাঁকে সকল কালে সূফীদের মধ্যে এক গৌরবময় আসন দিয়েছে। সুলতান বাহু কাদিরীয়া তরীকার অনুসারী বা ভাবপন্থী ছিলেন। সূফী ও মনীষী-শ্রেষ্ঠ হযরত আবদুল কাদির জিলানীর মুরশিদরূপে সাধককে আধ্যাত্মিক পথ-প্রদর্শকের কথা আবিয়াতের বহু স্থানে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। সূফী-সাধকগণ আল্লাহ্কে হুয়া বা শুধু 'সে' নামে ডেকেছেন। সাধক বাহু তাঁর কবিতার প্রতি চরণের শেষে এই হুয়া এবং আল্লাহ্র শেষে দীর্ঘ বিলম্বিত ধ্বনি 'হু' ব্যবহার করেছেন। 'আবিয়াতে' মূল সিহারফি থেকে কয়েকটি কবিতার অনুবাদ উদ্ধৃত করছি ঃ

চে---চাড় চান্না তু কর রোশনাঈ
কারেঁদে তারে হু।
তেরে জীহে চান কাইসে চাড়দে সানুঁ
সাজ্জানাঁ বাঝ আনধেরা হু।
জিত্তে চান আসড়া চাড়দা উঠি

কদর নাহিঁ বুঝ তেরা হূ।
জিসদে কারণ আসাঁ জনম গাবায়া
বাহূ ইয়ার মিলি ইক বেরি হূ।

চাঁদ ওঠে দেয় আলো বিস্তর
তারাদের চোখে লাগায় ধাঁধা ওগো সে
এমন হাজার চাঁদ উঠলেও
প্রিয়তম বিনা আকাশ আঁধার ওগো সে।
মোর চাঁদ ওঠে, তোমার অভাব বাজে না তো বুকে
পূর্ণ চাঁদ ওগো সে।
বাহূ বন্ধুর জন্যে জীবন হারায়ে মিলবে
তাঁহার প্রসাদ ওগো সে।

সিহারফির কাব্যিক ও আধ্যাত্মিক ভাবরসের বেশ একটি আচ্ছন্নতা ও সম্মোহন আছে। তাই আলিফ থেকে ইয়ে পর্যন্ত গুচ্ছভাগের কিছু কবিতার অনুবাদ ভক্তমনের আনন্দ নিবেদনরূপে পেশ করলাম। প্রতি পঙক্তির শেষে হূয়া অর্থাৎ 'ওগো সে' উচ্চারণ করতে হবে; তা হ'লে অনুবাদে ঐ শব্দটির পুনরাবৃত্তির আর প্রয়োজন হবে না।

আলিফ ঃ

আল্লাহ্ সে যেন চাম্বেলি লতা
মুরশিদ মনে রোপণ করে
'হাঁ' ও 'না' এভাব পানির মতন
চলাচলে দেহ-সত্তা ভরে।
গন্ধে ও বাসে মৌসুম আসে
ফুল ফোটা শুরু নিরন্তর
মুরশিদ হোক চিরজীবী, বাহূ
সে যে শিল্পী ও সুষমাকর।
আহাদের দেখা এক নিমিষের
'আমি' থেকে তাই উত্তরণ,
সঙ্গ-মিলন, যাত্রা এ দেহ
আত্মা ও প্রেম হৃদয়-মন।
স্থান ও সময় সকল সৃষ্টি
সেই জালোয়ায় নিমজ্জন

মূলে মূলে এক ওহাদাতে তার
এমনি শিল্প-সংরচণ।
কোথায় তাহার সন্ধান করো
ভিতরে এবং বাহিরে সেই
তার ভালবাসা বেড়ে চলে সদা
প্রতি নিশ্বাস আবর্তেই।

আমি যে তাহার উজ্জ্বলতর
তার আলো যেথা অন্ধকার
নিমিষে উধাও তোমার গোলাম
এ দুই জগৎ পূর্ণতার
সাধনা তোমার সত্তায় হু সে
সর্ব অঙ্গ সঙ্গ তার।

বন্ধু এসব অন্তের লীলা দেখেছি
আদি ও আবর্তন,
সকল বিশ্ব কেন্দ্রবিন্দু
আতশে জ্বালাও অনুক্ষণ
তাপসীর কোণ, সত্য সর্ব অতিক্রমী ও
তোমাতে লীন
এ জগত আর অদৃশ্য লোক ওহাদাতে
যবে সত্তাহীন
প্রেমিকজনেরা, তাদের ভাগ্য
তারা উজ্জ্বল আজ রঙিন।

এ দুনিয়া এক অপরিচ্ছন্ন নারী
যে কখনো রহে না সাফ
এ নারীতে বিয়ে করবে সূফীরা
সম্ভব নয় করবে মাফ।
ধিক সে চেষ্টা দুনিয়ার প্রেম
তার থেকে রাখে অনেক দূর
আল্লাহ্‌র কথা চিন্তা-স্মরণ ভুলায়
তাহার ভাব মধুর।

বুদ্ধিমানেরা খোলাখুলিভাবে তালাক দিয়েছে
তিন তালাক
ভ্রষ্টা নারীতে---তাকে বিয়ে বাহ্‌
রুজুর চিন্তা দূরেই থাক।

বে :

বিসমিল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌র নামে
অমূল্য সেই অলঙ্কার
শাফায়াতে নবী মুক্ত করবে
সকল কালিমা মৃত্তিকার
তাহার দোয়ায় কিছু বরকতে
আমি হবো তার অংশীদার
জীবন আমার কুরবান বাহ্‌
নবীর রহম নিত্যকার।

পে :

জ্ঞানের গ্রন্থ পাঠ ক'রে ক'রে
তৃপ্ত হয়েছো? বৃথাই যায়
ফুটন্ত দুধে মিলে না মাখন
গাঁজানো কিংবা অন্যথায়।
শস্যের মূল খুঁটে খুঁটে খেয়ে
কি লাভ হয়েছে পাখি তোমার
ভগ্ন হৃদয় রাখী রাখো তাতে
ইবাদতে লাভ বারংবার।

হাজার কিতাব পড়ে
জ্ঞানিগণ যশ খ্যাতি গায় নাম প্রচুর
পড়ে একটি প্রেমের হরফ
জানে না সর্বনামের সুর
আশিকের এক নিগায়
লক্ষ হাজার মানুষে
পেয়েছে ত্রাণ
আলিমের কোটি দৃষ্টিতে কারো
মুক্ত হয়নি বদ্ধপ্রাণ

তে ঃ

গভীর সাগরে সাঁতার তাদের
জীবনের তরী তাওয়াক্কাল
দুঃখের বুকে সুখের জন্ম
সমান বিরাগ সকল কাল।
আল্লাহ্‌র কথা সুখ ও দুঃখ
চক্রের তালে বর্তমান
পরোয়া করো না ডাকো নাহি ডাকো
তাকে কর তুমি হৃদয় দান।

ছে ঃ

শুদ্ধ চিত্ত পবিত্র মনে
অন্তর দিয়ে অগ্রসর
তাঁর খোঁজে হও সাক্ষাতে
চিরকালের জন্য সু-তৎপর।

প্রতি মুহূর্তে যিকরে তাহার
রোমাঞ্চে জাগে চুলের মূল
প্রশংসা গানে ঐক্যের তানে
স্মরণে সবাই হয় আকুল।

জিম ঃ

শাশ্বত প্রেম মিলেছে যাদের
মুখে নেই কথা আড়ম্বর
গভীর ধেয়ানে তন্ময় তারা
স্মরণে গোপন হৃদয়চর।
নিশ্বাসে আর প্রশ্বাসে চলে
হামেশা যিকর সঙ্গোপন
আত্মরতির গূঢ় তত্ত্ব
তাহাদের জানা সরাগ মন।

চে ঃ

আকাশের তারা গান করে তুমি
শুনতে কি পাও নিরন্তর?

চাঁদ জাগো জাগো পূর্ণ আলোকে
একাকী ক্লান্ত পথিকবর।
রুবি ব্যবসায়ী চলেছে তাদের
পরনে বুঝিবা ছদ্মবেশ
একটি পালক তোলার শক্তি
নেই যাহাদের নিরুদ্দেশ
হওয়া ভালো বাহ্ ত্বরা ক'রো নাকো
যাত্রায় চলা অগ্রসর
কারণ আত্মা নীরবে তাহার
অভিসারে চলে দেশান্তর।

হে ঃ

হাফিযের বুকে গর্ব কারণ
সিদ্ধি লভেছে মর্তে তাই
মোল্লারা তার প্রতিযোগিতায়
অহঙ্কারের অন্ত নাই।
কেতাবের জ্ঞান বাহিরে দেখায়
মৌসুমী মেঘ অন্ধকার
তঙ্কা তাদের মিলছে অনেক
প্রচুর এবং বারংবার।
দীর্ঘ কিরাত প্রশস্ত পাঠ
তাহারা হারায় দুই জগৎ
পথিকের জ্ঞান অন্তর-ধন
শুক্তির বুকে মুক্তাবৎ।

খে ঃ

সূফীর তরীকা জানে না সকলে
যখন তাহারা লাগায় দিল
হৃদয়ের কায়-কারবার বোঝে
খুঁজে পায় প্রিয়তমের মিল।
তাহারা যেন সে মাটির পাত্র
কুমারের গড়া কলা-কুশল

লাল-জওহর মর্যাদা তার
বুঝবে কি ক'রে বলদ দল।
গো শকট নিয়ে ব্যবসা যাদের।
বিশ্বাসী যারা ঈমানে ঠিক
মরবে মরমী পথের চলায়
সেই রহস্যময়ের দিক।

দাল ঃ

এই যে হৃদয় সমুদ্র যেন
তারো চেয়ে তল অন্তহীন
তার গতি পথ কেহ জানে না তো
কোথা কোন্ দিকে অন্তে লীন।
কত ঝড় সেথা বন্দরগাহে
নিরাপদে তবু নৌ-বহর
ভয়-ভীষণা সে তরঙ্গদলে
পোত চলে শত নিরন্তর।
চোদ্দ তবক সৃষ্টির যেন
তাঁবুর মতন বেঁধেছে সার
দিল চিনে নাও বাহ্ সেই জানে
তোমার প্রভুকে সত্যকার।
আমার সকল সত্তা যদিও
অতি সকাতর বেদনাময়
তবুও আর্ত চিৎকার করা
কখনো আমার কাম্য নয়।
তারা কি বুঝবে আমার এ হাল
জীবন যাদের হাড় ও মাস।
প্রেম-সমুদ্র ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ
সেও আমাকে করেছে গ্রাস।
আমাকেই একা, কি ক'রে তাঁহার
সম্মুখে যাবো শুধু যে নাম
নাম ডেকে তাঁকে কি করে মিলবে
বুকে যদি তাঁকে নাই পেলাম।

যাল ঃ

যিক্‌র ফিক্‌র গভীর এবং
সর্বদা তাঁর স্মরণ তায়
যথেষ্ট নয় কুরবান আর
আমি-কে তথাপি মোছা কি যায়।
শূন্য এবং গগনচারীর
ভাগ্য বিদ্ধ প্রেমের তীর
এবং তাহার তিক্ত স্বাদের
দুঃখ ব্যথার অমিয় নীর।
বাহ্‌র যিক্‌র হূ হূ হূ
চলে সর্বদা বুকের মাঝ
প্রিয়তম তাতে প্রলুব্ধ নয়
ভোলে না তাহাতে প্রাণের রাজ।

রে ঃ

রাত্রে খোয়াব নিদ্রাও নেই
দুর্লভ তাহা কাটে যে দিন
হয়রানিতেই বিস্ময়ে জানি
সূফীদের কথা মন রঙিন
একে অন্যকে জানে ভাল ক'রে
দুনিয়াদারির জন্যে নয়
মরমীয়াবাদ, তাঁর উদ্দেশে
হও রত সেই বন্ধুময়।
যৌবনে হ'লো কত অপচয়
বাহূ পাবে তার দিদার ঠিক,
জীলানী আমার পীর মুরশিদ
চালিত সত্য পথের দিক।

যে ঃ

ধামিক যারা ক্লান্ত রোযায়
নমাযে এবং প'ড়ে নফল
আত্ম-প্রবঞ্চনায়। 'একে'র
নদীতে তৃপ্ত আশিকে দল

গভীর সাঁতারে ডুবে থাকে তারা
তাহার যত্নে চিরন্তন
ঈগলের হাতে পড়ে না তাহারা
মধুর ফাঁদেও নিমজ্জন
মৌমাছিদের মতন হয় না।
নবীজীর যত প্রেমিকজন
জানে ইশ্‌কের তত্ত্ব গোপন
স্তরে স্তরে ক্রমে উত্তরণ।

মোই :

সে আমার জাগে দু'আঁখির আগে
সে আছে আমার ভরে হৃদয়
ছিন্ন যখন হই তাঁর থেকে
ঘুরে ফিরি একা জগৎময়।
আধা অন্ধেরা গালাগালি দেয়
তারস্বরে তারা শুধু চেঁচায়।
আমি পাই খুঁজে অন্তরে যাঁকে
প্রেমের মধুর মূর্চ্ছনায়।

আইন :

ইশকের বুকে যুক্তির স্থান
নাইকো তর্ক কথার জাল
ওহাদাত এক গোপন শুদ্ধ
পবিত্রতম প্রাণের লাল।
মুল্লা এবং পণ্ডিত জন
জ্যোতিষ পায় না নাগাল তার
ব্যর্থ তাদের সকল চেষ্টা
বৃথাই বহন গ্রন্থভার
আহাদ এবং আহমদে শুধু
মিমের ফারাক ভিন্ন নয়
দুইয়ে মিলে এক ঠিক জানে বাহু
নইলে ভুবন বিষাদময়।

প্রেম নিয়ে গেছে আসমান ছেড়ে
মহাসুন্দরের আরশ তক
দুনিয়া তোমার কান্না থামাও
ভাগ্যের লেখা হোক দ্রাবক
ভবিষ্যতের। প্রিয় গৃহবাস
থেকে আছি আজ অনেক দূর
দূর ব্যবধানে, পরদেশী হ'য়ে
শত কামনায় লোভে আতুর।
বাসনা মুক্ত মৃত্যুর আগে
মরণেই বাহু হয় নাজাত
তাঁর নূরে নূর সাক্ষাৎ আর
নয়নের বুকে নয়ন পাত।

গাইন ঃ

প্রেমের প্রবেশ তাহাদের হাড়-মজ্জায়
মাসে নিবিড়তর
নির্বাক তারা শব্দ বিহীন
বোবা হয়ে তারা দুনিয়াচর
ভাবে-ভঙ্গিতে কথা বলে তারা
লক্ষ্য জিহবা কেশের মূল
প্রার্থনা করে অবিরাম তাকে
প্রেমের আবেগে হয় আকুল।
স্নান করে তারা একের সাগরে
সালাত কবুল বাহু যে তাই
চিনেছি তোমাকে তুমি ছাড়া আর
দরদী বন্ধু কোথাও নাই।

ফে ঃ

হামেশা যিক্‌র স্মরণে তাঁহার
আত্মরক্ষা হবে তোমার
সেই তরবারী রক্ষা কবচ
সব চেয়ে তাই তীক্ষ্ণধার,

ধ্যানের চেয়েও স্মরণ মধুর
রাত জাগরণ তাও মলিন
তাঁর মধু নামে জীবন ধন্য
দিনগুলি তার রঙে রঙিন।
প্রেমের নিকট বিশাল পাহাড়
পর্বত করে নতি স্বীকার
প্রেমিক মগ্ন কলেমার পাঠে
বাহু সেই হবে জপ তোমার।

কাফ ঃ

হৃদয় না যদি থাকে তবে এই
যিকরে কোনই ফায়দা নাই
স্মরণে এমন না যদি নাড়ায়
মুখে মুখে নাম জপ বৃথাই।
আত্মা এবং আন্তরিকতা
অথবা গোপন উচ্চৈঃস্বর
সব হয়রানি সে নাম স্মরণে
খুব কাছে আমি? হাস্যকর
তার থেকে আমি বহু দূরে আহা
তাহারাই সূফী সত্যকার
আনন্দলোকে বিচরণ, নাই
স্থান ও কালের তিলেক ভার।
কাঁদো কাঁদে আহা হৃদয় আমার
প্রেমিকের ঘন আর্তনাদ
দীর্ঘশ্বাস শুনবেন তিনি
বুক ভরা যে কী ব্যথা-বিষাদ।
হৃদয়ে তপ্ত অগ্নিচুল্লী
মশাল জ্বলে না কাঠ বিহীন
বেদনা অতীত শিখা যে তাহার
হয় না তো রঙে লাল রঙিন।

আগুন তোমার প্রিয় সাথী হোক
সারা দেহে তার দাহ ছড়ায়
জ্বলে পুড়ে যাও, চীৎকার তবু
দূর থেকে যেন শোনা না যায়।

গান ঃ

আল্লাহ্‌র ছায়া বনবীথি সম
সত্যের মূল গভীরতর
রহস্যময় গনদম খেয়ে
বন্দীর দশা নিরন্তর।
ছটফট করি পাখা ঝাপটাই
বুলবুল আমি মুক্তি চাই
তাহার মতই দিন গুণে যাই
আশা আছে বুকে ভরসা তাই।
বিশ্রাম নাই হৃদয়ে আমার
সব আরামের নির্বাসন
তাকে জয় করো বাহু নিশ্চিতে
সেই যে তোমার আপন জন।
নকশী কন্থা গেরুয়া কাপড়
পরনে কাটায় আশিক জন
গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে যায়
চঞ্চল করে সকল মন
প্রেম যে তাহার। লোকে ভাবে বুঝি
অমঙ্গলের হয়েছে ভর।
ভিতরে দারুণ অগ্নির দাহ
তাপে জ্বলন্ত নিরন্তর।
সারা রাত আহা বিনিদ্র কাটে
বাহু জেনো সব প্রেমের দায়
হাড় থেকে মাস ঝ'রে পড়ে থাকে
কঙ্কাল সে কী দৃশ্য হায়!

গনদম—নিষিদ্ধ ফল

লাম ঃ

লিখতে শিখেছো ? লিখবে কি আর
শুধু অপচয় কাগজ-শ্রম
খাকের কলম ধরতে জানো না
কি ক'রে বানায় তার নিয়ম।
তবুও লেখক নামে পরিচিত
আসল কাতিব কাটবে সব
লিপিকার লেখা জুড়ে দেবে শুধু
আলিম মিমের রূপ নীরব।
দুই বর্ণের লেখাই শ্রেষ্ঠ
আল্লাহ্ এবং মুহম্মদ
রেহাই মিলবে দূর হয়ে যাবে
সংশোধনের সব বিপদ।

মিম ঃ

মৃত্যুর আগে 'আমি'র মৃত্যু
প্রেমিক জীবন অমর তাই
মৃত্যু-মিলন অর্থ একই
তাঁর সাথে যদি মিশেই যাই।
তখন সে আর আমি অদৃশ্য
নিকটে যাওয়ার লোভানি নাই
আপনাকে ভুলে একাত্মতায়
আমাকে তোমাকে একাকী চাই।
মাশুকের প্রেমে আগুন জ্বলছে
সে আগুনে পুড়ে হয়েছি খাক
তাঁহার স্মরণে বিনিদ্র রাতি
একটু বিরতি নাইকো ফাঁক।
আমি ? কুৎসিত। আর প্রিয়তম
সুন্দর সে-যে তুলনাহীন।
তবে ? কোন্ বরে আমি জয় করি
হৃদয় তাঁহার আমি যে দীন।

হতভাগ্যের বাতায়নে চেয়ে
দেখে না, কারণ ছলাকলায়
সুদক্ষ নই। জানিনে কি করে
অজানা জনের মন ভুলায়।
রূপ-সুষমা ও দওলত নেই
আমাকে কি তাঁর সাথে মানায় ?
এতো যে দৈন্য প্রেম পরাহত
তাই বাহু দিন কেঁদে কাটায়।

নুন ঃ

পার্থিব সুখ বস্তুর লোভ
দমন করেছি ক্লান্তিহীন
তবুও কেঁদেছে চিশতী এবং
শায়খ-মাশায়েখ হয়েছে দীন।
দুনিয়াদারিতে বস্তুর চাপে
জীবন-তরণী হয়েছে ভার
ডুবন্ত তরী নিমজ্জমান
পৃথিবীর প্রেমে ওজনে তার।
এ দুনিয়া ছাড়ো প্রলোভন বাহু
বিলাস-বস্তু সংখ্যাহীন
সেই সোজা পথ বেহেশতী আলো
নিমিষে জীবন হবে রঙিন।
মুরশিদ আর তালিব যাহারা
সন্ধানী চির প্রেমের পথ
একাকী এবং কষ্টসাধ্য
দূর নভচারী মরালবৎ
সঙ্গীবিহীন। সন্ধিক্ষণে
বাঁক থেকে তার পৃথিবী দূর

শাওকে ইলাহি * গালিব এবং
অভিভূত করে প্রাণ আতুর !

দুনিয়ার প্রেম প্রতিবন্ধক
তাঁর প্রেমে যারা দগ্ধ হয়

মৃত্যু তাদের নিষ্কলঙ্ক
আনন্দ আর শান্তিময়।

রাত্রি বেলায় চিৎকার ক'রে
উচ্ছ্বাসে তাঁর নাম ডাকায়

কৃতিত্ব নেই চমকে দেওয়ার
তাদেরকে যারা নিদ্রা যায়।

অথবা শুষ্ক দেহে পার হওয়া
নদীবুকে খর স্রোতধারায়

কিংবা শূন্যে জায়নামাযের
বুকে বসে থাকা চোখ ধাঁধাঁয়—

অবাক যদিও হয় যত লোক
বাহ্ জেনো তাহা ভড়ং সব

মরমীয়া যোগ আল্লাহ্‌র প্রেমে
যুক্তি তর্ক সেথা নীরব।

ওয়াও ঃ

হৃদয়ের পীড়া কে সারাবে বলো
কলেমাই পারে করতে দূর

দুঃখ ও গ্লানি ধূলিবালি যত
মরিচায় ধরা সকল পুর।

কলেমা যে হীরা-লাল-জওহর
সুক্তির বুকে মুল্যবান

নিখুঁত মুক্তা পরিশুভ্রতা
অম্লান জ্যোতি দৃশ্যমান...

---

* শওকে ইলাহী গালিব ঃ আল্লাহ্‌কে লাভের জন্য বিপুল আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা।

জীবন শুদ্ধ সদা পবিত্র
জীবনে অশেষ তৃপ্তি দান
এখানে ওখানে দুই জগতেই
কলেমা ব্যাপ্ত বিত্তবান।
হৃদয় আমার চঞ্চল বড়
ব্যথা-বেদনায় হলো রঙিন
সেদিন থেকেই কলেমা আমাকে
শিখায়েছে এই প্রেম যেদিন।
কলেমায় আছে চৌদ্দ তবক
ভিতরে কুরআন গ্রন্থসার
চিন্তার পুঁথি। খাগের কলম
তৈরী তবুও কলমকার
লিখতে পারে না ভণ্ড যে জন
মুরশিদ বাহু তাই শেখায়
কলেমা ছোট্ট ফলপ্রসূ তবু
স্বল্পে সহজ বিশালকায়।
আল্লাহ্‌র ঘর এ-তনু আমার
সূফী সেথা করো দৃষ্টিপাত
মানত করো না খাজা খিযিরের
তোমাতেই দেখো আবেহায়াত।
প্রেমের প্রদীপ অন্তরে জ্বালো
যেথায় অনেক অন্ধকার
হারানো জিনিস ফিরে পেতে পারো
এখানেই সেই অরূপকার।
মৃত্যুর আগে মরণ হয় সে
প্রার্থনা তাই সর্বথায়
তাদের জন্য 'রবে'র অর্থ প্রেম
কিছু নেই ভয় যে তার।

ইয়ে :

প্রিয়তমে তুমি নিশ্চয় পাবে
শির যদি রাখো বাজী তোমার
পরমতম সে সুন্দর অতি
তুলনা নেই যে কোথাও তাঁর।
আল্লাহ্‌র প্রেমে মস্তানা হও
মিশে যাও, সেই মধুর নাম
প্রতি দমে গাও হু হু সেই
জপের অন্ত নেই বিরাম
আর জাগরণ। প্রিয়তমে যবে
নিঃশেষ হবে নিমজ্জন
তাঁর সাথে বাহু সেই নাম নিও
তখনি অমর হবে মরণ।

বুলেহ্ শাহ্

পঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ মরমী কবি বুলেহ্ শাহ্ লাহোর বিভাগের কসৌর অঞ্চলের পানদৌকি গ্রামে ১৬৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মুগল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের স্বল্পস্থায়ী রাজত্বকালে ১৭৮৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। পঞ্জাবের 'রুমী' নামেই তিনি অধিক খ্যাত।

বুলেহ্ শাহ আমাদেরই লালন ফকীরের এক জ্ঞাতি-গোত্র, অবশ্য ভাবের দিক থেকে। এ কথাটি বলেছি ইচ্ছে করেই। এখন বস্তুবাদের যুগ চলছে। অর্থাৎ সব কিছুর মূলে আছে বস্তু। বস্তু আছে তা কে অস্বীকার করে? ধরুন, এই অভাজনের দেহে দু'মণ বস্তু আছে। সে সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত সচেতন, বিশেষ ক'রে তার সাম্য রক্ষার জন্য অন্তত পক্ষে আরও দশ মণ, দশ মণ কেন লক্ষ লক্ষ মণ বস্তুর সঙ্গে মুকাবিলা করতে হয়। বায়ুর চাপ এবং মাটির মাধ্যাকর্ষণ আছে। এ সবই আমি সাগ্রহে স্বীকার করি। তার পর দেখুন সৌরজগতের বাইরে থেকে যে সব বিশাল বস্তুপিণ্ড উলকা হয়ে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে, তাদের কারো কারো ওজন কয়েক টন পর্যন্ত হয়ে থাকে, আর সেগুলো লোহা নয়, পাথরের জিনিস। তা হ'লে বস্তু শুধু এই পৃথিবীতেই নয়, পৃথিবী তথা সৌরজগত ছাড়িয়েও যে বৃহত্তর জগত বিরাজ করছে, তাতেও বস্তু আছে। আবার দেখুন, আমার বাড়ীর দুয়ারে এক অখ্যাত কোণে একটি স্থলপদ্মের গাছ ডালপালা মেলে ক'দিন হলো অসংখ্য ফুলের পসার সাজিয়ে বসেছে। সে ফুলও বস্তু। শুধুই কি বস্তু? যে মুহূর্তে তা আমার মনে আনন্দ ও আবেগের সৃষ্টি করছে, সে মুহূর্ত থেকে তা আর বস্তু নয়, ভাব। এই ভাব থেকে জন্ম নিয়েছে একটি কবিতা, শুনুন—

> সংসারের টানাটানি এত আনি তবু শেষ নাই,
> অভাব ও অনটন, আরো চাই, আরো অর্থ চাই।
> আমি যে নাচার আহা এই কথা বোঝেনা তো কেহ,
> দিনরাত লিখে লিখে অবসন্ন করেছি যে দেহ
> সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, সংসারের তাগিদ তাহার
> চলেছে সমান তালে। নানা দিক থেকে বারবার

আসছে আঘাত শুধু কত ভাবে। আমি অসহায়,
প্রাণপণ খেটে চলি। একদিন হেমন্ত-সন্ধ্যায়
বসেছি নিঃসঙ্গ একা। ক্লান্ত বড়। একটু কুয়াশা
অস্পষ্ট করেছে নীল আকাশের। থেমে গেছে ভাষা,
মনের কাকলি কথা। নাই কোন আশা অভিমান,
নির্বিকার। চেয়ে দেখি অকস্মাৎ ফুলগুলি তেমনি অম্লান
ফুটে আছে ডালে ডালে। মনে হলো রয়েছে অক্ষত।
চারদিকে আবর্জনা, তবু তারা আপনার মতো
আনন্দে বিচ্ছিন্ন শান্ত। আহা সে কি গভীর আশ্বাস,
ভরসা, এই যে আমি, অনাদি সে, তার যে আবাস
শুধু তো এখানে নয়, এই নীড়ে আছে ক্ষণকাল,
মাটির একটি কোণে বাসা বাঁধে মৌসুমী মরাল,
সংসারে আচ্ছন্ন তবু সে 'আমি' যে মুক্ত চিরদিন
কিভাবে করবে স্পর্শ কোনো ক্ষত, সে যে উদাসীন।

তাই বাইরের বস্তু মনের ভিতর এসে ভাব হয়ে যায়। আবার ভাবও বস্তু হয়ে বাইরে ছাড়া পায়। যেমন, আমেরিকা ও রুশিয়ার কৃত্রিম উপগ্রহ। বহুদিন ধরে তা ভাব হয়ে বাসা বেঁধেছিল বিজ্ঞানীদের মনে। একদিন রূপ পেয়ে তা পৃথিবী পরিক্রম শুরু করলো মহাশূন্যে। সব কিছুর মূলে ভাব, না বস্তু, তা নিয়ে এখন আর তর্ক করা চলে না। আসল কথা হলো, তা' একই এবং অখণ্ড সৃষ্টি-কর্মের এপিঠ আর ওপিঠ। তা ছাড়া বস্তু আণবিক শক্তিতে রূপ নিয়ে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়, থাকে শুধু আলো। তাই নির্ভয়ে বলতে পারি, সব কিছুর মূলে আছে আলো। রাশিয়ার তৈরী এক উপগ্রহ থেকেও আলো বের হতে দেখেছি। এখন শুনুন দেখি, পবিত্র কুরআনের বাণী ঃ

'আল্লাহু নূরুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্'—আল্লাহ্ বিশ্বজগতের আলো। এ কথা তো শুধু আধ্যাত্মিক সত্য নয়, বৈজ্ঞানিক সত্যও বটে। এই আলোর স্পর্শই তো যুগে যুগে কামনা করেছেন কবি ও সাধকরা। মর্তজীবনের গভীর অন্ধকারে তারা সেই আলোকই খুঁজেছেন, সাধক বিরহের বেদনায় অধীর হয়েছেন, কবি হয়েছেন ভাবাবিষ্ট। সাধকের চোখে সে আলো তো আমা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। শুধু আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন এবং মনের ভিতর অসংখ্য আসক্তি অন্ধকারের মতো সকল সত্তাকে আবৃত করছে বলে,

সে আলো তো আমাদের জীবনে পর্ণ জ্যোতিতে প্রতিফলিত হয় না, যেমন সহজেই হয় একটি অনাদৃত ফুলের পাপড়ি পাতায়। পঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ সাধক-কবি বুলেহ্ শাহ্ কি বলেছেন শুনুন :

বুল্হা শাহ্ অসাঁথো বখ্ নহীঁ
বিনা শাহ থীঁ দুজা কখ্ নহীঁ
পর বেখন্ বালি অখ্ নহীঁ
তাহীঁ জনি পাই দুখ সহিন্দি হায়,
মুঁহ্ আই বাত না বহিন্দি হায়।
বুল্হা, শুন্ছো আমাদের থেকে প্রিয়তম দূরে নয়,
প্রিয়তম ছাড়া সব যে ছলনাময়।
শুধু চোখ নাই দেখবো যে তাকে।
আত্মা যে সহে ব্যথা,
তাই কি ক'রে ঠেকাই মুখের কথা।

কবি তাই সোজাসুজি প্রেমের আশ্রয় নিয়েছেন, কারণ তাঁর আবেগে গতিময় মন বহুদূর পর্যন্ত অনায়াসে যেতে পারে। সত্যকার বেদনা-বোধ সাধক-কবিকে তাঁর গোপন পথের সন্ধান দিতে পারে, তারপর এমন এক স্থানে তিনি থেমে যান, যার সামনে পড়ে আছে এক বিশাল তুষার নীরবতা। নির্মম পাষাণের বুকে মাথা কুটে সেই নীরবতা সাধককে ভাঙতে হয়। অর্থাৎ তাকে কুরবান হতে হয় প্রিয়তমের উদ্দেশে। বুলেহ্ শাহ্ বলছেন :

ভাবে জান্ না জান্বে বেহ্ড়ে আ বড় মেরে,
মঁই তেরে কুরবান বে বেহ্ড়ে আ বড় মেরে।
তুমি ভালবাসো আর নাই বাসো এসো পথে প্রিয়তম,
আমি যে তোমার কুরবান প্রিয় এসো প্রাঙ্গণে মম।

নীরবতা ভাঙতে কতক্ষণ। মহাশূন্যের দূরতম সীমা পরিমাপের জন্য রকেট বা কজমিক শিপের (মহা-জাগতিক যান) দরকার হতে পারে; কিন্তু প্রেমের ধারাই যে অন্যরূপ, তার দায়ে প্রিয়তম নিজেই এসে ধরা দেয়। তাই সাধক-কবি বাইরে নিষ্ক্রিয়; কিন্তু তাঁর ভিতর অত্যন্ত গতিময় ও চঞ্চল। সেখানে তাঁর হৃদয়ের আবেগ তাঁকে স্থির থাকতে দেয় না, প্রকাশের ব্যাকুলতা, সন্ধানের তৎপরতা তাকে চঞ্চল করে। দিন কাটে, রাত যায়, বিরহের

বেদনা তীব্র হয়ে ওঠে। সে তীব্রতা কি দেহ বহন করতে পারে? জীবনের পথে সে বেদনার রস উপচে পড়ে। তারপর চারদিকে ছড়িয়ে যায়, তৃণে, লতায়-পাতায়, ফলে-ফুলে, সুন্দর দৃশ্যে ও রূপবতীর কমনীয়তায়। তার-পর তা প্রসারিত হতে থাকে তারালোক পর্যন্ত।

এমনি এক নিবিড় ভাব-মুহূর্তে সাধক-কবি সুন্দরের দেখা পান। বুলেহ্ শা'র কথায়:

হুন মায় লকখিয়া সোহ্না ইয়ার
জিস দে হুসন্ দা গরম বজার।
দেখেছি আমার সুন্দরতম বন্ধুকে যার
রূপের চাহিদা বড়।
তাঁহাতে সকল রূপ-লাবণ্য-বর্ণ হয়েছে জড়ো।

তাঁর রূপের চাহিদা এখনও আছে। অবশ্য কিছুটা কমেছে। কিন্তু বস্তুর চাপ একটু কমে গেলেই তা আবার বেড়ে যাবে।

বুলেহ্ শা'র কবিতা অতি সরল, সাবলীল ও গতিপূর্ণ। মনন-শক্তির স্পর্শ থাকলেও তা ভাবগভীরতায় রসসিক্ত। তাঁর কবিতার সৌন্দর্য চিন্তায় এবং সেই চিন্তার সরল ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশভঙ্গির মধ্যে প্রিয়তম মিলনের সূক্ষ্ম ও গভীর ভাবানন্দকে বুলেহ্ শাহ্ কী সুন্দর ও সহজভাবে প্রকাশ করেছেন:

রান্‌ঝা রান্‌ঝা কারদী নী মায় আগে রান্‌ঝা হোঈ
সদ্দো নি ময়নুঁ ধিদো রান্‌ঝা হীর না আক্কে কোঈ।
রান্‌ঝা মায় ভিস মায় রান্‌ঝে ভিস হোর খিয়াল না কোঈ
মায় নহীঁ উহ্ আপে হই আপনি আপ করে দিল জোঈ।
হাত খুনডি মেরে অগ্‌গে মায়গু মোধে ভুরা লোঈ।
বুল্‌হা হীর সলেতি দেখহো, কিত্তে যা খলোঈ
রান্‌ঝা রান্‌ঝা কারদী নী।
বন্ধু, রান্‌ঝা রান্‌ঝা বলে বারবার ডাকতে
আমি নিজেই হয়ে গেছি রান্‌ঝা।
আমাকে এখন ধিদো* রান্‌ঝা ব'লে ডাকে।
হীর বলে আর ডাক দিও না আমাকে।

---

* রান্‌ঝা যখন হীরের পিতা সিয়াল-প্রধানের বাড়ীতে রাখালের চাকরি করে, তখন এই ধিদো নামেই সে পরিচিত হয়। রান্‌ঝা বা রাঁঝা দুই-ই শুদ্ধ।

আমি রান্‌ঝায়, রান্‌ঝা আমার মধ্যে।
আর কোন চিন্তা নেই, নেই আমার অন্য পরিচয়।
হাতে আমার (রাখালের) লাঠি
সম্মুখে আমার পশুর দল,
ঘাড়ের উপর মোটা কম্বল।
বুলেহ্, চেয়ে দেখ সিয়ালের হীরকে (অর্থাৎ আপনাকে) কোথায় সে গেছে এবং দাঁড়িয়ে আছে!

পঞ্জাবের পঞ্জাবী ভাষায়, দেশের বিশিষ্ট কাব্য প্রকাশের রীতি ও ঢঙ অনুসারে অতি পরিচিত জীবন ও পরিবেশ থেকে উপমা আহরণ করে বুলেহ্ শাহ্ হৃদয়ের গভীর ভাবধারা প্রকাশ করেছেন। গভীর হলেও তা দুর্বোধ্য নয়। ধর্মান্ধতা ও অন্ধ আচার-নিষ্ঠার বিরুদ্ধে বুলেহ্ শাহ বিদ্রোহ করেন। শরীয়তের নির্দিষ্ট আইন-কানুনে প্রেমধর্মের স্থান বা স্বীকৃতি নেই। বুলেহ্ শাহ্ গতানুগতিক শরা ও প্রেমের মধ্যে এক বিতর্কের অবতরণা ক'রে প্রেমকেই তিনি শেষে জয়যুক্ত করেছেন।

ইশ্‌ক শরা দা ঝগাড়া পায় গিয়া
দিল দা ভরম মাতাওয়া মাঈ।
সওয়াল শরা দে জবাব ইশকে দে
হযরত আখ সুনা বা মাঈ
শরার প্রশ্নে প্রেমের জবাবে হে আমার তুমি শুদ্ধকামী।
শরা কহে চল্ পাস মুল্লা
দে সিখ লাই অদব অদাবা নু।
ইশক কহে ইক্কে হরফ বটেরা থপ রাখ
হোর কতাবা নু।
শরা কহে যাও মুল্লার কাছে আদব শিখিয়া নাও,
প্রেম কহে এক হরফেই * সব, তার সব বই ফেলিয়া দাও।

* হরফ—আরবীর প্রথম আলিফ। প্রেমিকদের নিকট এই আলিফই যথেষ্ট—কারণ এই আলিফ থেকেই আল্লাহ্‌র নাম।

সহজ-সাধক দাদু (দাউদজী) আজমীর শরীফের নিকটবর্তী নারানৌ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সম্রাট আকবরের সঙ্গে তাঁর ফতেপুর সিক্রি ও আগ্রার মধ্যবর্তী স্থানে চল্লিশ দিন ধ'রে ধর্মালোচনা হয়। এই দাদুকে একদিন মুল্লারা সদম্ভে বললে, তুমি তো কুরআন পড়ে হাফিয হওনি। উত্তরে দাদুজী সবিনয় নিবেদন করলেন—এক আল্লাহ্ নাম জপ করে আমিও হাফিয হয়েছি।

পাঞ্জাবী সূফী-সাধক কবিগণ 'হীর রান্‌ঝার' লোক কাহিনীর হীরকে আত্মা বা আশিক এবং রান্‌ঝাকে পরমাত্মা বা প্রিয়তম মাশুকরূপে কল্পনা-প্রতীকে আপনাদের বিরহ-ক্ষুব্ধ প্রেমতপ্ত হৃদয়ের ভাব-আবেগ প্রকাশ ক'রে ভারমুক্ত হয়েছেন। রান্‌ঝা যখন হীরের পিতা সিয়াল-প্রধানের বাড়ীতে রাখালের চাকরি করে, তখন সে ধিদো নামেই পরিচিত হয়।

শরা কহে কুজ শরম হয়া কর
অলগ মন্দির কি পূজারে,
ইশক্ কহে তেরি পূজা ঝুঠি
জে বণ বাইঠোঁ দুজারে।

শরা কহে তুমি একা মন্দিরে পূজা কর স্নান ক'রে,
প্রেম কহে তব মিথ্যা ভজন দূরে থাকো যদি স'রে।

শরা কহে কুজ শরম হয়া কর
বন্দ্ কর ইস চমকারে নুঁ,
ইশক্ কহে এহ্ ঘুংঘট কইসা
খুল্লন দে নজারে নুঁ।

শরা কহে অতি শরমের সাথে লুকাও প্রাণের আলো,
প্রেম কহে এই গুণ্ঠন কেন? চোখ খোলো সেই ভালো।

শরা কহে চল মসজিদ অন্দর
হক নমায অদা কর লুই
ইশ্ক কহে ময়খানে বিচ পিকে শরাব
নফল পর লাই।

শরা কহে যাও মসজিদে পড় হক নমায যা তোর,
প্রেম বলে যাও ময়খানে পড় নফল শরাবে ঘোর।

শরা কহে চল্ বিহিশ্‌তি কলিয়ে
বিহিশ্‌তা দে মেওয়া খাওয়া গে,
ইশ্‌ক কহে ওথে পাইহ্‌রা সাদা
আপ হংথি বরতাঁগে।

শরা কহে চল বেহেশ্‌ত সেথা খাবো বেহেশতি ফল,
প্রেম কহে সেথা আমরা শাসক বিতরিবে ফলদল।

শরা কহে চল্ হজ্ কর মোমান
পুলসরাত লংগানা রে।
ইশ্‌ক কহে বুয়া ইয়ার দা কব্‌বা
উঠঠো মুল না হল্‌না রে।

শরা কহে কর হজ্, ও মুমীন, পুলসিরাত হবে পার
প্রেম কহে কাবা বন্ধুর দ্বার, ছাড়িব না সেথা আর।

শরা কহে শাহ্ মনসুর নুঁ
সুলি উট্টে চারিয়া সি,
ইশ্‌ক কহে তুসাঁ চঙ্গা কিত্তা
বুয়াই ইয়ার দে ভরিয়া সী।
শরা কহে মোরা শূলের উপর উঠায়েছি মনসুরে,
ভালই করেছ তোমরা পাঠালে তাহারে বন্ধুপুরে।
ইশ্‌ক দা দরজা আরশ্ মুয়াল্লা
সিরতাজ লাওলাকি রে,
ইশ্‌ক বিসো পয়দা কিত্তা বুলহ্‌হা আজিয খাকি রে।
প্রেমের দরজা সাত আসমানে, সৃষ্টির শিরতাজ
প্রেম থেকে সে যে বুলহায় সজে বিনয়ী খাকের মাঝ।

বুলেহ্ শা'র শেষ কথা, প্রিয়তম প্রভু থেকে আমি পৃথক নই—তাঁর থেকে পৃথক কোন কিছুর অস্তিত্বও নেই। কিন্তু দুঃখ, তাঁকে দেখবার চোখ নেই, তাই আমাদের আত্মার এই অনন্ত বেদনা ও অবিরাম ক্রন্দন এবং সন্ধান'পরতা।

সিফাত-ই-'আবদ কি করে আল্লাহ্‌র সিফাতে মুবাদ্দিল বা পরিবর্তিত হয়, তার সন্ধানে সূফীদের অবিরাম সাধনা ও আমরণ জীবনপাত। আধ্যাত্মিক জীবনের এ সন্ধানপরতার ফলে এক পরম শুভ মুহূর্তে সূফী উপলব্ধি করেন তাঁর 'আমি'র মৃত্যু হয়েছে (ফানা ফিল্লাহ্‌), আর তিনি আল্লাহ্‌র অনন্ত সত্তার মধ্যে চিরকালের জন্য এক বিস্ময়কর আনন্দপূর্ণ অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজমান (বাকা বিল্লাহ্‌)। সূফী শ্রেষ্ঠ রুমী এ অবস্থার এক চমৎকার উপমা দিয়েছেন। সূর্যের প্রখরতম দীপ্তির অন্তরালে আকাশের লক্ষ কোটি তারকা আলোকের পরপারে নিমজ্জিত হয়। তাদের অস্তিত্ব আছে; তবে তা থেকেও নেই, আবার নেই বললেও ভুল হবে। সূফীর এই অনন্ত জীবন লাভের গোপন তত্ত্ব ও তথ্যের আভাস আমরা তাঁদের কথায় পাইনে, সঙ্গীতে পাই। কারণ সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে সেই সুর-সঙ্গীত ও অফুরন্ত প্রাণ-লোকের সন্ধান সম্ভবপর। সৃষ্টির সমস্ত কিছুর মূলে যে সমন্বয় ও ধ্বনিমাধুর্যের অবিরাম বিস্তার, সঙ্গীতের সূক্ষ্ম সুর, মাত্রা, তান ও লয়ের মারফতেই তার স্পর্শ ও আভাস লাভ সহজ হয় বলেই অধিকাংশ সূফী-সাধক সঙ্গীতের আশ্রয় বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন। রুমীর কথায়—

> হে বন্ধু তুমি শুধু একা তুমি নহ,
> তুমি যে আকাশ আর সমুদ্র গভীর ;
> তোমার অসীম তুমি, 'তুমির' সাগরে
> লক্ষ তুমি নিমজ্জিত অশান্ত অধীর।

এই লক্ষ 'তুমি'র মধ্যে পঞ্জাবের সূফী-কবি' আলী হয়দর একজন। সূফী নামের সাথে যে বিচিত্র ও আনন্দ-বেদনা মধুর ভাবধারা বিজড়িত, তার সন্ধান আমরা হয়দরের মরমী ভাবপূর্ণ সঙ্গীতের ভিতর লাভ করবো।

পঞ্জাবে মুলতান জেলার কাজিয়া গ্রামে 'আলী হয়দর ১১০১ হিজরী সালে (১৬৯০ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের অধিকাংশ কাল তিনি তাঁর জন্ম-পল্লীতেই যাপন করেন। এ গ্রামেই পরিপক্ক পঁচানব্বই বছর বয়সে 'আলী হয়দর ১১৯৯ হিজরী সালে (১৭৮৫ খ্রীঃ) ইন্তিকাল করেন।

'আলী হয়দর কাদিরী তরীকার সূফী ছিলেন। তাঁর কথাতেই আমরা পাই :

'আলী হয়দর কেয়া পরওয়াহ্ কিসে দী জে
শাহ্ মুহীউদ্দীন অসা' ভাড়া আই।

'আলী হয়দর, পরওয়া কিসের, শাহ্ মুহীউদ্দীন যখন আমাদেরই ? 'আলী হয়দর বহু কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করেছেন, সঙ্গীতের ভাগই অধিক। তাঁর লেখায় ভাষা ও শব্দের ব্যবহার যে মাধুর্য ও অলঙ্কারের পরিচয় পাই, তার তুলনা একমাত্র বুলেহ্ শাহ্ ছাড়া অন্য পঞ্জাবী সূফীদের মধ্যে দুর্লভ। তাঁর ব্যবহৃত অলঙ্কার বৃত্ত্যানুপ্রাসের একটি উদাহরণ,

শীন শরাব দে মস্‌ত্ রইহান
কী ন ইন তয়ীদে মত বালাড় নী
সুরখ সুফায়েদ সিয়াহ্ দো বানা'লাড়ে
বা'জ কজ্জল আইবে কালড়ে নী।

হয়দরের রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য, তিনি অন্য ভাষার শব্দ, বাক্য এবং বিচিত্র প্রকাশ-ভঙ্গি পঞ্জাবী ভাষায় ব্যবহার করেছেন এবং এই সকল শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার এরূপ সুসঙ্গত ও শ্রুতিমধুর হয়েছে যে, তা বিদেশী বলে মনেই হয় না। একটি উদাহরণ,

জা'ন বচাকে বাঝো চা'কে রখী কিউঁ
কর হোঙ্গ মাঁ'
ইয়া রগ মসিবঅল মাহ্‌বুব রেহা গয়ার
না' কোঙ্গ মাঁ।

'ইয়া রগ মসিবঅল মাহ্‌বুব' একটি আরবী বাক্যাংশের বিকৃত রূপ।

পার্থিব বস্তুর প্রতি কবির বিতৃষ্ণা ও ঔদাসীন্য বিশেষ লক্ষণীয়। তিনি পার্থিব বস্তুর অধিকারকে মিথ্যা ও ক্ষণস্থায়ী বলে আখ্যায়িত করেছেন। শুধু আল্লাহ্ এবং রসূলের প্রেম, প্রীতি ও আনুগত্যের সম্পদকে একমাত্র সত্য ও নিত্য বলে তিনি স্বীকার করেছেন। বস্তু-জগতের পার্থক্য ও বিভেদের স্বীকৃতির মধ্যেই বহুত্বের জন্মলাভ। রূমীর কথায় :

প্রদীপ বহু স্বতন্ত্র, কিন্তু আলো একই।
এই আলো আসে (বস্তুর) অতীত লোক থেকে,

যদি প্রদীপের দিকে চেয়ে থাক,
তবে তুমি নিজেকে ফেলবে হারিয়ে।

কারণ তখনই জন্ম নেবে সংখ্যা ও বহুত্ব। সত্য সূফীসাধকরূপে হয়দর এ বহুত্বকে অঙ্গীকার করেছেন এবং করেছেন বলেই পার্থিব বস্তুর প্রতি তার বিরক্তির সীমা নেই। একটি উদাহরণ,

কূড়া ঘোড়া কূড়া জোড়া কূড় শউ অসওয়ার
কূড়ে বা'শে কূড়ে শিকারে কূড়ে মীর শিকা'র।
কূড়ে জোড়ে কূড়ে বেড়ে কূড়ে হা'র শংগার
কূড়ে কোটঠে কূড়ে মনমিট কূড় এহ্ সনসার।
হয়দর আকখে সভ কুঝ কূড়া
সচ্চা হিক করতার
দূজা' নবী মুহাম্মদ সচ্চা সচ্চে উস দে ইয়ার।

(অনুবাদ অনাবশ্যক);
বিশেষ বিশেষ শব্দার্থই যথেষ্ট। কূড়া-মিথ্যা; জোড়া-পোশক; সাউ আস-ওয়ার-শাহী সওয়ার; বাশে-বাজপক্ষী; শিকার-শিকারী বাজপক্ষী; বেড়-নৌকা; সাংগার-সিংগার, প্রসাধন দ্রব্য; কোটঠে-ঘরবাড়ী; মনমিট-আমোদ-প্রমোদ; হিক করতার-এক কর্তা, এক আল্লাহ্। করতার শব্দ আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ব্যবহৃত। শিখরা আল্লাহ্ অর্থে 'করতার' শব্দ ব্যবহার করে। আলাওলের—প্রথমে প্রণাম করি এক করতার। দূজা-দ্বিতীয় (সত্য); ইয়ার---বন্ধু।

সূফীবাদের মূল কথা হলো প্রেম। কার সঙ্গে? সেই একের সঙ্গে—যে একের তুলনা বা দ্বিতীয় নেই। হয়দরের বিশ্বাস, একের উপর তাঁর আশাভরসা ও নির্ভরতা মনকে স্পর্শ করে। হয়দর বলছেন,

আলিফ এতথে ওতথে অসাঁ আস তাইঁডী অটে
আ'সরা' তাইঁডরে জোর দা'ঈ।
মহীঁ সভ হবালড়ে তইঁডারে নে
অসাঁ খওফ না' খণ্ডারে চোর দাঈ।
তুঁঈ জা'ন সওয়াল জওয়াব সর্তো সানু
হওয়াল নি অউখাড়ী গোর দাঈ।
আলী হয়দর নুঁ সিখ তাইঁডাড়ী আই

তইঁডই বাঝ না সাইয়ল হোর দাঈ।

আলিফ, এখানে এবং ওখানে তুমিই আমার আশা,

তোমার শক্তিই আমার আশ্রয়।

সকল মহিষই (সন্ধানপর আত্মা) তোমাব তত্ত্বাবধানে,

তাই ভয় করি নে আমি দুর্বৃত্ত চোরকে (শয়তানের প্রলোভনকে)।

তুমি জান সকল প্রশ্ন ও তার উত্তর,

(তাই) ভয় করিনে বিপজ্জনক কবরকে।

'আলী হয়দর অনুভব করে তোমার অভাবকে,

তোমাকে ছাড়া আর কারও সন্ধান সে করে না।

(মাহী-মহিষ সকল। পঞ্জাব ও সিন্ধু দেশে মহিষের দল মুক্ত প্রান্তরে চরে বেড়ায়, রাখাল থাকে তাদের তত্ত্ব-তলাশে।)

পঞ্জাবী সূফী কবিদের মধ্যে হয়দরই কবিতায় ও গানে শব্দের বিচিত্র ব্যবহার নিয়ে খেলা করেছেন এবং শব্দ ও শব্দের ঝংকারে তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন কথার রঙিন ফোয়ারা ও ঝরোকা। পঞ্জাবী তরুণীদের বিচিত্র রঙের দোপাট্টার মত সাজিয়ে দিয়েছেন ভাবের উচ্ছ্বাস ও প্রেমোন্মত্ত চিত্তের আবেগ-উৎসরণ। শব্দের ব্যবহারে তিনি যে পাণ্ডিত্য ও প্রকাশ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্যই বিস্ময়কর।

শান-শকর রনজী ইয়ার দী মাইঁনুঁ

তলখ কীতা' সভ শীর শকর

গনয শকর দী শকর ভাণডাঁ

জে করে রব শীর শকর।

ঝাঁঝা খীরতে হীর শকর রব

ফের করে ঝব শীর শকর,

জো লব্‌বিয়াই লব লবতে হা'মির

পিও পেয়ালা শীর শকর।

হয়দর গুসসা পীবে তাঁ অকথে

পীয়াও মিট্‌ঠা লব শীর শকর।

বন্ধুর ক্রোধ আমার কাছে লাগে তিক্ত,

আমাদের বন্ধুত্বকে করেছে বিরূপ,

আমি বিলিয়ে দেব গনয-ই-শকরের চিনি*,
আল্লাহ্ যদি শান্তির (সন্ধির) করেন বন্দোবস্ত।
রান্ধা চাউল, হীর যে চিনি,
আল্লাহ্ যেন তাদের মিলিত করেন।
আমরা যা চাই তা প্রতি ঠোঁটে ঠোঁটে (আল্লাহ্‌র নাম),
পান করো সে বন্ধুত্বের পেয়ালা ;
হয়াদর যদি সে তার ক্রোধ করে সংবরণ,
তবে বলবে, মিষ্টি চিনির ঠোঁট দিয়ে
পান করো সেই বন্ধুত্ব।

পূর্বে বলেছি, ধ্বনি, সুর-সঙ্গীত ও তান লয়ের বিস্তার সূফী-সাধকদের ভাব প্রকাশের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। হয়াদর ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ, তাঁর কবিতায় যে ধ্বনি-মাধুর্য ও সাবলীল গতি-ছন্দের সৃষ্টি হয়েছে, তা পাঠকের চিত্ত সঙ্গীত-রসে পূর্ণ করে। পড়ার চেয়ে তা গান ক'রে উপভোগের জন্য একটি স্বাভাবিক প্রবণতা জাগে। উদাহরণ,

তে তা'ড়িয়াঁ লা'ড়িয়াঁ তইঁডিয়াঁ নী
মইঁনু লা'ড়িয়া কা'ড়িয়া মা'রিয়াঁ নী
হীর জহিয়াঁ সই গোলিয়াঁ গোলিয়াঁ নী
সদকে কীত্তিয়াঁ তইঁ থোঁ বারিয়াঁ নী,
চওপড় মা'র তরোণ না' পা'সে
পাসে দিতিয়াঁ হড়ডিয়াঁ সারিয়াঁ নী।
হয়াদর কৌন থলা'ড়িয়াঁ তইঁথো
অসী জিতিয়া বা জিয়াঁ হারিয়াঁ নী।

হয়াদর পঞ্জাবের মিষ্টি উপভাষা মুলতানী বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। এখানেই তাঁর বিশেষত্ব। যে ভাষায় তথা উপভাষায় দেশের লোকে কথা বলে, সেই ভাষার মারফত তিনি প্রচার করছেন নিত্য কালের কথা, পুরনো প্রেমের কথা। পুরনো বলেই তাতে নেশা জমে বেশী। নতুন পাত্রে পুরনো শরাবে যে মৌজ হয়, দেহ-মন যেমন নীল রঙে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তেমন আর অন্যাতে হয় না। সূফী-সাধকরা সে খবর রাখেন।

* সাধক গনয-ই-শকরের (চিশতী তরীকার বিখ্যাত পীর ফরীদুদ্দীনের) অনুসরণকারিগণ কোনো কামনা-বাসনা পূর্ণ হলে চিনি বিতরণ করেন।

তাই তাঁরা নিজের ভাষায় শুধু প্রিয়তমের কথাই বলেন। হয়াদরও বলেছেন—

খে-খলক খুদা দী ইল্‌ম পড়্‌হ্‌দী সনু ইক্‌কা'
মুতা' লিয়া ইয়ার দা' আই।

আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীব সঞ্চয় করে জ্ঞান
আমরা পাঠ করি শুধু প্রিয়তমকে।

জিহ্‌নে খোলকে ইশক কিতাব দিট্‌ঠি সিগে
সরফ দে সভ বিসা'র দা' আই।

যে খুলেছে ও দেখেছে প্রেমের কিতাব,
সে প্রস্তুত তার সব খরচ করতে।

জিনহে ইয়ার দে নাম দা সবক পড়্‌হিয়া
এত্থে যায় সবর করার দা' আই।
প্রিয়তমের নাম পাঠ যে নিয়েছে,
তার এখানে আসা উচিত নয়,
এখানে শুধু শান্তি ও সন্তুষ্টি।
হয়াদর মুল্লা নূঁ ফিকর নমায দা' অই
এহনা আশক তলব দিদার দা আই।

হয়াদর, মুল্লারা নমাযের চিন্তা করে; কিন্তু প্রেমিকরা কামনা করে (প্রিয়তমের) প্রকাশ।

এই কামনা করেন বলেই সাধকগণের জীবনে শান্তি নেই, সন্তুষ্টিও নেই। প্রিয়তমের সন্ধানে তাঁদের অনন্ত দুঃখের প্রয়াস। প্রিয়তমের বিরহে তাঁদের দেহ ও মন আগুনে পুড়ে খাক হতে থাকে, বিচ্ছেদের ব্যবধান তাঁদের জীবনে সৃষ্টি করে দুঃসহ বেদনা। সেই বেদনা-তপ্ত অঙ্গারে জ্বলে-পুড়ে নিখাদ হয়ে ওঠে তাদের শুভ্র পবিত্র আত্মা। ভারমুক্ত নিষ্কলঙ্ক সাধক লঘুপক্ষ মরালের মত সাধনার পাখা মেলে দেন অন্তহীন নভো পথে, অসীমের স্পর্শ ও সন্ধান লাভের আশায়। সে আশা কবে এবং কোথায় পূর্ণ হবে, কে জানে!

ফার্‌দ ফকীর

সূফী-সাধক ও বাউল কবিদের সাধনা ও প্রকাশের ধারা অনন্য ও অসাধারণ। তাঁদের কথা, তাঁদের জীবনের মূল সুর, তাঁদের আত্মনিবেদনের বৈশিষ্ট্য আমাদের সাধারণ মন ও দৃষ্টিকে বিস্মিত ও বিভ্রান্ত করে। সূফী-দের নিবেদিত জীবনের প্রকাশ গভীরে, নির্জনে, আত্মনিমজ্জনে। নাম-সমুদ্রে আত্মস্থ সাধক অন্তর দিয়ে অনুভব করে পরমতম সত্তাকে, সুন্দরকে, মাশুককে। সেই মর্মমূলের চরম ও পরম অনুভূতি এবং ভাবৈকরস ও সুগভীর আনন্দ-বেদনা সূফীর কণ্ঠে, সংগীতে, তারে তারে উৎসারিত হয়। এ উৎসরণ একটি বিশেষ ও বিস্ময়কর পথ অবলম্বন ক'রে চলে; তার গতি, ছন্দ ও বিস্তার আমাদের সাধারণ মন ও চিন্তার নাগালের বাইরে। সূফীর সালাত, সূফীর আত্মনিবেদন এই সুরে সুরে চলে। গতানুগতিক ও প্রশস্ত রাজপথ তাঁদের জন্য নয়, তাঁদের অন্তরের আনন্দ-বেদনা শত-ধারায়, শত ছন্দে এবং অভাবনীয় উপায়ে উচ্ছ্বসিত হয়। সূফী নিজের পথে নিজে চলেন। আমরা প্রশ্ন করি ঃ কেন এ উন্মাদনা ? কেন এ বিহ্বলতা ? কেন ? আমরা কি জানি, কী আবেগ তাঁর সমস্ত সত্তাকে আলোড়িত ও উদ্বেলিত করছে ! আমরা সে বিপুল বিক্ষুব্ধ ও বেদনাহত চিত্তের কি সন্ধান রাখি ! মদন বাউলকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার এ কী ধরনের নমায ? মদন উত্তর দিলেন,

যদি করিস মানা ওগো বন্ধু মানি এমন সাধ্য নাই,
আমার নমায আমার পূজা গানে গানে চলছে তাই।
কোনো, ফুলের নমায রঙ্‌-বাহারে
কারও, গন্ধে নমায অন্ধকারে
আবার বীণায় নমায তারে তারে
আমার নমায কণ্ঠে গাই।

আল্লাহ্‌র এই বিশ্ব সৃষ্টির প্রকাশ নীরবে, আবর্তন নিঃশব্দে, বিবর্তন সংগোপনে। তাই সূফীদের সাধনা গভীর নির্জনে, বিরাট নৈঃশব্দের সং-গহনে। অবাক অস্তিত্বের নিস্তব্ধতার ভিতর চলে সেই গভীরের অনুভূতি ও ভক্তমনের সকাতর নীরব নিবেদন। ঈশান বাউলকে কেউ জিজ্ঞাসা

করেছিল, তোমার যে পরম, তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ কি? উত্তরে তিনি বলেছিলেন :

আমার সাঁই নয়তো ভাঙা ঢাকা যে
বলবে ক্ষণে ক্ষণে।
বল নীরব গুরু সাঁই,
কোন্ সাধনে বাহির হ'লে
ব্রহ্ম-কমল পাই।
চলে চন্দ্রতারা নিত্যধারা
কোনো শব্দ নাই।

চন্দ্রতারা নিঃশব্দে চলে। নিঃশব্দে চলার ভিতর সূফী-সাধক সাধনার মূল-ধারা ও গভীরের স্পর্শ লাভের উৎস আবিষ্কার করেছেন। এ নিস্তব্ধতা ও নিঃসঙ্গতা-প্রীতির এক সাধকের সঙ্গে আজ আমাদের পরিচয় হোক।

পঞ্জাবের গুজরাট জেলার এক অখ্যাত পল্লীতে ফারুদ ফকীরের জন্ম। তাঁর জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। তবে ১৭২০ থেকে ১৭৯০ সাল পর্যন্ত সময়কে তাঁর জীবনকাল ব'লে ধরা যেতে পারে। এ সময়কাল তৎকালীন ভারতের অরাজকতা ও রাজনৈতিক বিক্ষোভে পূর্ণ ছিল। সারা উপমহাদেশে শান্তি ছিল না। মুগল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়েছে। আহ্‌মদ শাহ্ দুররানীর ক্রমাগত ভারত আক্রমণ, শিখদের শক্তি লাভ, মারাঠাদের প্রাধান্য অর্জন, ১৭৬১ সালে মারাঠাদের অন্তর্ধান, শিখদের পঞ্জাব জয় এবং রাজনৈতিক ভারতের দ্রুত ধারা পরিবর্তনের পটভূমিতে কাব্য ও সাধন-শিল্পের বিশেষ উৎকর্ষ লাভ সম্ভবপর হয় নি। সূফীবাদ গোঁড়ামি ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে নিম্নগতি লাভ করে। এ সময়কার গোঁড়ামি ও অন্ধবিশ্বাস থেকে ফারুদ ফকীর মুক্ত হতে পারেন নি। তবু শত আবিলতার মধ্যেও তাঁর মুক্ত সাধক মনের যে প্রকাশ হয়েছে, তা আমাদের চিত্তকে কম বিগলিত করে না। এদেশের বিখ্যাত বাউল কবিদের অনেকেই বহু অন্ধবিশ্বাস ও পারিপার্শ্বিকতার অন্ধতা এবং লজ্জাকর গ্লানি থেকে মুক্ত ছিলেন না। তবু তাঁদের স্বচ্ছ ও সরল মনের আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের সরসতা ও সরলতা আমাদিগকে মুগ্ধ করে। মদন ও ঈশান বাউলের যে কথাগুলো উদ্ধৃত করেছি, মুক্ত ও ভক্তমনের যে ভাবরসের সন্ধান তাতে আছে, সত্যকার সাধক-চিত্তের পরিচয়ের পক্ষে তাই যথেষ্ট। ফারুদ ফকীরকে আমরা এ দৃষ্টিতে দেখবো। তিনি শিক্ষিত ছিলেন, তবু যুগের আবিলতা ও নোংরা পরিবেশের প্রভাব তিনি

এড়াতে পারেন নি। তবে সব কিছুকে অতিক্রম ক'রে তিনি যে কবি ও সাধক, সেই পরিচয়ই নিবিড় হয়ে উঠেছে তাঁর 'রোশন দিল্' কসাবনামা বাফিন্দ গান ও বাড়া মাহ্'-তে।

'কসাবনামা' তিনি ১৭৫১ সালে শেষ করেন। কসাবনামায় সাধক কবি ফার্‌দ ফকীর তন্তুবায়ের জীবন ও ব্যবসাকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে প্রতিফলিত করেছেন। তন্তুবয়ন কার্মের সঙ্গে সৃষ্টি-কৌশলের তুলনা চলে, সেই ধৈর্য ও তিতিক্ষা, অনন্ত প্রতীক্ষা ও বেদনার পর সৃষ্টি-কমলের শত সহস্র দলের রক্তাভ বিস্তার ও বিকাশ। শিল্পীদের উপর সে যুগের শাসকদের অবিচার ও অত্যাচারের অন্ত ছিল না। বিনা মূল্যে তারা শিল্পীদের শ্রম আদায় করতো, খেয়ালখুশি মতো তারা শিল্পীদের শক্তি ও প্রতিভার সুযোগ নিতো। তাতে চারু ও বিভিন্ন শিল্পকলার যে কি ক্ষতি হতে পারে, সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ফার্‌দ ফকীরের শিল্পী-মন শাসকদের এ ঔদ্ধত্যে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কসাবনামায় ফার্‌দ বলছেন,

হাকিম হো কে বইন গলিচে বউহতা যুলম কমাঁদে
মেহনতিয়াঁ নুঁ কমী আকখন খুন
উহনা দা খাঁদে।
ফড় বগারী লই লই জওয়ান খওফ খুদা নাহীঁ
ফরদ ফকীরা দর্দ মনদাঁ দিয়াঁ ইক দিন
পওসন আহীঁ।
শাসক হয়ে তারা গালিচায় বসে
আর অত্যাচার করে,
তারা শিল্পীদের বলে চাকর, তাদের রক্ত করে পান।
জোর ক'রে তারা তাদের দিয়ে কাজ করায়,
আল্লাহ্‌র ভয় না ক'রে।
ফার্‌দ, আর্তদের দীর্ঘ নিশ্বাস একদিন
তাদের ওপর পড়বেই।

মযলুম ও শোষিতদের আর্তকণ্ঠের ফরিয়াদ একদিন আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছোবেই। তার প্রতিবিধানে শোষকদের একদিন কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে।

তওহীদবাদী ফার্‌দ হিন্দু অবতারবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও তিক্ত মনোভাব কবিতার ভেতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন,

যেহ্‌রে ইস্‌ম খুদাই দে, লিখ্‌খে অন্দর নস
উহে না ভুলাবনা, রামকিষণ সির ভস।
শিরায় শিরায় খুদার যে নাম
ভুলো না সে নামগুলি,
রামকৃষ্ণের (অবতার যারা)
মাথায় তাদের ভস্ম-ধূলি।

প্রকৃত মুসলমানের মতো ফারদ ফকীর কর্মবাদে বিশ্বাস করেন। সৎকাজ করার উপর পবিত্র কুরআনে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ভালো কাজের ফল ভাল, তাই এ জীবন আল্লাহ্‌র পথে থেকে নেক কাজ করাই মুমীনের কাজ। আল্লাহ্‌র নির্দেশ,

আল্‌-লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি,
তুবা লাহুম ওয়া হুস্‌নাল মা'ব।

তুবা-অর্থাৎ অন্তরের শান্তি ও আত্মার শান্ত অবস্থা লাভ করবে সে, যে বিশ্বাসী ও ভাল কাজ করে। তার শেষ গমনের স্থানও সুন্দর ও পরম শান্তিদায়ক। এ সুরে সুর মিলিয়ে ফারদ বলছেন,

গইন-গরুরাত না করো, রোবো ধাই মার।
বাঝোঁ অমলাঁ চংগিয়াঁ কৌন লংঘাসি পার,
ছড় দুনিয়াঁ দে বাহ্‌দে কৌল খুদা দা ভাল
ফরদা লেখা লইসিয়া রব কাদির যুল-জলাল।
গাইন—গর্ব করো না, কাঁদো প্রাণভরে বদলে তার
ভাল কাজ ছাড়া কে দেখিবে তোমা পুলের পার?
দুনিয়ার জাঁক ছেড়ে বোঝো তাঁর বাণী বিশাল
ফারদ, হিসাব নেবেন কাদির যুল-জলাল।

(যুল-জলাল—মহান ও মহিমময়)। মুক্তপ্রাণ সূফী ফারদ আরও বলছেন,

সিন—সুনায়ে খলক নুঁকর কর মসলে রোয,
লোকাঁ দে নসিহতাঁ অন্দর তেরে চোর।
কি হোইয়া জে লড়িয়া গধা কিতাবাঁ নাল
ফরদা লেখা লইসিয়া রব কাদির যুল-জলাল।
সিন-প্রতিদিন কর প্রচার মসলা লোকের কাছে
নসিহত কর, অন্তরে তোর চোর যে আছে।

কি বা প্রয়োজন গাধাতে বোঝাই পুঁথির তাল,
ফারদ, হিসাব নেবেন কাদির যুল-জলাল।

জানার পিছনে যে অজানা, দেখার অতীতে যে অদেখা জন, তাঁর কথা, তাঁর চিন্তা অন্তর দিয়ে, শুধু অন্তর দিয়ে করাই সূফীজন-পন্থা। সাধক চিত্তের সেই সুগভীরের ভাবরস প্রকাশ ক'রে ফারদ বলেছেন,

যাল---যিকর খুদাই দা নকর যাহির খলক দিখাই,
অন্দর কর তুঁ বন্দেগী বাহর পর্দা পাই।
মুল না বেচিঁ ইলম নুঁ না কর কিস্সে সওয়াল,
ফরদা লেখা লইসিয়া রব কাদির যুল-জলাল।
জাল---লোকেরে দেখায়ে করো না খুদার যিকর স্মরণ তাঁর
অন্তরে করো বন্দেগী, দাও বাহিরে পর্দা আর।
জ্ঞান বেচিও না কাহারে কখনো ক'রো না কোন সওয়াল
ফারদ, নেবেন হিসাব তোমার কাদির যুল-জলাল।

প্রিয়তম মিলনের আকাঙ্ক্ষায় ফারদ অধীর হয়ে উঠেছেন। প্রতি সূফী-সাধকই এভাবে উল্লসিত হয়ে ওঠেন। এই মিলন-কামনাই তাঁদের সকল দুঃখকে করে সার্থক ও সহজ। ফারদ বলছেন,

অজ হোবন লেফ নিহালিয়াঁ কোল
নিয়ামত ভরিয়া থালিয়াঁ
বউনাল পয়ারে খাবিয়ে হোর মশুক
গুলাব লগাবিয়ে।
নিয়ে এস আজ লেপ ও তোষক
থালা ভরা নিয়ামত,
প্রিয়তম সাথে আহার বিহার-সুগন্ধ সম্পৎ।

সাধক-কবীরের একটি দোঁহা মনে পড়ে,

দুলহানি গাবহু মঙ্গলাচার,
হাম ঘরে আয়ে পরম ভরতার।
সুর তৈতেশি পঞ্চক আয়ে
প্রেমী সব জগবাসী,

কহে কবীর হাম ব্যাহি চলে হৈ
বালম এক অবিনাসী।

এই বালম, বল্লভ ও প্রিয়তমের সন্ধানে সূফী-সাধক ও ভক্তদের জীবন কেটেছে সুদীর্ঘ প্রতীক্ষায়। মিলনের মধু ক'জন সঞ্চয় করেছেন জানি না ; কিন্তু বিরহের বেদনা ও অনন্ত দুঃখের প্রয়াসে মধুর হয়ে উঠেছে তাঁদের কাব্য ও জীবন। সেই রসের স্বাদ থেকে যেন আমরা বঞ্চিত না হই।

হাশিম শাহ্

পঞ্জাবী কাব্য-ধারা মূলত সূফী ভাবরসে পুষ্ট ও বর্ধিত হয়েছে। পঞ্জাবের মুসলিম সাধক কবিদের হাতে এই কাব্যধারা বিচিত্র ভাব, রস ও উচ্ছ্বাস-আবেগে প্রাণবন্ত হয়ে নব নব খাতে প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে। এই প্রবাহে বহু ভক্তমনের আনন্দ-বেদনা ও আত্মনিবেদন বিপুল আবেগ ও ভাবানুষঙ্গের সৃষ্টি করেছে।

পঞ্জাবী কাব্যের বহু ধারার মধ্যে 'দোহ্‌রে' জাতীয় কাব্য প্রকাশভঙ্গীতে একান্তভাবে বিশিষ্ট। এ ধারার সঙ্গে আমাদের বাঙলাদেশের মারফতী ও মুরশিদী গানের আঙ্গিক-ঐক্য আছে। ভাব ও প্রকাশভঙ্গী প্রায় এক। এক হওয়ার কারণও আছে। মূলে যে মন সক্রিয় হয়েছে, সে মন একই ভাবরসে সিক্ত। প্রেমের সহজ গতি ও ধারার স্বাভাবিক সামঞ্জস্যই এ ঐক্যের কারণ। প্রেমের সহজ বিকাশ ও পরিণতি আমরা এ 'দোহ্‌রে' কাব্য-ধারায় লক্ষ্য করবো।

দোহ্‌রে কাব্যের পরিবেশক প্রধানত হাশিম শাহ্ (১৭৫৩-১৮২৩ খ্রী) তিনি বিশ্বাস করেন, সংস্কারমুক্ত মন পরিপূর্ণভাবে প্রেমকে গ্রহণ ও আপনাকে প্রিয়তমের উদ্দেশে উৎসর্জন করতে পারে। হাশিম শাহ্ বলেন, লজ্জা ও সংস্কারের বাঁধ তিনি ভাঙতে পারেন নি, সে দোষ কার? প্রিয়তমের। তাই দুর্বল ও পঙ্গু বলে প্রিয়তমকে ধিক্কার দিয়ে তিনি বলছেন ঃ

(অবশ্য এ তাঁর অভিমান)---
জাঁ ফরিহাদ বিকেতে আইয়ো ওতথোঁ
চা পহাড় চুরায়ো,
মেরে পইর জনজির হয়াদা
ওহ নূঁ মুল না চা তুরায়ো।
ইশকা জোর নহীঁ বিচ তেরে
সাচ আখ বুচাপা আয়ো,
হাশিম লোগ করন গম অইঁ বেঁ
অসি ভেত তেরা হুণ পায়ো।

ফরহাদকে যখন বিকিয়ে দেওয়া হ'লো
তখন তুমি এলে, পাহাড় করলে চুরি,
কিন্তু আমার পায়ের চারদিক থেকে
লজ্জার (সংস্কারের) জিঞ্জির তুমি ভাঙলে না।
প্রিয়তমে, শক্তি তোমার নাই,
সত্য বলতে রঙ্কত্ব তোমাকে পেয়ে বসেছে।
হাশিম, লোকেরা বৃথাই দুঃখ করে,
আমরা তোমার রহস্য আবিষ্কার করেছি।

তথাকথিত আল্লাহ্‌র প্রেমিক ও সত্যকার প্রেমিকের পার্থক্য বর্ণনা ক'রে হাশিম বলছেন ঃ

রব দা আশক হোণ সুকখালা স্নেহ্‌
বউত সুকখালি বাযী,
গোশা পকড় রহে হো সাবর ফড়
তসবী বনে নমাযী।
সুখ অরাম জগতে বিচ সোভা অতে
বেখ হোবে জগ রাযী।
হাশিম থাক রুলাবে গলিআঁ তে স্নেহ্‌
কাফির ইশ্‌ক মযাযী।

আল্লাহ্‌র প্রেমিক (ধর্মের আনুষ্ঠানিক নির্দেশ অনুসারে) হওয়া সহজ,

এ খেলা খুব সহজ।
ধৈর্য ধ'রে কোণায় বসে তসবী গোণো, নমায পড়
জগতের আরাম-আয়েশ খ্যাতি আসবে,
তাই দেখে লোকে খুব খুশী হবে।
হাশিম, এই পৌত্তলিক প্রেমে
কাফির পথের ধূলায় যায় গড়াগড়ি।

(ধর্মতত্ত্ববিশারদগণ সূফীর আল্লাহ্‌র প্রেমকে পৌত্তলিক প্রেম এবং সূফীকে অবিশ্বাসী ব'লে অভিহিত করেন। হাশিম এখানে পরিহাস ক'রে সেই কথাই বলছেন।)

সকল ধর্মের আনুষ্ঠানিক ও গতানুগতিক বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে যাঁরা উঠে-ছেন, তাঁরাই সত্যকারভাবে প্রেমরস উপলব্ধি করতে পারেন। গণ্ডী ও

সম্প্রদায়মুক্ত মনেই সর্বানুভূতি সম্ভবপর, এই সর্বানুভূতি প্রেমরসের স্বাদকে পূর্ণ ও গভীরতর করে। হাশিম বলছেন ঃ

জিস বিচ জংগ বিরহোঁ দা পিয়া
তিস নাল লহু মুখ ধোতা।
শমা জমাল দিট্ঠা পরওানে
অতে আন শহীদ খলোতা।
জ মনসূর হোইয়া মদমাতা
তধ সূলী নাল পরোতা,
হাশিম ইশক অইহ্ জেহাঁ মিলিয়া জিন
দীন মযহাব সভ ধোতা।
যার মধ্যে বিরহের যুদ্ধ হয়েছে শুরু
(যে অনুভব করেছে, সত্য থেকে সে বিচ্ছিন্ন),
সে রক্ত দিয়ে আপনার মুখ ধুয়েছে।
(সত্যের জন্য সে আপনাকে কুরবান করেছে।)
পতঙ্গ বাতির সৌন্দর্য দেখেছে,
সে এসে হয়েছে শহীদ,
(যে প্রেমের জন্য সব কিছু তুচ্ছ করে, সে প্রাণ দিয়েছে)
মনসূর যখন হলো বেহেশ্তী প্রেমে মত্ত
তখন তাকে শূলে হলো চড়ানো।
হাশিম, তারাই প্রেম পেয়েছে
যারা দীন মযহাব ফেলেছে ধুয়ে।

(এখানে দীন অর্থ অন্ধ বিশ্বাস, মযহাব-সম্প্রদায় বা সাম্প্রদায়িকতা।)
অনুষ্ঠানসর্বস্ব দীন বা ধর্মে সূফীদের আস্থা নেই।
প্রেমের পরবর্তী অবস্থার কথা বর্ণনা ক'রে হাশিম বলছেন ঃ

তেড়ি জঞ্জীর শরীয়ত নস দা
যদ রচ্ চদ ইশক মযাযী,
দিল নুঁ চোট লগ্গি জিস দিন
দী আসাঁ খুব সিখি রিনাদবাযী।
ভজ ভজ রাহ বড়ে বুতখানে
অতে যাহির জিসম নমাযী,

হাশিম খুব পড়হায়া দিল নুঁ
অইস বইঠ ইশক দে কাযী।
আত্মা শরীয়তের জিঞ্জীর ভাঙে, রচনা করে
পৌত্তলিক প্রেম,
যেদিন, দিলে লেগেছে চোট (প্রেমের), সেদিন থেকে
আত্মা শিখেছে কামুকতা (রিনদবাযী)।
কারণ বার বার আমার আত্মা প্রবেশ করেছে বুতখানায়,
বাহিরে দেহ পড়েছে নমায।

হাশিম,
(হৃদয়ে) অধিষ্ঠিত হ'য়ে এই প্রেমের কাযী (সূফীর প্রেমবাদ)
আমার হৃদয়কে শিখিয়েছে খুব।

প্রেমের রীতি, প্রেমের হালচাল আমাদের পরিচিত জীবন, দর্শন ও পন্থা এবং জীবনের প্রশস্ত রাজপথ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রেমের শরাব যে পান করেছে, সেই জেনেছে মত্ততা, সে-ই দেহ-মন দিয়ে অনুভব করেছে তার রসঘন আবেগ ও বিপুল প্রাণোচ্ছ্বাস। সে যে কি অদ্ভুত রূপান্তর ও বেহাল অবস্থা! সে 'হালে' (حال) যে পৌঁছায় নি, সে তা' কি করে বুঝবে? প্রেমসিক্ত চক্ষু ও চিত্তে সব একাকার হয়ে যায়, জীবন ও পৃথিবীর সকল কলরব তার কানে প্রিয়তমের কলগুঞ্জনও কলস্বর হয়ে ওঠে। প্রেমের গভীরে যে নিমজ্জিত (استغراق) হয়নি, সে কি করে বুঝবে প্রেমের রীতি কি, তার ভাষা কি, তার পথের ও ধারা-প্রবাহের বৈচিত্র্য কী?

হাশিম প্রেমের এই হাল ও রহস্যময় ভাবধারা প্রকাশ করে বলেছেন:

বহদ ইবাদত চহে বেকথে নাহীঁ
হরগিয ধিয়ান না করদা,
শাহ্ মনসুর চড়হায়া সূলী
অতে ইউসুফ কিত্তো সু বরদা।
কিস গলদে বিচ, রাযী হোবে
কোই ভেদ নহীঁ অইস গল্লদা,
হাশিম বে পরওয়াই কোলোঁ
মেরা হর বেলে জিউ ডরদা।

গোঁড়া চাহে তাঁর ইবাদত, সে কিন্তু তাঁকে দেখে না, মনোযোগও দেয় না কোন। সে মনসুরকে শূলে চড়িয়েছে, ইউসুফকে করেছে ক্রীতদাস। কিসে সে সন্তুষ্ট হবে? এই ব্যাপারে গোপন কিছু নেই।
হাশিম, তার উদাসীনতার জন্য আমার হৃদয় শঙ্কিত।

দিল সোই জো সেজ সজ্জন দে নিত
খুন জিগর দা পিবে,
নইন সো জো আস দরস দী
নিত রহন হমেশাঁ খিবে,
দিল বেদর্‌দ বিয়াধি ভরিয়া
শালা ওহ্ হর কিসে না খিবে,
হাশিম সো দিল জান রংগিলা
জহড়া দেখ দিলাঁ বল জীবে।
সেই শুধু দিল, যে খায় আপন দিলের খুন
প্রিয়ের শয্যায়,
সেই শুধু নয়ন যাহা হামেশাই মত্ত যে
রঙিন নেশায়।
বেদরদী দিলে ব্যাধি, খোদা, যেন সকলেই
না পায় তাহে,
হাশিম জানিও সে হৃদয় রংগিলা যাহা
দিল পানে চাহে।

(রংগিলা-আল্লাহ্‌র প্রেমে রঙিন যে হৃদয়। দেখ দিলা বল জীবে হাশিম বিশ্বাস করেন, অন্য হৃদয়ের দুঃখ যে অনুভব করে, সে-ই আল্লাহ্‌র প্রেমিক।)

হর হর পোসত দে বিচ দোসত ওহ
দোসত রূপ বটাবে,
দোসত তক না পহ্‌চে কোঈ স্নেহ
পোস্‌ত চাহ্ ভুলাবে।
দোসত খাস পচানে তাঈঁ যদ
পোসত খাক রুলাবে।
হাশিম শাহ্ যদ দোসত পাবে তদ
পোস্‌ত বল কদ যাবে?

প্রতি পোস্ত গাছের ভিতর বন্ধু,
বন্ধু যে রূপ নিত্য সে বদলায়,
দোসত তক না পৌঁছায় কেহ তাঁকে
চাওয়ার ইচ্ছা পোস্ত যে ভুলায়।
পোস্ত যখন ধূলায় লোটে তখন
তখনই যে বন্ধু চেনা যায়।
হাশিম যখন বন্ধুর দেখা নাই,
পোসতের কাছ তখন কে বা যায় ?

পোস্ত (Poppy) আফিমের গাছ বিশেষ। এখানে ধর্ম ও তার আচার-অনুষ্ঠানের প্রতীক। রূপ বটাবে-প্রতি ধর্মের ভিতর বন্ধুর (আল্লাহর) বিচিত্র প্রকাশ। য়েহ পোস্ত চাহ্ ভুলাবে-ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান তার অনুসরণকারীকে আল্লাহ্‌কে চাওয়া ও তাঁর সত্য স্বরূপকে ভুলিয়ে দেয়। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ-রস ও গন্ধগান আমাদের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে। তার রূপেই আমরা মুগ্ধ। সে যে সত্যের ও সুন্দরের বাণী বহন করে, সেই সত্য-সুন্দরকে আমরা ভুলতে বসি। ভারত-মধ্যপ্রদেশের সাধক-রাজপুত্র জ্ঞানদাস বঘেলীর কথায়,

ইত্তি রওনক কিউরে এলচী
তুহি ইয়াদ ভুলায়া।
এলচী-দূত, প্রকৃতি-প্রিয়তমের পত্র যে নিত্য বহন করে।
পোস্ত খাক রুলাবে, পোসত যখন
ধুলায় লোটে অর্থাৎ ধর্মের ক্রিয়া-
কর্ম যখন পরিত্যক্ত হয়।

'দোহরে' কাব্য-ধারায় যে রস পরিবেশিত হয়েছে, তার স্বাদ আজও ওতমানে অম্লান হ'য়ে আছে।

আকাশে চাঁদ থাক আর নাই থাক, কিন্তু
'হাম হামেশা তোমহারি রহেঙ্গে'।

সাধক মনের আর্তি। এ আর্তির মূলে আছে অহেতুক প্রেম ও বেদনা-বোধ। সাধকের অভিসার, বিরহ-দগ্ধ মত্ত চিত্তের পদসঞ্চারণ। বিচ্ছেদ ও ব্যবধানের বেদনা আছে বলেই তাঁর জীবন প্রীতি ও প্রেমধন্য. আনন্দ ও বেদনায় সমান সমাধিকল্প।

কিন্তু এ বেদনা কিসের ? এ ব্যথার স্বেচ্ছাস্বীকৃতি ও পীড়ন কেন সাধকের ? 'আমি'র মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে সাধক-চিত্ত হয়রান হয়ে পড়েছে। প্রিয়তম থেকে অনেক দূরে সরে পড়ছে। কারণ ?

'আমি'র মধ্যে কিছু নেই। আমার মধ্যেই সমস্ত আছে। সাধক তাই 'আমি'কে ভুলে আপনাকে—আত্মাকে শ্রবণ, মনন ও ধ্যানের দ্বারা আবিষ্কার করেছেন, জানতে ও চিনতে প্রয়াস পেয়েছেন। আপনাকে জানতে জানতে তিনি মূলে এসে দেখেন, এতদিন যে সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাঁর চিত্তকে বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত করেছে, বিশ্ব ও বিশ্বাশ্রিত পরম তত্ত্ব ও তথ্যকে অস্পষ্ট ও জটিলতর করে তুলেছে,-তার মূলে আছে মনীষী বা মনন-শক্তি। চিত্তের গভীরে সাধক যখন আত্মউৎসের সন্ধান লাভ করেন, তখন নিমিষে সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সংশয়ের অবসান ঘটে, সত্য সহজ হয়ে তাঁর মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিতে এবং নিরহঙ্কার মনে প্রকাশিত হয়। এ সহজ প্রকাশের পটপৃষ্ঠায় সাধক-জীবনের আনন্দ-বেদনা ও রাগ-অনুরাগের উন্মেষ, উন্মোচন ও ক্রমবিকাশ। এ ক্রমবিকাশের পরিণতির সন্ধান কেউ রাখে না, কারণ সে গভীরতম দেশের ভাষা ধ্বনিমূলক নয়, ভাবমূলক এবং এ ভাব গভীরতম অনুভূতিসাপেক্ষ। কবির চোখেও এ ভাবলোক বা স্বপনপারের রূপ ধরা পড়ে। রবীন্দ্র নাথেরকথায় :

খুঁজে যারে বেড়াই গানে, প্রাণের গভীর অতল-পানে
যেজন গেছে নাবি',
সেই নিয়েছে চুরি করে স্বপ্নলোকের চাবি।

সাধক-কবিগণ এ চাবির সন্ধান পেয়েছেন। এইজন্য সাধকের জীবন আমাদের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও বিস্ময়ের উদ্রেক এবং চুম্বকের মতো আকৃষ্ট করে। একজন সাধক বলেছেন, ভক্ত ভক্তিভাজনের বৈঠকখানা। বস্তুত ভক্ত-জীবনের মধ্যে আমরা অমর জীবনের সার্থকতা স্পষ্ট হতে দেখি। এর আর একটি কারণ আছে। সাধকগণ শব্দার্থ খোঁজেন না, মর্মার্থ খোঁজেন, ডালপালার দিকে নয়, মূলের দিকে তাঁদের দৃষ্টি। তাই এ দৃষ্টি সহজ ও নিবেদিত জীবনের রসে-রঙে উদ্বেলিত ও স্বচ্ছ। পাণ্ডিত্যের বাষ্পমেঘ তাঁদের মন থেকে কেটে গেছে। আমাদের কাটে নি। কাটে নি বলেই বিস্মিত হয়ে ভাবি, আর কত ঘুরপাক খেতে হবে চিন্তার জটিলতার পাকে। সাধক-চিত্ত প্রসন্ন পঙ্কজ হয়ে ততক্ষণে রবিরশ্মির অপার দাক্ষিণ্যে রসে, বর্ণে ও গন্ধে পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেছে।

রণজিৎ সিংহের রাজত্বকালে সইয়িদ করম আলী শাহ্ জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান অজ্ঞাত; সাধন-স্থান গুরুদাসপুর জেলার বাতালা। মালের কোতলায় তিনি তাঁর পীর হুসাইনের সন্ধান লাভ করেন। পীরের স্থায়ী আবাস বাতালায় বলে মনে হয়:

> করম আলী চল শইহর বতালে লোক ক্ষান পই জানী নুঁ।
> করম আলী, বাতালা শহরে যাও,
> (এখানে) লোকেরা আমার জীবন করে তুলেছে অতিষ্ঠ।

পীর হুসাইন তাঁকে সত্য জ্ঞান-লাভে সাহায্য করেন। এই জ্ঞান লাভের ফলে তার অজ্ঞতার আবরণজাল ছিন্ন হয়:

> করম আলী হুঁবারে বারে, পীর হুসাইন নে তারে তারে
> দুখ গায়ে সাড়ে সারে হোয়ে সতগুরু মেহারবান কুড়ে।
> করম আলী এখন কুরবান, পীর হুসাইন তাঁকে বাঁচান।

আমার দুঃখের চির অবসান। কন্যা, সৎগুরু বড় মেহেরবান। করম আলী কবিতায় ফিলাউর রেল লাইন প্রবর্তনের উল্লেখ আছে। এই হিসেবে অর্থাৎ ফিলাউর রেল লাইন প্রবর্তনের কাল ১৮৭০ সাল হ'লে করম আলীর জীবন ও সাধনকালকে তার তিরিশ বছর এদিক ধরে মোটামুটি ১৮৪০-১৯০০ সাল ধরা যেতে পারে।

যতদূর মনে হয় সূফী সাধনার দিক থেকে তিনি কাদিরী ছিলেন। প্রমাণস্বরূপ পুত্রের কল্যাণ কামনা ক'রে তিনি বলছেন:

গওস-আলাম্বিম শাহে মীল্লানী হুয়াই তুম পর আব দিয়াল (দয়াল)।
কবির খিয়াল গ্রন্থের দ্বাদশ লোরী।

শাহ্ করম আলী ছিলেন জনপ্রিয় সূফী অর্থাৎ তিনি জনসাধারণে প্রচলিত ভাবধারা কাব্যে পরিবেশন করেছেন। তাই তাঁর কবিতা স্বতন্ত্র এবং ব্যক্তিত্ব-বর্জিত। বিভিন্ন সূফী ও সহজিয়া মতবাদের প্রশ্রয় থাকলেও তাঁর কবিতায় ইসলামী চিন্তাধারার প্রভাব অধিকতর সুস্পষ্ট ও সুপরি-কল্পিত। কোথাও গোপী সেজে তাঁর সঙ্গে কেলি করবার জন্য কৃষ্ণকে কবি আহবান করছেন এবং তাঁর পরবর্তী অংশে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে মানব-শ্রেষ্ঠ আদর্শ পুরুষরূপে বর্ণিত ক'রে তাঁর ইসলাম-প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। অন্য সাধন-পন্থার সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকলেও ইসলাম থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। ভক্ত-মনের ভাব প্রকাশের আতিশয্যে তিনি কৃষ্ণ ও গোপীর মিলন-স্বপ্ন ও রঙ্গ-কেলি প্রতীকরূপে ব্যবহার করেছেন মাত্র, কিন্তু রসুল (সঃ) তাঁর কাছে অত্যন্ত জীবন্ত ও সার্থক জীবনের অধিকারী এবং দিশারীরূপে প্রতিভাত।

করম আলী আন্তরিকতা ও অন্তরঙ্গতার সঙ্গে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য ও স্বরূপ অনুসন্ধান করেছেন। সূফী মতে দীক্ষা গ্রহণের পর জীবনের অধিক-কাল সময় তিনি হাদী (পথপ্রদর্শক) এবং তাঁর ভিতর দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা-গান করেছেন।

সাধক-চিত্তের অভিসার মনের গহনে চলে। নিস্তব্ধতা ও গভীর নির্জনতায় তার সহজ প্রসার ও প্রধাবন। রবীন্দ্রনাথের কথায়,

মম মন-উপবনে চলে অভিসারে আঁধার রাতে।

এ আঁধার রাতের নির্জনতা ও সুগভীর নীরবতায় সাধক-চিত্তের সহজ ব্যাপ্তি ও প্রসারতা। তাই সাধক গোপনীয়তা ভালবাসেন। বিহারের এক সাধকের কথা মনে পড়ে। নিবিড় বনের গহন নির্জনে তাঁর বাস। ঝরনার মুখর পটভূমিতে অরণ্যের গভীর নিস্তব্ধতা নিবিড়তর হয়ে উঠেছে। বিচিত্র তরুলতা ও পক্ষীদল অরণ্যক প্রশান্তিকে প্রশস্ত ও মধুরতর করেছে। দূরাগত ভক্তের নিবেদনে সাধক বলছেন, 'আমি কি জানি বাবা। আমরা তো মুক্ত হয়েই আছি, শুধু মন তা বুঝতে চায় না, তার অনেক কিছু কাম্য ও কামনা আছে, অনেক লোলুপতা ও স্বার্থপরতা আছে। এ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে শুধু তাঁকে দেখি তাঁরা সৃষ্টির

অফুরন্ত লীলাচাঞ্চল্য উচ্ছ্বসিত আবেগ-প্রশ্রিত বিভূতি ব'সে ব'সে দেখি। কবিই তিনি বটে, বাবা! এই তো দেখি, রাত্র-দিনের আবর্তন, ঝরনার সঙ্গীত, বর্ষার বনশ্রেণী ও কুহু-কেকার অফুরন্ত উল্লাস ও বর্ণ-বৈচিত্র্য, রসাশ্রিত বিপুল আবেগ। আমি আর কতটুকু জানি! শুধু দেখি, দেখে দেখে চোখ-বুক ভ'রে যায় আনন্দে, শুচিতা ও শুদ্ধতার গভীর পরিতৃপ্তিতে।'

চোখ তো আমাদেরও আছে। অফুরন্ত কিন্তু সৃষ্টির এ লীলা-বৈচিত্র্য আমাদের দৃষ্টিতে কতটুকু ধরা পড়ে? আত্মসর্বস্ব আমরা, তাই দৃষ্টি আমাদের আচ্ছন্ন, প্রশান্ত আনন্দ গভীর সৌন্দর্যবোধ প্রচ্ছন্ন। রূপরস ও গন্ধ-গানের গভীর মূলে যে আবেগ ও আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে সৃষ্টির অবিরাম প্রবাহ-ধারা উচ্ছলিত ও উৎস-মূল উৎসারিত করছে, স্পন্দিত ও রোমাঞ্চিত বৈচিত্র্যের স্বাদ গভীর ও তৃপ্তিকর ক'রে তুলছে, সে বিপুল আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের স্পর্শ আমরা কতটুকু তন্ময় হ'য়ে অনুভব করেছি! সাধক অপ্রমত্ত চিত্তে সৃষ্টিমূলের এ গভীর আনন্দ ও সৌন্দর্যানুভূতির রসাস্বাদে নির্বাক ও পরম পরিতৃপ্ত। এ পরিতৃপ্তি আছে বলেই তিনি প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখের বহু ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। হ্যাঁ, সাধক জীবনের পরিচয়ে এজন্যই আমাদের আগ্রহ ও আনন্দ।

করম আলী রচিত খিয়ালগুলোতে চার রকমের কবিতা দেখা যায়। 'কাফি'র মতোই 'খেয়াল' সঙ্গীতরূপে রচিত ও গীত। 'খিয়াল' (বাঙলা 'খেয়াল'-শব্দস্বপ্ন, কল্পনা) অর্থ, চিন্তা বা ভাবধারা। করম আলী রচিত কবিতাগুলো কবির চিন্তা বা রসসিক্ত ভাবধারার প্রকাশ এবং এ অর্থে তাঁর সংকলনের নামকরণ হয়েছে খিয়াল। আশিটি কাফিয়াঁ, কোনটি ছোট, কোনটি বড়, কোনটি অতি দীর্ঘ, তার খিয়াল কাব্যে স্থান লাভ করেছে।

করম আলীর আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর পূর্বে কোনো পঞ্জাবী সূফী কবি গজল রচনা করেন নাই। ভাব ও গীতিরসাত্মক সুদীর্ঘ গজল গানগুলো উর্দুতে রচিত। আরবী, ফারসী ও পঞ্জাবী শব্দে গজল গানের ভাষা সমৃদ্ধ ও বিশিষ্ট। তবে তাঁর সীমাবদ্ধ উর্দু-জ্ঞানের জন্য গজল গানগুলো ভাষার দিক থেকে তেমন উৎকর্ষ লাভ করে নাই।

লোরী কবিতা সংখ্যায় বারটি। বাঙলা দেশের ঘুমপাড়ানী গান ছড়ার সমতুল্য। পুত্রের জন্মের পর, শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য লোরী-

গুলো পঞ্জাবী ভাষায় রচিত। করম আলী 'দোহ্‌রে' জাতীয় কবিতাও রচনা করেন। তবে করম আলীর খিয়াল কবিতাগুলোই কাব্য-সুষমা ও সূফী ভাবরসে সমৃদ্ধ।

প্রচলিত গুরুবাদে তাঁর দৃষ্টি সমাচ্ছন্ন হলেও আল্লাহ্‌র সর্বব্যাপী অস্তিত্বের অনুভূতি তিনি অন্তরে অনুভব করেছেন. সর্ব ধর্মে তাঁরই কল্যাণ ও দাক্ষিণ্য তিনি প্রসারিত দেখেছেন। এ সর্বানুভূতি অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হলেও শুধুমাত্র ভক্তির আতিশয্যের দরুন করম আলী পীর পূজায় মত্ত হয়ে ইসলামের সত্যকার সূফীবাদ থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। ভক্তমন প্রমত্ত হবে, শুদ্ধ ও সংযত চিত্তে ভক্তির প্রকাশ ধারা প্রবহমান হবে. সর্বশেষে ভক্তিরসের সঙ্গে জ্ঞানের জারক মিশাতে হবে. তবেই সে রস গভীর আনন্দ আস্বাদে পূর্ণ হয়ে মিতশ্রী ও অমৃতরূপে ভক্তকে তৃপ্তি এবং অশেষ শান্তি ও সান্ত্বনা দেবে।

তথাপি করম আলীর রচনায় সুর ও অন্তরঙ্গতা আছে। আমরা দেখি, সাধকের বাক্যের মধ্যে আন্তরিকতা আছে কি না, তাঁর ডাকের মধ্যে অন্ত-রঙ্গতার সুর বাজে কি না, তাঁর আহ্বানের মধ্যে আছে কি না আতিথেয়তার আস্বাদ ও অপূর্বতা। বাঙলার এক সূফী বলেছিলেন, আমি তো কাঁদি না, আমাকে কাঁদায়। এ সুর করম আলীর সঙ্গীতেও আছে ঃ

মেরে সিনে বর্জাদি হূল
ইশ্‌ক পিয়ারে দী
তুরান ফিরান খি আজীয় কিতি
লগ্‌দি কলেজে সূল,
এহ্‌ দুখ লগগিয়া সানু কারী হোয়া
অরাম না মূল,
ইশ্‌ক পিয়ারে দী।
জে ইক্‌ বারি দরস দিখাবে, মাইনু সারে দুখ কবুল.
ইশ্‌ক পিয়ারে দী।
করম আলী নুঁ দেবে দিখাঈ মুখ ইয়ার দা রব রসূল,
ইশ্‌ক পিয়ারে দী।
আমার সিনায় আঘাত প্রেমের, হূল ফুটেছে বুকে,
চলতে ফিরতে ব্যথা বাজে, প্রেমের ব্যথা বুকে।

ব্যাধি আমার সঙ্কটময়, নাই যে আরাম তার
প্রিয় প্রেমের ব্যাধি,
বন্ধু আরোগ্য নাই তরি।
সকল দুঃখ কবুল যদি দেখা পাই একবার,
প্রিয় প্রেমের সকল দুঃখ-ভার।
করম আলী, প্রিয়তমের রসুল রবের মুখ হোক প্রকাশ,
প্রিয়-প্রেমের স্বরূপের আভাস।

শিখ ধর্মের গুরু-প্রশংসাত্মক সঙ্গীতের মতো করম আলী কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করেন। একটি ঃ

সত্ গুরাঁ দে চরনী লগ্ পিয়ারে
সত্ গুরাঁ দে।

সত্‌গুরু, চরনী, ভ্রম, সীতল (শীতল) প্রভৃতি শব্দ শিখ ধর্ম-সঙ্গীতে প্রচুর ব্যবহার করা হয়। গুরুর প্রশংসা গান ব'লে ভ্রম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। করম আলীর খিয়ালে অন্য ধর্মের বিশ্বাস অনুরূপ ভাবধারার পরিচয় আছে। হোলি খেলার মতো শ্রীকৃষ্ণের কথা তিনি বলেছেন,

হোরী খেলো বিরজ কে বাসী হোরী খেলো
কোঈ উড়াবত হই লাল গুলালী
কোঈ উড়াবত হই লাল গুলালী
কোঈ কঈঁ কত হই পিচকারী।

হামারে মহল মঈকয়ো নাহিঁ আয়ো লোক করত হই হাঁসি।

করম আলীর একটি লোরী গান ঃ

লোরী দে দে বাবল হস দা,
পড় পড় ওয়াযহুল্লাহ্ ফির দসদা,
দুই বইহম পরে হে বসদা
করম আলী চড় অনহদ বসদা।
ঘুম পাড়ানী গান গেয়ে বাপ হাঁসে,
বারবার আবৃত্তি করে ওয়াযহুল্লাহ্
দ্বৈতবাদের বোকামী যায় দূরে,
করম আলী, আত্মা হয় ঊর্ধ্বগামী,
অনন্তের বুকে সে বাস করে।
(ওয়াযহুল্লাহ্—আল্লাহ্‌র মুখ)

মৃত্যুর কিছু পূর্বে করম আলী কয়েকটি দোহা রচনা করেন ঃ

ওয়াকত আখিরি আ গয়া,
থক্কে মওত পয়গাম,
চল করম শাহ্ চলিয়ে'
ঝগড়ে মিটন তামাম।

শেষ মুহূর্তে এসেছে মৃত্যুর পয়গাম, নীচের তলায় চল করম আলী,চল সকলেই যাই, সকল ঝগড়া-বিবাদের অবসান হবে।

এ দুঃখ প্রিয়তমের বিরহে বিক্ষুব্ধ চিত্তের আর্তি, বিবাদ ও সংশয়াকুল মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব। আমাদেরও মনে সংশয়ের সীমা নেই। কিন্তু দুঃখ আছে কি ? প্রিয়তম থেকে বহু দূরে থাকার দুঃখ ? তাঁর জন্য কি মন কাঁদে? কাঁদে না। কলা-কুতূহলা মানবীর জন্য আকুল হয়েছি ; কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রেমে কখনো পাগল হয়েছি কি ? হই নি।

সাধকদের জীবনে দেখি, তাঁরা সাধনা করেছেন। সাধনা কি ? ব্যাকুল চিত্তে নির্জনে বসে তাঁকে ডাকাই তো সাধনা। সংসারের সকল কোলাহল ও চিত্ত-বিক্ষুব্ধির মধ্যে প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতায় বাস করেও গভীর নির্জনের শান্ত ও সংযত অবসরে তাঁর জন্য আমরা যেন কাঁদতে পারি।

ভক্তকবি রবীন্দ্রনাথের কথায় আমরা সে আশ্বাস পেয়েছি ঃ

দুঃখের বরষার চক্ষের জল যেই নামলো ;
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামলো।
এতদিনে জানলেন, যে কাঁদন কাঁদলেন,
সে কাহার জন্য ;
ধন্য এ ক্রন্দন, ধন্য এ জাগরণ,
ধন্য রে ধন্য।

করীম বখ্শ

প্রেম কি? প্রিয়তমের সঙ্গে একাত্মতা, আত্মবিলয়ের সহজ আনন্দময় বোধ। এ বোধ আনন্দময় কেন? মানুষে মানুষে যে প্রেম, তা রূপজ, স্নেহজ বা গুণজ। কিন্তু এ প্রেমে সর্বানুভূতি ও সর্বাতীত উপলব্ধির বিশুদ্ধতা আছে, সর্বসত্তার মূলগত আত্মবোধ ও কেন্দ্রানুগ আবেগের নিবিড়তা আছে। তাই এ প্রেম শুধু আনন্দ।

প্রেমের আনন্দ প্রেমিককে করে গতিমান। তাই পরমতম জনের সঙ্গে সাধক যখন যুক্ত হতে চায়, তখন স্বচ্ছন্দে সে মাটির সকল মলিনতা থেকে আপনাকে মুক্ত ক'রে শুভ্রপক্ষ মরালের মতো দূর-প্রসারিত নভোদিগন্তে পাড়ি ধরে।

বস্তুত সাধক-চিত্ত দূরের জন্য নিত্যচঞ্চল। এ চঞ্চলতা বেদনার তীব্রতায় উন্মাদ হয়ে ওঠে। তখন তার জীবনে যে উন্মাদনা দেখা দেয়, রূপ-মোহে ও রূপ-তৃষ্ণায় আচ্ছন্ন ও প্রমত্ত সাধারণ মানবমন তা'তে বিস্মিত হয়। বাঙলার বাউল সহজ কথায় সাধকের এ চঞ্চল ধাতের কথা বলেছেন :

> আমরা পাখির জাত।
> আমরা হাঁইট্যা চলার ভাও জানি না,
> আমাদের উড়ে চলার ধাত।

অনুরাগের বলেই তারা সব বন্ধন অতিক্রম করেন। সাধক-চিত্তের এ আনন্দ-আবেগ, বিচ্ছেদে যা বেদনায় রূপায়িত হয়, তাই আমরা উপভোগ করি কবি-সাধকদের কাব্যে ও কথায়।

পঞ্জাবের সূফী-কবি করীম বখ্শের একটিমাত্র গ্রন্থে 'বারাঁ মাহ্' বা বারমাসীর সন্ধান আমরা পাই। একটিমাত্র বারমাসীতে, একটি মাত্র পেয়ালায় সাধক-চিত্তে অফুরন্ত বেদনারস সাত-সাগরের চাঞ্চল্য ও উদ্বেলতা নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়েছে, একটিমাত্র হৃদয়রক্তে বেদনার সহস্রদলপদ্ম প্রেমের আলোকে স্নাত হয়ে বড় করুণ, বড় সুন্দর ও মধুরও হয়ে ফুটে উঠেছে।

করীম বখ্‌শের জীবন-কাল অনুমিত হয় মাত্র। তিনি দিল্লীর মুহাদ্দিস শাহ্ আবদুল আযীযের শিষ্য আবুল হাসান রচিত 'তফরিহুল আযকিয়া ফিল আম্বিয়া' পুস্তকখানির অনুবাদ করেন। সম্ভবত তিনি আবুল হাসানের শিষ্য ছিলেন। এ অনুমানে তাঁর জীবন-কাল উনিশ শতকের শেষ ভাগে নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ পঞ্জাবী অনুবাদের শেষ দিকে করীম শাহ্ তাঁর 'বারাঁ মাহ্ মুহাম্মদী' (অর্থাৎ মুহম্মদের উপর বারমাসী) সংযোজন করেন।

করীম বখ্‌শের বারমাসীতে আমরা মধ্যযুগের বাঙলা বারমাসী কবিতার ভাব ও ভাষার সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করি। মদীনা সূফীর আধ্যাত্মিক বাসভূমি এবং কবি আপনাকে মনে করেন একজন বিস্মৃত ও অবহেলিত আশিক।

কবির বাসভূমি অবশ্য আমাদের জানা নেই। তবে 'ভ'-এর স্থানে 'ব'-এর ব্যবহার দেখে মনে হয়, তিনি জলন্ধর বা হোশিয়ারপুর জেলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন সূফী, তাঁর 'তখাল্লুস' ছিল 'বদর'।
এখন তাঁর বারমাসীর অনুবাদে আসা যাক।

চেতর (চৈত্র----পঞ্জাবী সালের প্রথম মাস) ঃ

চেতর চিন্তা হরদম চমকে,
তরফ মদীনে যাবাঁ মঈ।
পকড়া জালী রোযে সনদী
রো রো হাল সুনাবাঁ মঈ।
ভা বিছোড়ে বিয়োগ বিখায়া
বসলো পানি পাবাঁ মঈ।
জে কর ইয়ারী করে নসীবাঁ
বদর পিয়া অংগ লাবাঁ মঈ।
চৈত্রের চিন্তা যে হরদম চমকায়,
মদীনা তরফ আমি যাই।
রওযার জাফরী বা জালি ধরে বলবো যে,
এই মোর হাল বেদনাই।
বিরহের অগ্নি যে পৃথক করেছে দোঁহে
তারপর মিলনের পানি ঢালি তাই।
এ নসীবে থাকে যদি আমাদের বন্ধুতা
বন্ধুরে বুকে ধরি ভাই।

বেসাখ (বৈশাখ—বছরের দ্বিতীয় মাস) ঃ

করন বেসাখ তৈয়ারী সাইয়াঁ
রলমিল নহাওন জওয়ান নুঁ।
উঠ্ উঠ্ পবে পলং দরিন্দা
মঞ্জী তত্তী দে খাওয়ান নুঁ।
মঞ্জী তত্তী তে তত্ তলত্তী জমী
দরদ উঠহাবাঁ নুঁ।
তেরে বাঝ রসূলা কেহড়া
কড়্ডা হাল সুনাবন নুঁ।
বৈশাখে বন্ধুরা তৈয়ার হয় সবে
মিলেজুলে স্নান করিবারে,
আমার পালং ওঠে তপ্ত আমারে চাহে
পশুর মতন গিলিবারে।
উষ্ণতা তাপে ঘেরা জন্মেছি আমি শুধু
দরদ-বেদনা সহিবারে।
তোমা ছাড়া, হে রসূল, কেহ নাই শুনাবো যে
আমার এ হাল আর কাঁরে।

জেথ (জ্যৈষ্ঠ—তৃতীয় মাস) ঃ

জেঠো হেঠ গর্মা দে আঞ্জী
দরদ বিচোড়া খাঁদা জে।
জলদ্ মদীনে সদ্দো হযরত,
নহী আযীয মর জাঁদা জে।
খাকে সরে তে চাক গরীবা
যোগী ভেস বটাদাঁ জে।
আই জান লাবাঁ তে হযরত,
দম দম দরদ সতাঁদা জে।
জ্যৈষ্ঠে ডুবিয়া থাকি গভীর দুঃখের বুকে
বিরহের বেদনা যে মোরে গ্রাস করে
জলদি আমারে ডাকো মদীনায় হযরত
সহ্য হয় না তর
তা না হলে এ গরীব মরে।
আহা যদি এ গরীব মরে।

ভস্ম মাথায় আমি অসহায় এ রাখাল
বদলাই যোগীর পোশাকে
মৃত্যুর নিকটে আমি, হযরত, প্রতি পল
এই ব্যথা জ্বালায় আমাকে।

হাড় (আষাঢ়—চতুর্থ মাস) :

হাড় মহিনে . হাড়ে ঘটাঁ রো রো
হাল বজাবাঁ মঈ
দূতী দুশমন কুল জমানা
কিওঁ কর জান বচাবাঁ মঈ।
চোরী চুপ্‌পে ভাইয়াঁ কোলোঁ
তরফ মদীনে জাবাঁ মাঈ।
ওহ্‌ কেহড়া দিন ভাগী ভরিয়া
জদ পিয়া অংগ লাবা মাঈ।

আষাঢ়ে দীর্ঘশ্বাস, কেঁদে আমি বারে বারে
সুরে সুরে কাহিনী শুনাই,
কেমনে বাঁচাই প্রাণ, আমার নিন্দায় শত
কথা বলে দুশমন সারা জামানাই।
চুপে চুপে ভাইদের কাছ থেকে দূরে দূরে
গোপনে চলেছি মদিনায়,
সেদিন কী ভাগ্যের, অতি শুভ সেই দিন,
যেদিন বুকেতে ধরি সে প্রিয়তমায়
আহা সে প্রাণ-সখায়।

সাবন (শ্রাবণ—পঞ্চম মাস) :

সাবন সৈন্‌ না বিরহোঁ দৈঁদা
রো রো চিকা মারা মঈ।
অইহ্‌ মহ্‌বুব হবীব খুদা দে,
কিস্‌ দর জায়ে পুকারা মঈ।
দুশমন পালে দূতী বেহড়া
কিকর উমর গুযারা মঈ।

আই জান নবাঁ তে জানী জান
তেরে তো বাড়া মঈ।
শ্রাবণে বিরহে আহা ঘুম নাই চোখে আর
'কেঁদে কেঁদে করি চীৎকার,
খুদার হাবীব শোনো, কোন্ পথে কোন্ দ্বারে
আমি যাব, ডাকি বারবার।
দুশমনে পালি, তারা আমার কুৎসায় রত
এ জীবন কাটাবো কি করে,
জীবন এসেছে ঠোঁটে, আমার জীবন, শোনো,
কুরবান শুধু তোমা তরে।

ভাদ্রোঁ (ভাদ্র—ষষ্ঠ মাস) ঃ
ভাদ্রোঁ ভাহ্ বিচোড়ে ভবকি,
জল বল কোলা হোবাঁ গী
খাল্লী মইহল ডরাওয়ান সঈয়ো
হাজ্ হার পবোবাঁ গী।
ঘর দে ওয়ালী জাত না পুছ্ছি
কিস্ অগ্গে জা রোবাঁগী।
চল মদীনে খাবিন্দ অগ্গে
হুণ হত্ বন্হ্ খলোবাঁগী।

ভাদ্রে এ বিরহের আগুন জ্বলেছে, আমি
জ্বলে হই পরিণত কয়লায়,
শূন্য মহল মনে ভয় হয়, বন্ধুরা,
মালা গাঁথি অশ্রুর বন্যায়।
আমার গৃহের প্রভু চাহেনি আমার জাত
কার কাছে যাবো কাঁদি তাই,
মদীনায় চল যাই প্রভুর সম্মুখে দুই
হাতজোড় করিয়া দাঁড়াই।

অসোজ (আশ্বিন----সপ্তম মাস) ঃ
অসোজ আস নহ্ী কুঝ বাকী মঈ
আসী কুরলাঁদী হাঁ,

তেরে দরদ্ বিচোড়ে হযরত,
খুন জিগর দা খাঁদী হাঁ।
লিক্খিয়া লেখ নসীব অযল দা আই
ঝোলী হুণ পাঁদী হাঁ।
সারওয়ারে আলম দোহী জাহানী
তেরি গোলী বাঁদী হাঁ।

আশ্বিনে আর কোন আশা নাই পাপী আমি
বিলাপে সকল বরবাদ,
তোমার বিচ্ছেদে ব্যথা, হযরত, আমি পাই
হৃদয়ের খুনের আস্বাদ।
অনন্তের বুকে মোর ভাগ্যের লিপি লেখা,
প্রাণে তার পেয়েছি আভাস,
দুই জাহানের তুমি সরওয়ার, আমি আছি
বিনীত তোমার ক্রীতদাস।

কত্তক (কার্তিক—অষ্টম মাস) :

কত্তক কৌন সুনে ফরিয়াদাঁ তূঁ
সরওয়ারে সুলতানা হই,
তূঁ মহবুব রসূল খুদা দা
ওয়ালী দোহীঁ জহানী হই।
তেরী খাতির পইদা হোয়া,
যে জিমিআঁ অসমানা হই।
দুনিআঁ অন্দর হশর দিহড়ে
তূঁ মেরে খসমানা হই।

কে শুনিবে ফরিয়াদ তোমার খিলাফে যবে
তুমিই যেখানে সুলতান,
আল্লাহ্‌র মহবুব তুমি প্রিয়তম নবী তাই
সারওয়ারে তুমি দো-জাহান।
তোমার খাতিরে সৃষ্টি আকাশ ও যমীনের
যাহা কিছু আছে বুকে তার,
হাশরের মত মোর দিন কাটে পৃথিবীতে,
তুমি বন্ধু, প্রভু যে আমার।

মগ্‌ঘর (অগ্রহায়ণ---নবম মাস) ঃ

মগ্‌ঘর মুক্‌ক্‌ রহী হাঁ হযরত
আয় করো দিল দারী মঈ।
লখ লখ বারী বারী জাওয়াঁ ঘোল
ঘতাঁ ইক্‌ বারী মঈ ।
খেশ কবীলা ঘোল ঘুমাবাঁ
হো কুরবান নক্কারী মঈ।
জে ইক ঝাত মেঅসর আবে
দোঁহী জাহানী তারী মঈ।
অগ্রহায়ণ, হায় জীবন ফুরায়ে আসে
হযরত এসো, প্রাণ দাও
লাখ লাখ বার আমি তোমা তরে কুরবান
চিরতরে কুরবান আজ করে নাও।
পরিজন-বন্ধুরে কুরবান করি আমি
দীন আমি, গুণহীন তাই
কুরবান করি মোরে। দু'জাহানে বাঁচি যদি
অনুকূল দৃষ্টিরে পাই।

পোহ (পৌষ---দশম মাস) ঃ

পোহ্‌ মহিনে সরওয়ার বাঝো
জো সংগ মেরে বিতি জে
শা'আলা' দুশমন নাল না হোবে
জহী বিছোড়ে কিতি জে।
কি আকখাঁ মাঈ ইশক কবলিআঁ
মৌত আপে মংগ লিতি জে
যইহর পয়ালী ইশকে ওয়ালী
মিত অকখী মঈ পিতি জে।
এ পউষ মাহিনায় সরওয়ারহীন আমি
কি হয়েছে কি দশা মরণ।
আল্লাহ্‌ যে হাল এই বিরহ করেছে তাহা
দুশমনেরও না হয় কখন।

সরওয়ার—আশ্বিন ও কার্তিকেও সরওয়ার শব্দের ব্যবহার আছে। সরওয়ার শব্দের অর্থের সম্মিলিত নেতা বা সর্দার। হযরত রসূলুল্লাহকে সরওয়ারে দোজাঁহা —দুই জাহানের সর্দার এবং সরওয়ারে কায়েনাত—দৃশ্য জগতের নেতা বলা হয়। শাআলা'— যা শা' আল্লাহ্‌'র সংক্ষেপ অর্থ—আল্লাহ্‌র যা ইচ্ছা।

প্রেমের একটি গ্রাস আমি, তাই কি বলবো ?
মৃত্যুরে আশা করি নিজে
দু'চোখ বুঁজিয়া পান করেছি প্রেমের বিষ
পেয়ালায় তার স্বাদ কী যে !

মাঘ---(একাদশ মাস) ঃ

মাহী মাঘ না মঈ ঘর আয়ে
খালি সেজ দরাবেগী
পইয়াঁ বরফাঁ সরদী শুরাকী
সরদী পীড় খপাবেগী।
বেলী মেলী সংগ না বেলী
বদর হবেলী খাবেগী।
আহ্ হযরত, দিদার বিক্‌খাও
থোক কলেজে জাবেগী।

মাঘ মাসে ঘরে নাহি আসে মোর প্রিয়তম
শূন্য শয্যা করে শঙ্কিত যে,
তুহিন তুষারপাত, প্রচণ্ড শীতের ব্যথা
আমার বেদনা দেয়, বঞ্চিত যে।
সাথে নাই বন্ধু যে নির্জন হাবেলী যেন
গ্রাস করে একান্তে আমারে।
আহা হযরত, দাও তোমার দিদার শুধু
নহে তো পোঁছাবে ব্যথা হৃদয়ের তারে।

ফাগুন (ফাল্গুন---দ্বাদশ মাস) ঃ

ফগন ভুখথী সুহে সাদে
তঈ বাঝেঁ কুঝ ইয়াদ নহীঁ।
গুজরিআঁ সাল না সজ্জন আয়ে
জা কোঈ ফরিয়াদ নাহীঁ।
অইহ্ মকবুল রসুল খুদা দে
বিন তেরে দিল শাদ নহীঁ।
জায় পুকারাঁ বিচ মদীনে
কিওঁ হুনদী ইমদাদ নহীঁ।

ফাল্‌গুনে ভুখা আমি লাল রঙ মুছে গেছে
তোমা ছাড়া মনে নাহি আর,
অতীত হয়েছে সাল, প্রিয়জন আসিল না
নাহি কোন ফরিয়াদ তার।
খুদার মক্‌বুল নবী, তোমা ছাড়া হৃদয়ের,
জীবনের নাহি কোন স্বাদ।
মদীনায় যাবো আর তোমাকে ডাকবো সেথা
নাহি মোর তারে ইমদাদ ?

মাসের পর মাস যায়, বছর ঘুরে আসে, কিন্তু সাধক মনে যে আগুন জ্বলেছে সে আগুন তো আজও নিভলো না! বেদনার উত্তপ্ত বাষ্প-নিঃশ্বাস মনের আকাশে পুঞ্জীভূত হয়েছে। একদা হয়তো প্রিয়তম জনের প্রেমের স্নিগ্ধ-শীতল স্পর্শে প্রতীক্ষিত বর্ষণের তৃপ্তিকর প্রলেপে সাধকের সকল উষ্ণতার অবসান হবে।

বর্ষ-মাসের ঋতু-চক্রে আমাদেরও মনের আনন্দ-বেদনা, দ্বন্দ্ব-সংশয় ও আশা-নিরাশা আবর্তিত হ'তে থাকে। একদিন অকস্মাৎ সূর্যের উত্তপ্ত আলোকে অগ্নি-স্নান ক'রে বর্ণসুষমার সহস্র দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে মিলনের পদ্ম-দল বিকশিত হবে।

সেদিন আসন্ন, না সুদূর কে জানে ?

গনদিলা বাহাদুর

'গনদিলা' শব্দের অর্থ যাযাবর। পঞ্জাবের সূফী বাহাদুর ছিলেন যাযা-বর, পঞ্জাবী অর্থে গনদিলা। যাযাবরের জীবনের একটি গতি আছে, বাধা-বন্ধনহীন, দ্বিধা-মুক্ত গভীর জীবন। অনেক দার্শনিক গতি অর্থে প্রেমের ব্যবহার করেছেন। কারণ প্রেম জীবনে আনে গতি, লেলিহান অগ্নির সঙ্গে এ গতির সগোত্রতা, নদীর দুর্বার উদ্দামতার সঙ্গে গতির স্বাজাত্য।

গীতি-কবিতার সাধক ও কবি যাঁরা, তাঁদের জীবনে প্রেমের উন্মেষ হয় গীতি-কবিতা ও সঙ্গীতের মধ্যে। এক বিশেষ বস্তুর স্পর্শে এ প্রেমের উদ্‌গম ; কিন্তু তা কোন বস্তুর দ্বারা লালিত বা বস্তু-অনুবিদ্ধ নয়। সূফী বাহাদুরের প্রেমের উন্মেষ হয়েছিল অত্যন্ত আকস্মিকভাবে এবং বিশেষ থেকে। বস্তুত প্রেমের উন্মেষ সর্বদা বিশেষ থেকে। কিন্তু প্রেমের প্রাবাল্যে কবি ও সাধক পরিমিত পরিবেশকে পরিত্যাগ করেন, বিশেষ তখন নির্বিশেষে পরিণত হয়। সূফী বাহাদুরও বিশেষকে পরিত্যাগ ক'রে নির্বিশেষের উদ্দেশ্যে যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করেন।

তবে এ নির্বিশেষকে উপলব্ধি করবার জন্য প্রতীকের প্রয়োজন। কবিতার ক্ষেত্রে শেলীকে দেখেছি এপি-সাইকিডিয়ানে ইমিলি এবং অ্যালাস্-টর-এর আরব-কুমারী ক্ষেত্র বিশেষ তাঁর প্রতীকের কাজ করছে। শেলীর মতে অনন্ত সৌন্দর্যের উপলব্ধির জন্য নারী-সৌন্দর্যের প্রয়োজন, রমণীর সৌন্দর্য বিকাশের মধ্যে তিনি বিশ্ববিমোহিনী কান্তিকে অনুভব করেছেন। বাস্তব জগতের রমণীরা হলো এ সৌন্দর্য উন্মেষের উপাদানস্বরূপ। সাধনার ক্ষেত্রে আমরা বাহাদুর শাহ্‌কে দেখি, নারী-রূপের সম্মোহনে তিনি মুগ্ধ। এ রূপ-মোহকে মায়া ব'লে স্বীকার করেও তিনি প্রেমের পূর্ণা-হুতি যে নির্বিশেষে, সেই উপলব্ধির জন্যও যে তা একান্ত দরকার, সে কথা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন।

সূফী বাহাদুরের যাযাবর বৃত্তি গ্রহণের মূলে বিশেষভাবে কাজ করেছে তার সৌন্দর্য-লিপ্সা। এ সৌন্দর্য-পিপাসা তাঁর জীবনে সহজ সাধনায় রূপান্ত-রিত হয়। এ সাধনা নির্বিকল্প সমাধি নয়। পরিপূর্ণ সৌন্দর্য উপভোগ ও উপলব্ধির মধ্যে আত্মরতি গভীর আনন্দ-আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে সর্বাতীত

জনকে স্পর্শ করেছে। তাঁর মর্ত্য-প্রণয়পূর্ণ বিকাশলাভ করছে বিশ্ব-প্রণয়ের মধ্যে। সৌন্দর্যের এ ধ্যান ও আর্তি বিশেষ এক রূপ বা দৃশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

সূফী বাহাদুরের আত্মা ছিল অনন্তাভিসারী। তাই গতি তথা যাযাবর বৃত্তিই তার জীবনের কাম্য ও সিদ্ধিলাভের পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

সূফী বাহাদুরের জীবনকাল ১৭৫০ এবং ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বলে অনুমিত হয়। এ অনুমান অবলম্বন ক'রেই আমরা তাঁর জীবন-কাহিনী রচনা করি। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন দুর্বিনীত। অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করাই ছিল তাঁর আনন্দ। তাই তাঁর বন্ধুরা ধীরে ধীরে চরম শত্রুরূপে দেখা দেয়। এ বিপর্যস্ত অবস্থায় দেখা হলো পীর মুহম্মদের সঙ্গে। তাঁর স্পর্শে বাহাদুরের অতীত এক নতুন আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। নতুনভাবে তাঁর জীবন গড়ে উঠলো, আল্লাহ্‌র প্রেমের পথে তাঁর যাত্রা শুরু হলো। তিনি হলেন ভ্রাম্যমাণ ফকীর। এইজন্যে তাঁকে আমরা 'গনদিলা' আখ্যায় ভূষিত হ'তে দেখি।

স্থিতিতে বাহাদুর শাহ্ প্রেয়সী ও পরিমিত পরিবেশের রঙে ও রসে অনুরঞ্জিত হয়েছিলেন। গতিতে তিনি পরম প্রিয়তম আল্লাহ্‌র উচ্ছ্বসিত প্রেমের আনন্দ-রসে অনুসিক্ত হলেন, পবিত্র কুরআনের কথায় এ ভাবকে অতি সুন্দর ও শিল্পময় ভাষায় বলা হয়েছে 'সিব্‌গাতুল্লাহ্' আল্লাহ্‌র রঙের অনুরঞ্জন। এ অনুরঞ্জনে সূফী বাহাদুরের দেহ-মন, সর্ব-সত্তা ও অন্তরাত্মা নবলব্ধ বোধময় আনন্দ ও নিগূঢ় স্ফূর্তি লাভে গতিও বাঙ্ময় এবং দিগাতীত স্থানে পরিব্যাপ্ত হলো। এ পরিব্যাপ্তিতে গতি হয় গগন-চুম্বী এবং পরমতম জনের প্রেম-স্পর্শে ধন্য ও প্রাণময়। বাহাদুরের জীবনে বিশ্বব্যাপী এ গতিতত্ত্ব সাধনা ও কল্পনার দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়ে শিল্প ও আনন্দ-রসে অভিষিক্ত হয়েছে।

তিনি উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মত্ততার যুগ পার হয়ে এলেন। তাঁর জীবনে দেখা গেল চলার আনন্দ ও মাশুকের প্রেম-প্রার্থনা। তিনি বলছেন,

মেরী জাত গন্‌দিলী আহী
হরদম মংদি ফযল ইলাহী।
অসী গংদিলে জাত কমিনে
সব কোঈ সাথো ডরদা।

মঙ্গন খইর যাইয়ে যিস ভেড়ে
দূর দূর চূর চূর করদা,
আপে ঝিড়কে আপে দেঁবেঁ
সাথো কুঝ না সরদী।
জাত মোর যাযাবর হরদম চাই আমি
ফজল বা প্রেম ইলাহীর।
বেদে আমি ছোট্ট জাত আমাকে যে সকলেই
ভয় করে শঙ্কা গভীর।
যে পথেই যাই আমি ভিক্ষায়, তারা সবে
ঘৃণা ভরে বলে দূর দূর,
তুমিও মন্দ বলো, আবার ভিক্ষা দাও, জানি আমি
অক্ষম, তবু কি মধুর!

কবি ও সাধকের নিকট বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্যের স্বরূপ রহস্যাবৃত। বিশ্ব-রতিতে নিত্য যে সৌন্দর্য উচ্ছ্বসিত এবং শত সহস্র ধারায় উৎসারিত হয়ে চলেছে, তার মূলে যে শক্তি বিদ্যমান, সম্যক জানতে বা উপলব্ধি করতে না পেরে কবি ও সাধকগণ তাকে মায়া, সম্মোহিনী শক্তি, বিশ্ববিমোহিনী কান্তি ইত্যাদি নামে ভূষিত করেছেন। বাহাদুর সেই বিশ্ববিমোহিনীর কান্তিকে (অর্থাৎ বাঙালী মেয়ে যাদুকর। বাঙলার বাইরে মধ্য যুগে বাঙালীরা সুদক্ষ যাদুকর বলে খ্যাত হয়। বিশেষ করে বাঙালী মেয়েরা এ যাদুবিদ্যায় বিস্ময়করভাবে পারদর্শিনী বলে পঞ্জাবীদের ধারণা ছিল) 'বঙ্গালী' বলে অভিহিত করেছেন। বাহাদুরের মতে, মায়া একটি অদৃশ্য ও প্রচ্ছন্ন শক্তি। এ শক্তি মানুষের দেহ-মন ও আত্মা নিয়ে খেলা করতে পারে অর্থাৎ মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক প্রতিভা এ শক্তির স্পর্শে ও প্রেরণায় পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। বেদান্তের মায়াবাদের মতো তা নিরর্থক অলীক বা প্রলুব্ধকারী নয়। তাঁর এ মায়া বিশ্বরূপিণী বা বিশ্ববিকাশিনীর সর্বশক্তি আকর্ষণকারী দুর্বার প্রেম। এ প্রেমের আনন্দে ও ইশারায় বিশ্ব চালিত ও বিধৃত। মায়া যাদুকরী, তার হাতে যাদুর বাঁশী। সেই বাঁশী বাজছে ঃ

আলিম ফাযিল পণ্ডিত দানে
সুন সুন বীণ হোয়ে মস্তানে

ভুল গঈ পূজা নিয়ত দুগামে
অইসী প্রেম ঝড়ী সির পাঈ।
দেখো কৌন বঙ্গালন আয়ী
অইসী রসকর বীণ বজাঈ।
মীর মলিক বাদশাহ্ উনানী
দাবে থককে কর নফসানী
খির খির বাগ হোয়ে গুল ফানী
রহী হুকুমত না ইক্ রাঈ,
দেখো কৌন বঙ্গালন আয়ী
অইসী রসকর বীণ বজাঈ।

আলিম ফাযিল আর পণ্ডিতও সকলেই
সেই বাঁশী শুনে শুনে হলো যে মস্তানা,
ভুলে গেছে পূজা সবে তাদের নিয়ত অন্য
এমনি প্রেমের মন্ত্র শিরেতে অজানা;
দেখো কোনো বাঙ্গালিনী 'যাদুকর' রসবতী
নিখুঁত সুরের জালে বাঁশরী বাজায়
মীর ও মালিকগণ ইউনানের বাদশা যে
পরিশ্রান্ত পৃথিবীর আশা বাসনায়।
বাগানে ফুটেছে ফুল ঝরে যায়,
হুকুমত রহিল না তিলটি নিঃশেষ;
দেখো কোন বাঙ্গালিনী রসময় সুরে সুরে
বাজায় বাঁশরী তার মধুর আবেশ!

চরম মিলন লাভের কথা বাহাদুর বলেছেন এভাবে:

সাংগ সবর গুদেলা কলমা
গুর স্নেহ্ সায বতায়া,
কসরত বন্দ নমায ধুনধালিত্ত
রাহ্ বইহ্দত দে লায়া।
সবরের বেশ গায়ে
কলমার কম্বল পরি আমি তাই
গুরু এই পদ্ধতি শিখায়েছে
সেই পথে আমি চলে যাই।

নমাযে কুয়াশা কাটে
অজ্ঞানতা সব দূরে যায়
তার জন্যে মুক্ত আমি
চলেছি একের সঙ্গে মিলন আশায়।

সোজা কথা তিনি সোজা ভাষায় বলেছেন। আবেগ-প্রশ্রিত নয়, তবু এ কথা মনকে স্পর্শ করে, কারণ এ কথার পশ্চাতে সাধকের বহু দিনের অন্তরতম বেদনার উপলব্ধি ও বিচিত্র অনুভূতি বিদ্যমান।

গুলাম হুসাইন

উনবিংশ শতকের কথা। পঞ্জাবের সুফী-ভাবের ও প্রেমের রঙ ফিকে হয়ে এসেছে। এখানে সেখানে একটু-আধটু রঙ তখনো লেগে আছে। বসন্ত যায়-যায়, তবু তার নেশা লেগে থাকে অন্তে ফোটা শিরীষের গুচ্ছে, মহুয়ার শেষ মওসুমে।

চেনাব নদীর তীরে কেলিয়ানওয়ালা গ্রামে জন্ম গুলাম হুসাইনের। পঞ্জাবী সাহিত্যের শেষ মুষ্টিমেয় মরমী কবিদের অন্যতম তিনি। গুলাম হুসাইন দু'টো সিহারফি লেখেন ; একটি সিহারফি 'হীর', অন্যটি 'বারামাহ্' (বারমাসী)। তার ভাষা অত্যন্ত সরল ও স্বচ্ছ, মধ্যযুগের আলংকারিক কৃত্রিমতাবর্জিত। পুরনো কথাই তিনি বলেছেন, কিন্তু তা হৃদয়ের পরিপূর্ণ আবেশ ও উচ্ছ্বসিত ভাবরসে অনুদীপ্ত এবং অনুসিক্ত ব'লে, তার স্বাদ, গন্ধ ও রঙের পরিবর্তন হয়েছে। সাহিত্য তো যুগে যুগে এমনিভাবেই নতুন রূপ নেয় অর্থাৎ সাহিত্যের বিষয় কি, তাই বড় নয়, আসল কথা হ'লো কি করে তা' বলা হয়। এ বলার ভঙ্গিই তো কালে কালে বদলায়। শুধু সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে নয়, প্রেমধর্মের ব্যাপারেও এ কথা খাটে। প্রেমের পরিবেশনের নতুনত্ব ও বৈচিত্র্যের কথাই বলছি। গুলাম হুসাইনের প্রকাশ দেখুন ঃ

মিম মুটঠিআঁ কুটঠিঁয়া ইশক তেরে,
 গঈ ষৌক বিচ বিহা, রাঁঝা
হোই নফি তেরি অসবাত পিছে
 ছড্ডি আপনি যত্ সফাত রঁঝা।
হোই মহব তসবির মঈ হুসন তেরে
 দিতে বহিম খিয়াল উঠা রাঁঝা,
বাকী জাত হই জাত হুসাইন তেরি
 রহী লুঁলুঁ দে বিচ সমা রাঁঝা

মিম ঃ আসক্ত তোমার প্রেমে,
 পরম তৃপ্তিতে রাঁঝা নিজকে হারাই,
আমি নাই, তুমি আছ
 আমার সকল সত্তা গুণ রাঁঝা নাই কিছু নাই

নিমগ্ন তোমার রূপে ছবিতে ও দৃশ্য রসে
অরূপ তোমার জন্য নগণ্য খেয়াল,
ছেড়েছি, কি আছে বাকী, তুমি ছাড়া, শুধু তুমি
প্রতি রোমে রন্ধ্রে তুমি, তুমি চিরকাল।

অরূপের রসরূপকে অবলম্বন ক'রে সূফীকবির আত্মবিলোপ ঘটেছে। একাধারে কবির রূপমুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টি ও প্রেম এবং সাধকের আত্মনিমজ্জনের আর্তি।

রাঁঝার জন্য মন যখন ব্যাকুল হয় তখন কি তা কোনও বাধানিষেধ মানে? রাঁঝার জন্য হীরের প্রাণ কেঁদে উঠেছে। (পাঞ্জাবী সাহিত্যের বিখ্যাত হীর রাঁঝা বা হীর রানঝা লোকগাথাটি সূফী-সাধকগণ রূপকভাবে ব্যবহার করেছেন) হীরের মা নিষেধ করছেন, সৎ উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু সাধকের ব্যাকুল মন কি আর বাধা মানে? হীরও মায়ের কথায় জবাব দিয়ে বলছে:

বে বস মত্তী সানু দস নাহী
অসাঁ সমঝ্ লেঈঅই তেরি রস মাঁঅই।
কাবে বল করেনি এঁ কনড মেরি
কেহরি নাল হদীস দে দস মাঁঅই।
রাঁঝা জান দে বিচ মকান মেরা
রিহা জীব নহী মেরে বস মাঁঅই---
মাহী নাল হুসাইন ফকীর হোসাঁ
তেরে খেড়িআঁ দে সির ভস্ মাঁঅই।

থাক থাক মাগো আর দিও না কো উপদেশ
তুমি কি বলতে চাও জানি---
কাবাকে পিছনে রাখি, কোন্ শরীয়ত মতো
বলো মাগো বলো তবে মানি।
আমার আশ্রয় রাজা জীবনের শোনো মাগো
আমি যে আমার বশে নাই,
প্রিয়তম সাথে আজ আমি যে ফকীর হবো
তোমার কথার শিরে ছাই।

তাঁর জীবনীতে পাই—চেনাব নদীর তীরে কবির দুঃখ ও দারিদ্র্যময় দিন কাটে। কিন্তু তাঁর কাব্যে কোথাও এর আভাস পর্যন্ত নেই। কারণ প্রিয়তমকে একমাত্র আশ্রয় জেনে তাঁর মন ছিল প্রসন্ন। তাই তাঁর ভাব ও ভাষায় মুক্ত প্রেমের প্রসন্নতারই পরিচয় পাই। সকল বিক্ষুব্ধ ও উষ্ণতা-উত্তাপ থেকে মনকে তিনি দূরে রেখেছিলেন, প্রিয়তমের প্রতি সমগ্র অনুরাগ তিনি সযত্নে লালিত করেছিলেন। তাঁর কাব্য তাই সহজেই প্রশান্ত মানব-মনের চিরন্তন আবেগ বহন করছে।

কাব্য বা সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম কথাই হলো বিষয়বস্তুর প্রতি নিবিড় অনুরাগ তিনি সযত্নে লালিত করেছিলেন। তাঁর কাব্য তাই সহজেই প্রশান্ত এ যুগের তার আরেকটি স্বচ্ছন্দ প্রকাশ-পরিচয় ঃ

মাটির কুটিরে আমি বসে আছি, আমার বিলাস,
যদিও বা ক্ষুদ কণা খাই আমি তোমার আকাশ
ফাঁকে ফাঁকে চেয়ে দেখি, অবারিত মনের দুয়ার
খুলে যায়, ছাড়া পায় পাখি দু'টি ডানা মেলে তার
উড়ে যায় শূন্যে কোন দুরান্তের স্বপ্নভরা চোখ,
সেখানে অরণ্য মায়া কম্পমান তারার আলোক!
তুমি পাশে, সে কী তৃপ্তি! প্রাণবন্ত সরাগ আভায়,
রূপসীর ওষ্ঠ আর আপেলের মঞ্জরী কাঁপায়
তোমার আবেগ। তাই আমি কবি আনন্দ আমার
সৃষ্টি করি অনুরাগে, সীমিত সে তবু বারবার
তোমার সমুদ্র-স্রোত স্পর্শ করে, কখনো দুর্বার
অতৃপ্ত পিপাসু মন, জেগে ওঠে কামনা বন্যার।
তবু শান্তি। এই পাশে ফুটে আছে অজস্র গোলাপ
তোমাকে যে ভালবাসি, এযে তার রক্তিম প্রলাপ!

মধ্যযুগ থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত এ উপমহাদেশের যে সকল সাধক-কবি প্রেমের পথে অভিসার-যাত্রা করেছেন, তাদের জীবন সাধন-ধারা সর্বত্র সূফী ভাবরসে অভিষিক্ত এবং সেই সূফী-সাধকদের সহযাত্রী হতে আমরা চেষ্টা করেছি মাত্র। প্রেমের যোগে পরম প্রিয়তমের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আকাঙক্ষা ও চিত্তবৃত্তি চিরন্তন ব'লে সেই সুদীর্ঘ অতীতকালের কাহিনী আজো ভোরের শিশির-ভেজা টগরের মতো অম্লান ও আনন্দশুভ্র হয়ে আছে।

তাই ভারত, সিন্ধি ও পঞ্জাবী সূফী-সাধকগণ বাঙলাদেশের সূফী-সাধকদের সমগোত্র। অনুরাগের গতিবেগেই তারা সকল বাধাবন্ধন অতিক্রম করেছেন।

তাঁদের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সৃষ্টি-সৌন্দর্য-মুগ্ধ দৃষ্টি ও মন অবলম্বন ক'রে অতি সহজেই তারা তৎসমাধিতে অর্থাৎ আনন্দ-ভাব-তন্ময়তায় তলিয়ে যান। আমাদের বাউলের কথায়,

> সকল অঙ্গ খাইয়া ফেলো না রাখিও বাকী,
> রসিয়া বন্ধুর লাগি রাইখো দু'টি আঁখি।

এই রসিয়া বন্ধুর বাইরের রূপ-সুষমায় সূফীর দৃষ্টি-মুগ্ধ, নয়ন তৃপ্ত আর তার ভিতরের রস-সমৃদ্ধিতে হৃদয়-মন স্বতঃ উচ্ছ্বসিত এবং সেইজন্যই তার প্রকাশ এতো মধুর ও মর্মস্পর্শী। সূফী-কবির আবেগ তাই অদম্য এবং তাঁর প্রকাশের আতি অত্যন্ত ব্যাকুল ও সর্ব মুহূর্তের সমৃদ্ধিতে তা সঙ্গীতময়। সাধক-কবি দাদুর অন্যতম ভাব-শিষ্য রজ্জবজীর কথায় এই ব্যাকুলতা আমরা স্পষ্ট হতে দেখি,

> গৈব কুঁরূপ দে
> মৈন কুঁভাস দে,
> বাণী দে বাণী দে, দে দে প্রকাশ দে।

অর্থাৎ যা অদৃশ্য তাকে রূপ দাও, যা মৌন তাকে ভাষা দাও, বাণী দাও, প্রকাশের শক্তি দাও।

আমাদের দেহমনের প্রকাশ তো অহরহ চলছে। কিন্তু আত্মার রতি ও আতি? তার প্রকাশের জন্য কোনও ব্যাকুলতা তো আমরা অনুভব করিনে। তাই সাধকদের সঙ্গে আমাদেরও প্রার্থনা ও ঐকান্তিক আবেদন হোক্—বাণী দে, বাণী দে, দে দে প্রকাশ দে।

এতক্ষণ আমরা বিভিন্ন দেশের সাধকদের সাধন-জীবনের পরিচর্যা করেছি। আমরা দেখেছি, সকল সাধকই ছিলেন নবীজীর একান্ত ভক্ত অনুসারী ও প্রেমিক। নবীজীকে গভীরভাবে ভালবেসেই তাঁরা আল্লাহ্‌কে ভাল বেসেছিলেন। অতল অন্তর-প্রশ্রয়ে আমরা তাদের মত নবীজীকে ভাল বেসে আল্লাহ্‌কে ভালবাসা বা এ হবে আমাদের ঐকান্তিক কামনা ও সাধনা। অনুষ্ঠান নয় অন্তরঙ্গতাই হবে আমাদের এ সাধনার প্রধান ও একমাত্র অবলম্বন।

উত্তর-বন্ধ

গ্রন্থের প্রথমে মুখবন্ধ না ব'লে পূর্ববন্ধ বললেই ভালো হতো। কারণ পূর্বরাগের পরে আসে উত্তররাগ। প্রেম, প্রজ্ঞা ও প্রত্যাশা তখন নিবিড় ঘন ও আনন্দময় হ'য়ে ওঠে। সুফী সাধনার যুগ-নির্দেশরূপে বলা যায়, এ উপমহাদেশে তার সময়কাল দশম শতক থেকে শুরু এবং অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত তার ব্যাপ্তি ও সক্রিয় প্রসারণ। সক্রিয় শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। ইসলাম জগতের প্রথম দুই অর্থাৎ অষ্টম ও নবম শতক কর্ম-সাধনার যুগ। এ যুগে বিপুল কর্ম-প্রচেষ্টা ও সংগঠন শক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে ইসলাম পৃথিবীর সর্বত্র সম্প্রসারিত হয় এবং স্থিতি ও স্থায়িত্ব লাভ করে। পরবর্তী দশ শতক সাধনার যুগ। এ যুগেই সুফী তথা মরমী সাধনার উন্মেষ এবং তার চর্চা ও অনুশীলন চলে এবং তার ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটে। এভাবেই কর্ম ও জ্ঞানযোগের ভিতর দিয়ে ভক্তি-যোগে উত্তরণ অর্থাৎ দেহমনকে শরীয়ত তথা আনুষ্ঠানিক কর্মবন্ধনের দ্বারা সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত করবার পর 'মরমিয়া যোগ আল্লাহ্‌র প্রেমে' শুরু হয়। এবং এটাই স্বাভাবিক কারণ দেহ ও চিত্ত-শুদ্ধির পরই প্রেমের (ভক্তি শব্দটি আমি ইচ্ছে করেই ব্যবহার করলাম না, কারণ ইসলামে পরমের সঙ্গে মরমের যোগ প্রেমের ভিতর দিয়েই সংঘটিত হয়। কুরআন শরীফে 'হুববুন' বিশুদ্ধ প্রেম অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে) আনন্দ-লোকে উত্তরণ। প্রেম, প্রেমিক ও সাধক অর্থে আমি মরম, মরমীয়া ও মরমী শব্দগুলোর ব্যবহারের পক্ষপাতী—কিন্তু মরমীবাদের ধার দিয়েও যাইনি, কারণ বাদ শব্দে বিসংবাদের প্রশ্রয় আছে।

অষ্টাদশ শতকের পরে বস্তু-প্রাধান্যের যুগ শুরু হলে সুফী তথা প্রেম-সাধনার প্রতি সমষ্টি-মানুষের আস্থা শিথিল হয়ে আসে এবং ব্যষ্টি-মানুষের অন্তর-লোকে আশ্রিত হয়ে তা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে এবং এখনো চলছে, চিরকাল ধরে চলবে। কারণ বস্তুর চমৎকারিত্বে ও সম্মোহনে বাই-রের মন একান্তভাবে মুগ্ধ ও নিবিষ্ট হলেও ভিতরের মন পরমের সঙ্গ ও মিলন-কামনায় চিরকালের জন্য প্রতীক্ষারত থাকবে। তাই বর্তমান যুগ শতকে এক সঙ্গে কর্ম ও সাধনার অনুশীলন চলবে। সুফী-সাধকগণ বহু পূর্বে আপন আপন সাধন-লোকে প্রয়াণ করেছেন, কিন্তু তাঁদের কথা

ও আত্মিক প্রভাব আমরা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ, অনুভব এবং উপলব্ধি করি। সূফী সাধকগণ তাঁদের জীবন ও সাধনা দিয়ে প্রমাণ করেছেন, আল্লাহ্-রসূলের দীনুল কাইয়িমা স্থায়ী প্রতিষ্ঠিত ধর্ম এবং সিরাতুল মুসতাকীম এই সহজ সরল পথই সত্য এবং পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবনকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করে গড়ে তোলার একমাত্র উৎকৃষ্টতম অবলম্বন। তাঁদের সাধন-জীবন থেকে আরেকটি কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে—সূফী তথা প্রেম-সাধনার মূল উৎসের সন্ধান ও প্রেরণা তাঁরা নবীজীর আদর্শ-সুন্দর জীবন থেকে লাভ করেছেন। নবীজীকে ভালবাসাই আল্লাহ্কে ভালবাসা—পবিত্র কুরআনের এই বাণীর তাৎপর্য তাঁরা জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। নবীজী সর্বক্ষণ আল্লাহ্র যিকরে রত থাকতেন, আল্লাহ্র স্মরণে ও তাঁর মহিমা প্রচারে আপনাকে সর্বদা এবং সযত্নে প্রচ্ছন্ন প্রেক্ষিত-চেতনায় বিলীন রাখতেন। احد-এ মিম যুক্ত হয়েই احمد শব্দের উৎপত্তি এবং পরে মুহম্মদ। নবীজীর অন্য নাম আহমদ (যার মধ্যে তিনি মিমে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছেন) শব্দে সূফী বা মরমীর ভাবধারার গূঢ় তাৎপর্য, একত্বের, পরম একের বা মাশুকের সর্বাতীত অস্তিত্ব ও ভালবাসার ইঙ্গিত বর্তমান।

আমি কোথায়? সেই তো পরম, সেই তো সব-এক, তার জন্যই তো আশিকের আকুল প্রতীক্ষা ও রাত্রি-জাগরণ! নবীজীর জীবনে এই প্রতীক্ষা, সর্বক্ষণের স্মরণ ও রাত্রি-জাগরণ একটি জীবন্ত ও প্রাণবন্ত সাধনায় পরিণত হয়। তাই নবীজীই সূফী-সাধনার উৎস-মূল ও প্রাণ-প্রেরণা। সূফী সাধকদের সাধন-জীবনীতে আমি এ-কথাই নানাভাবে ব'লেছি। এখানে আরো একত্র-কথায় তা স্পষ্ট করে তুলছি। সাধকগণ যে মূল থেকে প্রেরণা ও সাধনপন্থার সন্ধান পেয়েছেন, আমরা অন্য কোনো দিকে দৃকপাত না করে, সেই মূলে অর্থাৎ নবীজীর জীবন-আদর্শে উপনীত হ'তে চেষ্টা করি। কারণ নবীজীই আমাদের দুই-জীবনের (দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের) একমাত্র নির্ভরযোগ্য আদর্শ ও অবলম্বন, হাদী ও মুরশিদ এবং পরম স্নেহশীল দরদী পথিকৃৎ ও চির-জীবন্ত উদ্দীপন। নবীজী সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রহমাতাল্লিল আ'লামীন', নবীজী সমস্ত বিশ্বের রহমত বা করুণাস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। নবীজী আমাদের জন্য আল্লাহ্র রহমতস্বরূপ কেন? এ কথা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ নয়, দীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিনির্ভর একটি পরম আনন্দ ও প্রজ্ঞাময় অনুভূতি। তবে নবীজীকে ভালবাসলেই এই সর্বাঙ্গ-সুন্দর পরম বিস্ময়কর মানুষকে

অতি আপনার দরদী জন বলে চিনতে এবং গ্রহণ করতে একটুও কষ্ট হবে না। আর তাকে ভালবেসেই আল্লাহ্‌কে ভালবাসবো এবং এভাবেই সূফী-সাধনার ধারাকে আমরা চিরন্তন ও চির-প্রবহমান রাখতে পারি। বিখ্যাত আইরিশ মনীষী জর্জ বার্নডশ' তাঁর The Adventure of a Black Girl in Her Search for God নাটকের ভূমিকায় বলেছেন : Mahomet should be rediscovered before Islam come down as a shining faith.

নবীজীকে আমরা কিভাবে পুনরায় আবিষ্কার করতে পারি ? ভালবেসে। কেন ? যাকে ভালবাসা যায় তার আদর্শ ও ইচ্ছামতো চলতে বা জীবন যাপন করতে আন্তরিক সাধ জাগে। কেন ? ভালবাসার ধর্মই এই—ভালবাসার ধনকে সর্বশক্তি ও অন্তর দিয়ে সন্তুষ্ট করার জন্য সমস্ত দেহমন একান্তে উন্মুখ হয়ে ওঠে। নবীজী কি ভালবাসতেন ? আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ বা যিকরে তিনি প্রায় সর্বক্ষণ মগ্ন থাকতে ভালবাসতেন। নবীজীকে ভালবাসলে আমরাও অন্তর দিয়ে সেই প্রয়াসে সযত্ন হবো। নবীজীর জীবন-যাত্রা ছিল অতি বিস্ময়করভাবে সরল ও সাধারণ। এ গ্রন্থের বহু স্থানে এ মহান জীবনের কথা বলেছি। একটি কথাই সব সময় মনে পড়ে, খেজুর পাতা দিয়ে তৈরি মাদুরে তিনি শুতেন, সকালে ঘুম থেকে উঠলে দেখা যেতো তার সুন্দর সোনার পৃষ্ঠে দাগ পড়ে গেছে। ক্ষুধার জ্বালা তিনি নিঃশব্দে সহ্য করতেন। এসব জেনে নবীজীর প্রেমিক কি কখনো খাদ্য ও পোশাকের এবং জীবনযাত্রার মানে নির্লজ্জভাবে বিলাসী হতে পারে ? অন্তর-গভীরের একটি দুর্লভ আবেগ দিয়ে বলি :

কি ক'রে থাকবো সুখে বিলাসী জীবন আমি করবো যাপন
আমার নবীজী প্রিয়, মা আয়িশা তাহাদের গরীবানা হালে
কেটেছে কত না দিন খেজুরের অসংলগ্ন পাতা ছাওয়া চালে
ফুটো ছিল কত তাই বৃষ্টি বাদলের চলে অবাধ বর্ষণ।
কি ক'রে কাটাই আমি বর্ষমাস অতি সুখে আরামে আয়েশে
সুসজ্জিত ঘরে কতো আড়ম্বর অবান্তর বহু আয়োজন
এ সব কাঁটার মতো গায়ে বেঁধে, নিরাসক্ত করে থাকি মন,
কাঁদি বসে নবীজীর কথা ভেবে দীনহীন সাধারণ বেশে।
বড় সাধ ফকীরের মতো করি একখানি কুঁড়ে ঘরে বাস
প্রয়োজন অতি তুচ্ছ সামান্য আহারে তৃপ্ত, দিন কেটে যায়

নবীজীর কথা ভাবি, দেখেছি রাত্রির স্বপ্নে পেয়েছি আশ্বাস
সুষমা গোলাপী শুভ্র অপরূপ মর্ত্যে তার তুলনা কোথায় !

এতো যে সৌভাগ্য, আমি চিরকাল ধ'রে তাঁর দীনতম দাস
আর কি চাইবো আমি এইতো পরম পাওয়া জীবন-সন্ধ্যায় !

নবীজী ছিলেন সর্বাঙ্গ-সুন্দর মানুষ। সর্বাঙ্গ অর্থাৎ তাঁর ভিতর ও বাইরের রূপ-সুষমা ছিল অতুলনীয় এবং অপরিসীম ও অনন্যসাধারণ। এমনটি আর মর্ত্যের কোন মানুষে সম্ভবপর হয়নি এবং হবেও না। নবীজী ছিলেন আল্লাহ্‌র নূরের নূর। তাঁর ভিতরের সম্পদ-সৌন্দর্য অর্থাৎ অপরিমেয় আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য ছিল অভাবনীয়। মি'রাজ শরীফ, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ ও বিশ্বদর্শন তার প্রমাণ। আর তাঁর বাইরের রূপ-সুষমা ? বাঙলা ভাষায় তার বর্ণনা অসম্ভব। একটি অমর বাণী "I said to my mother, 'Describe Prophet Muhammad (Sm) to me.' She said, 'O my little son, Had you seen him, you would say that you had seen a rising sun.—From 'The sayings' of Muhammad (S)-Al Suhrawardy. আল-তাবারি থেকে উদ্ধৃত হযরত আলীর একটি উক্তি--His complexion was rosy white .... There was such sweetness in his visage that no one, once in his presence, could leave him. If I hungered, a single look at the Prophet's face dispelled the hunger. Before him all forgot their griefs and pains. (The Age of Faith—Will Durant Chap.viii, Page 163)

হযরত মা আয়িশা সিদ্দীকা (রঃ)-এর মুখ থেকে আমরা নবীজীর মহান সুন্দর জীবনের বহু মূল্যবান কথা ও বৃত্তান্তের সন্ধান পাই। মা আয়িশা ছিলেন শরীয়তের অর্ধেক। নবীজী তাঁর সহচরদের বলতেন ! ঐ গৌরবর্ণা রক্তাভা মহিলার নিকট থেকে তোমরা জ্ঞান অর্জন করো। মা আয়িশা সুন্দর কবিতা লিখতেন। তিনি সাধারণ কথাবার্তায় মাঝে-মধ্যে যে সব রসাত্মক শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করতেন, তার একত্র সমাবেশেও এক একটি কবিতা হয়ে উঠতো। যেমন, নবীজীর সুন্দর মুখে স্বেদবিন্দু যেন মুক্তার মতো টলমল করতো। নবীজীর ওফাতের পর কবি-মা (কবিতা লিখতেন বলে মা আয়িশাকে আমি কবি-মা ব'লে সশ্রদ্ধ সম্বোধন করছি) যে বিলাপ করে

ছিলেন শোকাবিষ্ট ও অসংলগ্ন হলেও তা এক সুন্দর কবিতা হয়ে পড়ে। আমাদের সৌভাগ্য যে, সে শোক-গাথার মধ্যে নবীজীর সর্বাঙ্গ-সুন্দর আদর্শ চরিত্রের একটি সত্যকার চিত্র বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নীচে তার অধিকাংশ আক্ষরিক ও কিছুটা ভাবানুক্রমিক অনুবাদ ভক্তজনের উদ্দেশে পেশ করলাম :

বিলাপে বেদনা শোকে মা আয়িশা কবি-মা আমার
কবিতার মতো কথা ব'লে যায় প্রতিশব্দে তাঁর
নবীর চরিত্র-চিত্র স্পষ্ট হয় করুণ কান্নায়।
"যে নবী পার্থিব ধন অর্থ-বিত্ত পরম হেলায়
দূরে রেখে অবিশ্বাস্য দরিদ্রতা করেছে বরণ
সম্পদে আসক্তিহীন নির্বিকার চিত্ত সর্বক্ষণ
নিঃশব্দে ক্ষুধার তীব্র জ্বালা সহ্য করেছে স্বেচ্ছায়,
দীনের রাখাল সেই, আজ সেই নবী যে কোথায়।
পাপীতাপী উম্মতের দুঃখে যার চোখে নিদ্রা নাই
একটি রাতের সুখ। শূন্য সব যেদিকে তাকাই
অর্থহীন। সুমহান চরিত্রের নবী নাই নাই।
আল্লাহ্‌র দাওয়াতে সে যে চলে গেছে কোথা খুঁজে পাই।
যে নবী নফসের সাথে যুদ্ধে সদা রত অহর্নিশ
চোখ তুলে দেখে নাই আল্লাহ্‌র যা নিষিদ্ধ জিনিস
আহা সেই রহমতের বিশ্বনবী আর নাই নাই,
যার দ্বার দুঃখীদের জন্য ছিল উন্মুক্ত সদাই
কোমল অন্তর যার প্রতিশোধহীন কামনায়
কলুষিত হয় নাই, ভেঙেছে যদিও শত্রুতায়
মুক্তার মতন দাঁত ধৈর্য সে যে করেছে ধারণ
প্রশান্ত ললাটে ক্ষত তবু তাঁর ক্ষমাশীল মন।
পৃথিবী বঞ্চিত হ'লো মহান ব্যক্তিত্ব থেকে তাই
সঙ্গহারা প্রকৃতির বিষাদের পরিসীমা নাই।"

নবীজী একটি পরিপূর্ণ আদর্শ-সুন্দর মহান মানুষ ছিলেন ব'লে আমাদের কথা ও কান্না তাঁর কাছে সহজেই পৌঁছে যাবে। এ আশ্বাস আমরা কুরআন শরীফেও পাই---'বিল মুমিনীনা রা'উফুর রহীম'. বিশ্বাসীদের জন্য তিনি অত্যন্ত করুণাময় ও দয়াশীল এবং সেইজন্য তিনি আল্লাহ্‌র রহমত

রূপে আমাদের স্নেহশীল ও দরদী মুরশীদ হয়ে আছেন। আমরাও সেই ভরসায় নবীজীকে ভালবেসে আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভ করতে নিশ্চিত আশ্বাস পাই।

এখানে এ প্রেম বা ভালবাসার একটি কুরআনভিত্তিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। কুরআন শরীফে ভালবাসার তাগিদ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ ও নবীজীকে ভালবাসতে অনেকে ভয় পায়, ভক্তি ও শ্রদ্ধা ভরে আমরা আল্লাহ্ ও নবীজীকে দূরে সরিয়ে রাখি। হব্‌বুন শব্দ ছাড়াও আরো শব্দ আছে যাতে এ ভালবাসার কথা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্য কুরআন শরীফে তিনটি শব্দ আছে, তাক্‌ওয়া, খাশিয়াত ও ইশ্‌ফাক। ইশ্‌ফাক অতি নিম্নস্তরের ভয়, আল্লাহ্‌র সাথে শুধু ভয়ের সম্পর্কই সেখানে প্রবল। খাশিয়াত তার চেয়ে উঁচু স্তরের ভয়, ভয় না করলে শাস্তি পাবো, এই ভাব। পরবর্তী ভয় তাক্‌ওয়া, যা ভালবাসারই নামান্তর। আমরা যাঁকে ভালবাসি, যাতে তাঁর অসন্তুষ্টি বা অসন্তোষের তিলমাত্র কারণ না হ'য়ে পড়ি, তাক্‌ওয়ায় আশিকের সেই ভয়। আল্লাহ্‌কে ভালবাসি, তাই তাঁর প্রেম ও প্রসন্নতাই (রিদওয়ান) আমাদের কাম্য---আমরা তাই ভয়ে ভয়ে থাকি পাছে তাঁর এ প্রসন্নতা থেকে আমরা বঞ্চিত হই। সেইজন্য মুত্তাকীন যারা সংযতভাবে জীবন যাপন ক'রে তাঁরা অন্যায় ও অসত্য থেকে দূরে থাকেন, মাশুকের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সদা তৎপর হয়ে প্রেমী সত্তায় শুদ্ধ ও আবেগময় হয়ে তাঁর ধ্যানে তন্ময় হন।

বর্তমানের বস্তু-বিক্ষুব্ধ অনীহা ও অতি উদ্বেগ-পীড়িত বিব্রত জীবনে মানুষ অন্তর প্রশান্তি হারিয়ে নানা দুরারোগ্য ব্যাধির শিকার হয়ে পড়েছে। হৃদয়মনের শান্তি ও সমতা রক্ষার জন্য অনেকেই বিশেষ ক'রে পথভ্রান্ত তরুণগণ L. S. D., Barbiturates, Marijuna প্রভৃতি tranquiliser বা স্বস্তি-বটিকার আশ্রয় নিয়ে অসহায়ভাবে বিব্রত হয়ে পড়েছে। অথচ এ যুগের মানুষ ভুলতে বসেছে যে, আল্লাহ্‌র সর্বক্ষণ স্মরণ বা যিক্‌র ছাড়া হৃদয়ে শান্তি লাভের অন্য কোনও উপায় বা পথ নেই। তাই আমি বিশ্বাসী ভক্তজনদের দৃষ্টি সর্বাপেক্ষা চির-আধুনিক যে Tranquiliser আল্লাহ্‌র প্রেম বা mystic love অর্থাৎ অন্তরঙ্গ বা মরমী ভালবাসার দিকে আকর্ষণ করছি এবং বারবার বলেছি এই প্রেমে পড়ার আমাদের জন্য একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় হলো নবীজীকে ভালবাসা। সূফী-সাধকদের জীবনে আমরা তার প্রমাণ ও পরিচয় পেয়ে ধন্য ও আশ্বস্ত হয়েছি।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলছি। যাকে ভালবাসা যায়, সেই মাশুকের সর্বক্ষণ চিন্তায় আশিকের একমাত্র আনন্দ। পৃথিবীর ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ বা কোন প্রলোভনই তাকে আকৃষ্ট, বিভ্রান্ত ও সম্মোহিত করতে পারে না। (যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা জানেন মর্ত্য প্রেমের বেলাতেও এ কথা একইভাবে প্রযোজ্য) তাই একদিকে আল্লাহ্-রসূলের ভালবাসার বিশুদ্ধ ও বেহেশতী আনন্দ লাভ, অন্যদিকে যীনাতুল হাইয়াতুদ্ দুনিয়া কিংবা হুব্বুশ্ শাহাওয়াত অর্থাৎ মর্ত্য জীবনের আনন্দ উল্লাস ও চাকচিক্য এবং ভোগসর্বস্ব জীবনের আসক্তি-প্রলোভন, কোন্‌টি বেছে নেবেন, মনস্থির করুন। বস্তু ও অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে গেলেই তার আসক্তি ও চাপ-সৃষ্টি এ মরমী প্রেমের পথে এক বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আর, একবার বস্তু-নির্ভর হয়ে পড়লে তার আসক্তি থেকে রেহাই পাওয়া দুঃসাধ্য ও দুষ্কর হয়ে ওঠে। আধুনিক যুগের আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের বিচিত্র আয়োজন ভয়াবহ-ভাবে বেড়ে চলেছে। ফলে যন্ত্র আমাদের আরাম দিচ্ছে বটে কিন্তু আমরাই এখন যন্ত্রের দাস হয়ে পড়েছি। এ সতর্ক বাণী আমেরিকান মনীষী থরাউ (Thoreau) বহু পূর্বেই উচ্চারণ করেছিলেন Simplify simplify।

যাঁদের ঘরে টেলিভিশন, ফ্রীজ, এয়ারকনডিশনার, ক্লীনার, প্রজেক্টর, প্রেশার কুকার, রেকর্ড-প্লেয়ার (Two-in-one) প্রভৃতি আছে তাঁরা বেশ ভালবাভেই জানেন, এসব যন্ত্রের পরিচর্যায় ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কত অর্থ ও জীবনের বহু মূল্যবান সময় তাঁদের ব্যয় করতে হয়। বিশেষ ক'রে টেলিভিশন সময় হত্যা ও তার অপচয়ের একটি উল্লেখযোগ্য যন্ত্র। একবার আল্লাহ্-রসূলের ভালবাসায় পড়ে দেখবেন, এসব অবান্তর বিরক্তিকর ও অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হবে। আর এ প্রেমের পথে ধ্যানে ও চিন্তায় যারা অমেয় আনন্দ লাভ করেন, তাঁরা শরীরকে বিশ্রাম দেন, কিন্তু আরাম দেন না। কারণ আরামে দেহ ক্রমশ শিথিল ও পঙ্গু হয়ে পড়ে। একটিমাত্র উদাহরণ দেই। আমরা শীত-গ্রীষ্মকে দূরে রাখার জন্য নানা রকমারি পোশাক ও যন্ত্রের ব্যবহার করি। ফলে কি হয়? আমাদের দুই মস্তিষ্কের মাঝামাঝি হাইপোথ্যালামাস বলে ছোট কুলবরই আকৃতির থার্মোস্ট্যাট প্রত্যঙ্গ আছে, তার কাজই হলো দেহের তাপ ও শৈত্য নিয়ন্ত্রণ করা। স্বাভাবিকভাবে চললে (অতিরিক্ত আরামে নয়) এ প্রত্যঙ্গটি সক্রিয় থাকে। কিন্তু শীত ও গ্রীষ্ম সহ্য মতো গ্রহণ করতে

না পারলে তা নিষ্ক্রিয় হয়ে আসে, দেহ সহ্য শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং ধীরে ধীরে পঙ্গু হয়ে পড়ে।

এখন আমার তিয়াত্তর বৎসর চলছে। এভাবে আমার বিচিত্র ও পরম অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি থেকে কথা বললে হয়তো কেউ কিছু মনে করবেন না। তাই আবার নির্ভয়ে বলছি, নবীজীকে ভালবাসুন, দেখবেন আপনার জীবন কিরূপ বিস্ময়করভাবে নিবেদিত, সংযমিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে উঠেছে। দেহমনের সাম্য-সমতা ও অন্তর-প্রশান্তি ফিরে পাবেন, ফলে মর্ত্য জীবনের সকল ঝড়ঝাপটা আপনি নির্বিকার চিত্তে সহ্য ক'রে চলবেন। আপনার জীবন প্রশান্ত-সুন্দর হয়ে একদিন মিলনের আনন্দ শুভলগ্নে পরমে সমর্পিত হবে। সূফী প্রেম-সাধনার মূলে যে ভাব অবিরাম উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে চলেছে তা ইসলামের মর্মকথার গভীর রসানুভূতির রূপান্তর মাত্র অর্থাৎ আমার তথা ব্যক্তি-মানুষের ও আল্লাহ্‌র মধ্যে যে সম্পর্ক তা অত্যন্ত নিবিড়, প্রত্যক্ষ এবং ঘনিষ্ঠতম। সালাতে আমি সোজাসুজি আল্লা-হ্‌র সম্মুখে দাঁড়াই, তাঁর সঙ্গে কথা বলি, মনের যত দুঃখ-বেদনা ও অভাব-অভিযোগ শুধু তাঁকেই জানাই, যা চাইবার হয়, তার কাছেই চাই, আমার যত ভক্তি ও ভালবাসা আমি তাঁকেই নিবেদন করি, কারণ তিনি আমার মালিক (পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত 'মালিক' শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক ও ভাব-গভীর। সূফী-সাধকগণ মালিক শব্দের মরমী অর্থে প্রবেশ ক'রে আল্লাহ্‌র অন্তরতম ও অন্তরঙ্গ হতে আজীবন প্রয়াস পেয়েছেন) এবং আমি সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণভাবে তাঁর। কিন্তু অজ্ঞানতা, নানা অন্ধ সংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের জন্য এ নিবিড়তম সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা সচেতন বা অবহিত নই। আমার ও আল্লাহ্‌র মধ্যে অনেক দূর ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমাদের আর্ত মনের আকুল আবেদন, রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি ঃ

কেমনে সারাবো কুহেলিকার এই বাধা রে।

একমাত্র নবীজীর ভালবাসার পথ ধ'রে আল্লাহ্‌র ভালবাসায় পৌঁছালে এ চিরন্তন মধুরতম যোগ-সম্পর্ক আন্তরিক সাধন-সৌকর্যে আবার ফিরে আসবে। ভক্ত রবীন্দ্রনাথের কথায় তখন সমস্ত আবেগ ও মনপ্রাণ দিয়ে বলবো ঃ

তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই কোনো বাধা নাই ভুবনে।

ইসলামের মর্মবাণী সূফী তথা প্রেম-সাধনায় এক বিস্ময়কর আবেগ-মধুর রসরূপে, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে ও একান্ত চিত্ত নিবেদনে অভাবনীয়

আধ্যাত্মিক ভাব-সম্পদে চিরকালের জন্য উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান হয়ে আছে। পরিশেষে কুরআন শরীফের ছাব্বিশ সিপারার সূরা ক্বাফ-এর ছয় ও আট ক্রমের আয়াত এবং পরবর্তী সাতাশ সিপারার সূরা যারীয়াত-এর সাত-চল্লিশ, আটচল্লিশ ও পঞ্চাশ ক্রমের আয়াতগুলোর দিকে আমি নবীজীর (এবং সেই সঙ্গে আল্লাহ্‌র) ভক্ত প্রেমিকজনদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করছি। কারণ নবীজীর ভক্তজনের জীবন মৌলিক ও আদর্শগতভাবে কুরআনভিত্তিক হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌র মহিমা ও সৃষ্টি নির্মাণ-কলা-কৌশলের বিস্ময়কর লীলা-বৈচিত্র্য অনুধাবন এবং তাঁর প্রেম-প্রসন্নতা অর্জনের উপায়ের কথা বিশ্ব-প্রকৃতির প্রত্যক্ষ প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত হয়েছে অর্থাৎ প্রকৃতিকে অবলম্বন বা পটভূমি ক'রে সেই মহাশিল্পীর বাণী বিশ্ব-মানবের জন্য নবীজীর মারফত অবতীর্ণ হয়েছে। প্রকৃতিকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়ার কারণ আছে। অতীত ইতিহাসের দিকেও কুরআন শরীফে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আ'দ, সামূদ প্রভৃতি প্রাচীন জাতির বিভ্রান্তি ও পতনের কথা বলা হলেও পরবর্তীকালে আলে ফিরা'উন ও বনী ইসরাঈল তা থেকে কোনও শিক্ষা লাভ করেনি। আর ইতিহাসের শিক্ষাও হলো তাই অর্থাৎ তা থেকে কেউ শিক্ষা লাভ করে না। করলে যুগে যুগে নবীদের আগমন সত্ত্বেও বহু জাতির পথভ্রান্তি ও তার জন্য তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে এবং বর্তমান শতকে দুই দু'টো মহাযুদ্ধ সংঘটিত হতো না। ইতিহাস তো অতীতকালের কথা---কিন্তু প্রকৃতি অতি প্রত্যক্ষ, জীবন্ত ও চির নতুন। কুরআন শরীফে তাই প্রকৃতিকে এতো গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখন উক্ত আয়াতগুলোকে অবলম্বন ক'রে প্রকৃতি-প্রেক্ষিতের কথা বলছি (কারণের কথা পরে হবে)।

সূরা ক্বাফ, আয়াত ক্রম ৬ঃ 'আফালাম ইয়ান্‌যুরু ইলাস সামায়ি-ফওকাহুম, কাইফা বানাইনাহা ওয়া যাইয়ান্‌নাহা, ওয়া মা লাহু মিন ফুরুজ।'

তারা কি তাদের মাথার উপরকার আকাশের দিকে একবার চেয়েও দেখে না, কিভাবে আমরা তা তৈরী এবং পরিসজ্জিত করেছি এবং তার মধ্যে (তিলমাত্র) খুঁত নেই। (নক্ষত্র-লোকের নিয়ম, শৃঙ্খলা, গতি এবং প্রতিসাম্য নিখুঁতভাবে সর্বোচ্চ আঙ্কিক বিমূর্তনের প্রতিসারী)। আয়াত-ক্রম ৮ঃ তব্‌সিরাতাও ওয়া যিক্‌রা লিকুললি আব্‌দিম্' মুনীব।

(এসব অর্থাৎ নক্ষত্র-লোক) প্রত্যেক ভক্ত আল্লাহর অভিমুখী হয়ে পর্যবেক্ষণ ও স্মরণ করবে।

সূরা যারীয়াত ঃ আয়াত ক্রম ৪৭ ঃ শক্তি ও কৌশলের দ্বারা আমরা (আরবী ভাষায় 'আমি' অর্থে সম্মানসূচক 'আমরা' ব্যবহৃত হয়) নভো-মণ্ডল তৈরী করেছি এবং আমরাই মহাশূন্যের বিশালতার রূপকার। আয়াত ক্রম ৪৮ঃ এবং আমরা প্রশস্ত মর্ত্যকে ফরাশের মতো কী চমৎকার-ভাবেই না বিছিয়ে দিয়েছি! আয়াত ক্রম ৫০ ঃ 'ফাফিররু ইলাল্লাহি ইন্নি লাকুম মিনহু নযীরুম্ মুবীন।'

তাই ত্বরা ক'রে আল্লাহ্‌র দিকে ছুটে চলো। আমি (নবীজী) তাঁর নিকট থেকে সরাসরি ও স্পষ্টভাবে এক সতর্ককারীরূপে তোমাদের কাছে এসেছি।

এখন এসব কথা বলার একটি মাত্র কারণ ঃ আপনি যদি প্রকৃতি ও আপনাকে ঠিকভাবে বুঝে এবং অনুভব ও উপলব্ধি ক'রে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই বুঝবেন আল্লাহ্‌ই সব ও সর্বেসর্বা এবং তখন আল্লাহ্‌র দিকে আপনি আকুল অন্তর-প্রেরণায় ছুটে যাবেন। আমাদের নবীজী স্পষ্ট ভাষায় এবং প্রাকাশ্যে সকলকে এ শিক্ষাই দিতে এসেছেন। 'নবীজীকে ভাল-বাসাই যে আল্লাহ্‌কে ভালবাসা' এ উক্তির তাৎপর্য এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়েছে।

মানুষ চিরকাল একাকিত্বকে ভয় করে এসেছে, সে চেয়েছে সমাজবদ্ধ-ভাবে সকলের মধ্যে থাকতে, সকলের সঙ্গে ওঠাবসা করতে এবং মায়ামমতায় ও প্রীতিতে আবদ্ধ হয়ে নিঃসঙ্গতার বেদনা ভুলতে। মূলত মানুষ বড় একা। কারণ বিস্মৃত অতীত থেকে প্রসারিত রহস্যময় ভবিষ্যতের দিকে তার একক যাত্রা। তাই বিচ্ছিন্নতায় ও একাকিত্বে তার এতো শঙ্কা, যদিও তা কল্পিত। তাই মানুষ সঙ্গবদ্ধতার সন্ধান ক'রে এসেছে চিরদিন, ইতিহাসের সকল যুগে এ সন্ধানপরতা চলেছে। হালে এ সন্ধানপরতা "কমিউনিটির' রূপ-অবয়বে পাশ্চাত্যে ভয়াবহভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। তাঁরই ফলশ্রুতি 'বার', কাবারে, পার্টি, বলডান্স, ব্যালে নৃত্য, কনসার্ট, চলচ্চিত্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে অবাধ যৌনতা ও নির্লজ্জ নগ্নতার ব্যাপক প্রচলন। ধনতান্ত্রিক দেশে কমিউনিটির এ হলো সমষ্টি প্রয়াস। আর সমাজ-তান্ত্রিক দেশে কমিউনিজম 'কমিউন', কোলক হোজ এবং সমবেত যন্ত্র ও শস্য উৎপাদনে নির্মম চরম পন্থায় রূপ পরিগ্রহ করেছে। দুই দেশেই ব্যষ্টি বা ব্যক্তির তেমন কোন স্বীকৃতি বা একাকিত্বের প্রশ্রয় নেই।

বালজাকের একটি কথা মনে পড়ে, একাকিত্বের ভয় মানুষকে নির্মম-

তাবে পেয়ে বসেছে। মানসিক, আধ্যাত্মিক, ভাবপ্রাবণিক ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রেই এ একাকিত্বের ভয় তাকে কমিউনিটির সন্ধানে উদ্বুদ্ধ ও প্রলুব্ধ করছে। কিন্তু নবীজীর প্রদর্শিত পথে ব্যক্তি ও সমষ্টির একটি চমৎকার সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

জমাতে একজন মুমীন কাতারবদ্ধ; কিন্তু সালাতে সে সম্পূর্ণ একা ও আত্মনিবেদিত। একই অবস্থানে এরূপ ব্যক্তি ও সমাজ-মানুষের সম্মিলন অন্যত্র অভাবনীয়। পবিত্র কুরআন শরীফে ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও জবাবদিহির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ 'ওয়ালা তাযিরু ওয়াযিরাতুন বিযরা উখরা অর্থাৎ যাকে নিজের ভার নিজেকে বহন করতে হয়, সে কিভাবে অন্যের ভার (বা দায়িত্ব) বহন করবে! তাই সকল কাজের বা কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আমরা সকলেই ব্যক্তিগত-ভাবে দায়ী। এ ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ থেকেই প্রেমের জন্ম অর্থাৎ এই বোধ থেকেই আল্লাহ্‌র সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গ হওয়ার প্রয়াস। আর এ প্রয়াসে ভরসা আছে, আমি একা নই, আমার সঙ্গে আমার পরম প্রিয়তম আল্লাহ্ সর্বক্ষণের জন্য আছেন, আর তাঁর এ নৈকট্যের আশ্বাস 'আক্-রাবু মিন হাবলিল্ ওয়ারিদ' প্রাণ-স্পন্দনের চেয়েও যে সে প্রিয়তম আমার নিকটবর্তী। তাই যে পরম সর্বক্ষণ আমার অন্তরতম জন হয়ে আছেন, তাঁকে ভাল না বেসে আর উপায় কি? তাই আল্লাহ্‌র প্রেমে বা সূফী-সাধ-নায় একাকিত্বের ভয় অবান্তর ও সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়। কারণ আমরা তো দু'জন---আর দু'জন না হ'লে প্রেম হবে কি ক'রে? একবার এ প্রেমে পড়লে দেখবেন, সব সময় আপনি একাকী ও নিঃসঙ্গ হয়ে থাকতে চাইবেন। প্রেমের ধারাই যে এই! ব্যক্তিগত জীবন থেকে একটি উদাহরণ দেই। মাফ করবেন। আমার মেজো মেয়ে তখন কলেজের ছাত্রী, অঙ্গ-সজ্জায় ও প্রসাধনে সর্বাধুনিক এবং এমন ফিল্‌ম নেই যে, সে তা দেখে না অর্থাৎ সর্বক্ষণের জন্য সে সমষ্টি-সচেতন। কিছু দিন থেকে লক্ষ্য করলাম, তার সে জৌলুসময় প্রসাধনও নেই, সিনেমা দেখারও নাম করে না---চুপচাপ নির্জনে বসে থাকে। বুঝলাম আমারই মতো মেয়ের দশা হয়েছে—তবে পার্থক্য এই যে, তার প্রেমের পাত্র একজন মর্ত্য মানুষ, আর আমার ভাল-বাসার ধন এক অমর্ত পরম, যে সবচেয়ে কাছের জন অথচ যাকে পাওয়ার জন্য মানব-চিত্তের চিরন্তন প্রাণপাত প্রয়াস ও সাধনা।

আসুন, সেই পরমকে ভালবেসে নবীজীর ভালবাসায় আশ্বস্ত ও প্রশান্ত

হ'য়ে আধুনিক সভ্যতার অভিশাপ একাকিত্বের ভয়-ভাবনা থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত হই, ভালবাসার দায়ে অনন্তকাল ধ'রে প্রিয়তমের প্রেমে সঙ্গময় হয়ে সর্বক্ষণের জন্য আনন্দ লোকে অবস্থান করি।

'সূফী সাধনার প্রথম ও শেষ কথাই হলো প্রেম, পরমের সঙ্গে প্রেমে যুক্ত হওয়া এবং আপনাকে সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব-রিক্ত ক'রে প্রিয়তমের প্রেম, প্রসন্নতা ও সান্নিধ্য কামনা করা। এ কামনায় একমাত্র সে-ই আমার প্রিয়-তম, বন্ধু ও মওলা, আর কেউ-ই নয়। মুরশীদ আমার পথপ্রদর্শক হতে পারেন, সাধন পথের সন্ধান দিয়ে কিছুটা সাহায্য করতে পারেন, কিন্তু তারও প্রয়োজন হয় না। আর এ পথে 'শিরক'-এর ভয় ও আশংকা আছে। অন্তরে যদি সত্যকারের ব্যথা ও ব্যাকুলতা থাকে তবে তা-ই পরম প্রিয়-তমের সন্ধান দেবে, তাঁর কাছে নিয়ে যাবে, কারণ প্রেমের পথে একা চলাই ভালো। আমাদের নবীজী আহাদ আহাদ-এক, এক সেই একের কথাই সমস্ত জীবনের কর্মে, সাধনায় ও দর্শনে বলে গেছেন। পবিত্র কুরআনেও বারবার সেই একের প্রশংসা ও মহিমা কীর্তিত হয়েছে। মানুষ প্রকৃতি ও বিশ্ব-অর্থাৎ সীমাবদ্ধ দৃষ্টিমন দিয়ে আমরা যতদূর মনন ও কল্পনাকে প্রসারিত করতে পারি, সেই একের সুমহান ও মহিমান্বিত বিদ্যমানতারই প্রমাণ ও নির্দেশ পাই। তাই সেই এক-কে আপন প্রেমীসত্তায় যে নামে ডাকবো, সম্বোধন করবো, প্রিয়তম, বন্ধু আর কাউকেও সেই মধুর প্রিয় সম্বোধনে ডাকবো না, তাঁকে যদি আমি মওলানা বলি (কুরআন শরীফের দু-ই স্থানে সূরা বাকারার ২৮৬ আয়াতে এবং সূরা তওবার ৫১ আয়াতে আল্লাহ্‌কে যথাক্রমে আন্‌তা মওলানা এবং হুয়া মওলানা অর্থাৎ তুমিই আমার এক-মাত্র প্রভু, পালক ও রক্ষাকারী এবং সে-ই আমাদের একমাত্র মওলা এবং কুরআন শরীফের বহুস্থানে তাকে মওলাকুম এবং নে'মাল মওলা বলা হয়েছে—এভাবে বলার একটি তাৎপর্য আছে)। তবে মানুষকে কখনো মওলানা বলবো না, বললে শিরক করা হবে।

انت ও هو শব্দ এখানে সর্বনাম অর্থাৎ কারো পরিবর্তে বসেনি—আল্লাহ্ অর্থেই এই দুই শব্দের সুস্পষ্ট ব্যবহার আর শব্দ দু'টোর মধ্যে একমাত্র তুমি এবং একমাত্র 'সে' একমাত্র 'অনন্যতা'র ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে আছে। তাই অন্য কাউকেও আমি মওলানা বলবো না। একমাত্র আমাদের এ উপমহাদেশেই এভাবে মানুষকে সম্বোধন করা হয়। ব্রিটিশ আমলের পর থেকে মানুষের বেলায় এ শব্দটি 'টাইটেল' পাশের খেতাবরূপে প্রযোজ্য হয়ে আসছে।

কিন্তু প্রাক-ব্রিটিশ আমলে মানুষ মওলানার সন্ধান আমরা কোথাও পাইনে অথচ তখন বুযর্গ আলিমদের অভাব ছিল না। প্রসঙ্গত বলছি, আমি মধ্যপ্রাচের দামেশ্‌ক ও বাইরুত ঘুরেছি, সেই আরবীভাষী দেশের কাউকে কখনো কোন মানুষকে মওলানা সম্বোধন করতে শুনিনি। নিষ্ঠাবান আলিম ব্যক্তিদের মুফতি, মুহাদ্দিস, মুতাকাল্লিম, আলিম, ফকীহ্ কারী, হাফিয প্রভৃতি সম্মানসূচক সম্বোধনে বিশিষ্ট হয়; কিন্তু মানুষ মওলানা সেই আরব দেশে অসম্ভব। জর্জ বার্নার্ডশ' ইসলামের তওহীদ সম্বন্ধে বলেছেন most enlightened and uncompromising monotheism এই আপোসহীন তওহীদে আমরা যেন মানুষকে আল্লাহ্‌র সমগুণান্বিত এবং প্রায়-সমকক্ষ বলে না ভাবি। তা হ'লে প্রেমীসত্তা ও সাধনার শুদ্ধতা ক্ষুণ্ণ হবে।

প্রসঙ্গত বলছি, ইসলামের তওহীদ এতো বিশুদ্ধ যে, হালকাভাবে কোন মানুষকে প্রাণের বন্ধু, আপনি আমার মা-বাপ, আমাকে রক্ষা করুন, আপনিই আমার সব, 'আল্লাহ্ মিয়া' (উর্দু ভাষীদের হর-হামেশা উচ্চারিত একটি মুখের বুলি) প্রভৃতি বললেও শিরক করা বা তওহী-দের বরখিলাফ হয়। ইসলামের তওহীদ mascauline অর্থাৎ বলিষ্ঠ পৌরুষময়। সেখানে এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো স্থান নেই, শুধু মানুষ, প্রকৃতি ও বিশ্ব এবং এ সমস্তকে বিধৃত করে আছেন সেই পরম মহিমময় এক সত্য, এক আল্লাহ্। কিন্তু আমাদের তওহীদের বিশ্বাসে এখন অনেক শিথিলতা দেখা দিয়েছে। ইসলাম আমাদের কাছে বহু সংস্করণে উপস্থিত হয়েছে। তার মধ্যে আরবী সংস্করণের ইসলাম বিশুদ্ধ তওহীদে একক, বিশিষ্ট ও বলিষ্ঠ পৌরুষময়, সেখানে সালাত, সিয়াম (রোযা,) হজ্জ এবং দুই ঈদ ছাড়া আর কোন আচার-অনুষ্ঠানের স্থান নেই এবং ইসলামের যে সংস্করণ এ উপমহাদেশে প্রচলিত তাকে ইন্দো-ইরানীয়ানরূপে চিহ্নিত করা যায়। এ সংস্করণে মেহদী ও ইমামবাদ, পীর ও কবর-পূজা, মানত করা, কদমবুসি, গুরুবাদ এবং আরো 'বারো মাসে তেরো পার্বণের' মতো বহু আচার-অনুষ্ঠানে সমাচ্ছন্ন। ইরানী সংস্করণের এ ইসলামকে femininc অর্থাৎ বলা চলে নারীসুলভ কমনীয়তা এবং মেয়েলী আচার-অনুষ্ঠানের বহিরঙ্গতায় পূর্ণ। মানুষের কাছে আমরা কিছু চাইবো না, বা ফল লাভের আশায় মানত করবো না। মানুষের কাছে মাথা নত করবো না—মাথা নত তাঁর কাছে করবো, কিছু

চাইবার হয় তার কাছেই চাইবো। কারো কোন মধ্যস্থতা বা ওয়াসিলার কোনও প্রয়োজন নেই—কারণ বহুবার বলেছি আমার আর আল্লাহ্‌র মধ্যে যে সম্পর্ক তা অত্যন্ত বিশুদ্ধভাবে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ। আর ওয়াসিলা যদি একান্ত ধরতেই হয় সেজন্য আমাদের নবীজী আছেন। কারণ নবীজীকে ভালবাসায় আল্লাহ্‌কে ভালবাসা—নবীজীকে গভীর ও আন্তরিকভাবে ভালবাসলে আল্লাহ্‌র পথে চলা অতি সহজ ও সুগম হয়ে আসে। মধ্যযুগে ইরান থেকে আমদানী পীরবাদ এসে মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে এক অচলায়তনের সৃষ্টি করেছিল। সে পীরবাদ থেকে আমরা শিক্ষিত ও পরিশীলিত যারা, তারা অনেকখানি সম্মোহনমুক্ত হতে পেরেছি। 'পীর' শব্দটি ফারসী, ইরানের অগ্নি উপাসকদের গুরুকে পীর বলা হতো। ইরান ইসলামে দীক্ষা নেবার পর পীরবাদ, ইমাম ও মাহদীবাদের মতেই এ উপমহাদেশের ইসলামের বুকে জগদ্দল পাথর হয়ে বসেছে। তার থেকে এখন আমরা ধীরে ধীরে মুক্ত হতে চলেছি। কারণ আমার আর আল্লাহ্‌র মধ্যে যে বলিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তাতে চিড় ধরে এমন কোন কিছুকে আমরা বরদাশ্‌ত করতে পারি না। পীর প্রথা কুরআন শরীফের সম্পূর্ণ আদর্শ বিরোধী ও অনৈসলামিক। সমগ্র জীবনে আমরা আমাদের কার্যকলাপের জন্য সম্পূর্ণ ও ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ্‌র কাছে দায়ী। এ ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ তওহীদের মতোই ইসলামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বলেছি, মধ্যস্থতায় কখনো প্রেম হয় না। প্রথম পরিচয়-পর্যায়ে অন্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হলেও প্রণয়পর্বে তা অসম্ভব এবং অবাঞ্ছিত। আর প্রেমী সত্তায় একবার প্রতিষ্ঠিত হ'লে সকল চাওয়া-পাওয়ার প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর হয়ে দেখা দেবে। যাকে ভালবাসা যায়, তার কাছে কিছু চাইতে হৃদয়-মন সায় দেয় না। বরং কিছু দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আশিক সেই পরম মাশুক জনকে কী দিতে পারে! তার আছেই বা কি—একমাত্র অশ্রু আছে, তা-ই একান্ত নির্জন স্মরণে সে তাকে দিতে পারে। আর আমি চাইবো কি? আমার সব কিছু যে তাঁর হাতে, আমার ভালো 'বি ইয়াদিকাল খাইর' অর্থাৎ তাঁর হাতে। আমি পরিপূর্ণভাবে তাঁর উপর সমর্পিত ও নিবেদিত হয়ে আছি। প্রেমীসত্তার এ সমর্পিত চিত্ততার মাধুর্য ও তাৎপর্য হলো, তাঁর ইচ্ছাই আমার জীবনে পূর্ণ হোক। কারণ আমেরিকার বিখ্যাত ভবিষ্যদ্‌দর্শী খ্রীস্টান সাধিকা জীন ডিকসনের কথায় বলি, Thine will

is wiser than mine আমি—তো আমার জীবনকে সমগ্রভাবে দেখতে পারিনে, (সমগ্র অর্থে প্রাক্-অতীত থেকে ভবিষ্যতের দূরতম কাল পর্যন্ত বিস্তৃত), তাই আমার কিসে ভাল বা কিসে মন্দ তা আমি জানবো কি করে! তাই কুরআন শরীফে 'আসলামা', 'তওককাল' প্রভৃতি সমর্পণমূলক শব্দে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও পূর্ণতম আত্মনিবেদনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই তাঁর কাছে প্রেমী সাধকদের তো কিছু চাইবার নেই। আর চাইতে যে লজ্জায় বাধে! তাঁর জন্য আছে শুধু সর্বান্তরিক সাধনা ও প্রিয়তমের মধুর স্মরণ এবং অবিরাম প্রশংসা-গান। এ স্মরণ ও প্রশংসা-গানেই সাধকের পরম আনন্দময় নান্দনিক অনুভূতি ও আত্মতৃপ্তি। কুরআন শরীফে বহুল ব্যবহৃত سبح ও حمد শব্দে গুরুত্ব ও গভীরতম তাৎপর্য বিশেষভাবে পরম উপলব্ধি ও সাধনা-সাপেক্ষ। শুধু মানুষ নয় বিশ্ব প্রকৃতিও তার অবিরাম প্রশংসা-গানে রত—ইউসাব্ বিহু লাহু মা ফিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, এমনকি বজ্রও তার স্বভাব মন্দ্র উদাত্ত সুরে তার প্রশংসা গান করে। সূরা রা'দের অন্তর্গত আয়াত—ইউ-সাব্ বিহুর রা'দু বি-হামদিহি, বজ্র তার প্রশংসা গান করে। তাই প্রকৃতি ও বিশ্বের সঙ্গে সাধক-চিত্তের মধুর একাত্মতা। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, মওলা (রসালো শব্দে বলা যায় প্রাণ-প্রিয়তম) নামে তাঁকে ডাকি, সম্বোধন করি, কেন? তাঁকে ভয়ে নয়, ভালবাসি ব'লে। একমাত্র আশি-কের নিরাসক্ত ও সমর্পিত হৃদয় মনই মাশুকের প্রশংসায় সর্বাত্মক তন্ময়-তায় প্রবিষ্ট হতে পারে। তাই এ প্রত্যক্ষ বোধ, আনন্দ ও প্রশংসাময় সাধক জীবনের সঙ্গে পরমের মধুর যোগ সম্পর্ক।

এ যোগ সম্পর্ক স্থাপনের ফলে হৃদয়-মন প্রশান্তি এবং সকল প্রকার বিকার ও বিক্ষোভ মুক্ত হয়ে প্রিয়তমের স্মরণে সর্বক্ষণের জন্য রত থাকে। নফসি-মুত্‌মা'ই-ন্নার অর্থাৎ নিস্তরঙ্গ 'আমি'র কথা পূর্বে বলেছি। এবার যে প্রশান্ত হৃদয়-মনের কথা বললাম, পবিত্র কুরআনে 'ক্বালবিন সলীম' ব'লে তার উল্লেখ করা হয়েছে। এ কাল্‌বিন সলীম-এর পক্ষে পরিপূর্ণ-ভাবে প্রিয়তমের উপর তওয়াক্‌কাল করা বা সমর্পিত হওয়া সহজ ও সম্ভবপর হ'য়ে আসে এবং এ সহজ হওয়ার আরেকটি কারণ আছে। কুরআন শরীফে বেশ কয়েক স্থানে আল্লাহ্‌কে ওয়াকীল (কাফা বিল্‌লাহি ওয়াকীলা, ফাত্‌তাখিজ্‌ ওয়াকীলা) বলা হয়েছে। ওয়াকীল এবং মওলা শব্দ দু'টি প্রায় একার্থক। 'ওয়াকীল' হলো যিনি একজনের ভালমন্দ, কাজ-

কর্ম, বর্তমান-ভবিষ্যৎ অর্থাৎ সমস্ত কিছুর তত্ত্বাবধান ও দেখাশুনা এবং তার সকল দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আর মওলা শব্দের অর্থ প্রভু, পালক এবং রক্ষাকারী (এখন ভেবে দেখুন, মানুষকে মওলানা, আমাদের মওলা, বলবেন কি না)। তাই যদি হয়, তা হ'লে পরমের উপর, মাশুকের মর্জির উপর একান্তে নির্ভর করতে আর ভয় কি। তাই বলতে পারি ওয়াকীল ও মওলা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সন্ধ্যাতারা বা সন্ধ্যায় ও প্রভাতে দুই-রূপে উদ্‌ভাসিত হয় অর্থাৎ একই অর্থ-দীপ্তিতে এ দুইটি অত্যন্ত গভীর ভাব ও তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের আকাশে সতত দীপ্যমান।

এখন এ দৃষ্টি ও প্রেক্ষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথায় আসা যাক। আমি একটি মাত্র অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ তুলছি। আত্মার মাগফিরাত কামনায় আমরা নানা আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রচুর অর্থ ব্যয় করি (অবহেলিত ও নিপীড়িত দুঃস্থ জনদের মৃত্যুর পর তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় এভাবে অর্থ ব্যয় কে করবে?) কিন্তু বান্দার ইহকাল-পরকালের রক্ষাকারী বা মওলারূপে আল্লাহ্‌ই কি যথেষ্ট ন'ন? তার প্রীতি ও দৃষ্টি আকর্ষ-ণের জন্য কি আচার-অনুষ্ঠানের কোনও প্রয়োজন আছে? ফকীর-মিসকিন খাওয়ানোর এবং আপনার কুরআন শরীফ খতম করার জন্য কোনও অনু-ষ্ঠানের দরকার নেই। তার জন্য সময়-অসময়ও থাকার কথা নয়—তা সর্ব-দাই চলতে পারে। তবে আল্লাহ্ 'সমীউ'দ্ দুআ' আল্লাহ্ প্রার্থনা শোনেন। কিন্তু এ প্রার্থনা ব্যক্তিগত আবেগ আন্তরিকতা ও অন্তরতম কান্না থেকে উৎসারিত হবে। আপনার বাবা-মা, স্ত্রী, পুত্র, স্বামী ও অতি আপনার জনের জন্য স্বভাবতই এ কান্না আসে। সে কান্না আল্লাহ্‌র কাছে নিশ্চয়ই পৌঁছোবে। তবে আল্লাহ্‌কে যদি আপনার সমগ্র জীবনের মওলা ও ওয়াকীল বলে সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেন, তবে এ প্রার্থনারও প্রয়োজন হয় না। তার উপর একান্তে নির্ভর করে থাকুন, দেখবেন বান্দা ও মওলা, আশিক ও মাশুকের প্রত্যক্ষ যোগ-সম্পর্কের আনন্দ-মাধুর্যে আপনার জীবন কত সহজ ও সুন্দর হয়ে আসবে। এ প্রত্যক্ষ সম্পর্কের প্রভাব যেন আমাদের জীবনের সকল স্তরে প্রসারিত হয়।

এ ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা মনে রেখে আল্লাহ্‌র 'ওয়াহ্‌দাতে' বা একত্বে একান্তভাবে বিশ্বাসী হ'য়ে আল্লাহ্‌র প্রেম ও প্রসন্নতা অর্জনে তৎপর হবো। এবং এ প্রত্যক্ষ সম্পর্কের মধ্যে অন্য কোন কিছুর দ্বারা তিলমাত্র

ব্যবধান বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতে দেবো না। পবিত্র কুরআন নবীজীর জীবন ও বাণী এবং আউলিয়াদের সাধনা থেকে আমরা এ শিক্ষা, আদর্শ ও পথ নির্দেশেরই সন্ধান পাই।

এখন সূফী-সাধনার প্রেমী সত্তার একটি মোক্ষম কথা বলে শেষ করছি। এক সাধক বেদনার্ত কণ্ঠে বলেছিলেন ঃ

মন না রাঙায়ে বসন রাঙায়ে
কি ভুল করিলি যোগী।

আমরা তো পরমের যোগী অর্থাৎ তার সঙ্গে যোগ যুক্ত হতে চাই। সেজন্য মনকে ভালবাসার রঙ দিয়ে রাঙাতে হবে। কিন্তু তা না ক'রে যদি বসন রাঙাই, ধর্মের ভড়ং দেখাই, বাইরের জীবনে আসক্তি, বিলাসিতা ও চাক-চিক্যের প্রশ্রয় দেই, তবে মস্ত বড় ভুল করা হবে। তাই আমরা মনকে রাঙাবো—বসনকে নয়। আর মনকে যদি একবার তাঁর ভালবাসার রঙে রঙিন করে তুলতে পারি, তবে ভিতর বাহির, জগৎ ও জীবন এক নতুন ও বিশুদ্ধতম আলোক-দীপ্তিতে পরিচ্ছন্ন এবং উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠবে।